পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-২

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

মুক্তিযোদ্ধা

"যে জাতি একবার জেগে ওঠে, সে জাতি মুক্তি পাগল।
যে জাতি স্বাধীনতাকে ভালোবাসে সে জাতিকে বন্দুক-কামান দিয়ে দাবায়ে রাখা যায় না"
–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। ...৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না"।
(বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের কিছু অংশ)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-২

Patient Care Technique-2

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

নিগার সুলতানা
ডা. আইরিন বিনতে আজাদ
ডা. এম মুস্তাজিব হায়দার
মো: আসলাম পারভেজ
মো: শাওন কবির সিকদার
মো: আমানউল্লাহ
মুহ: আবদুর রাজ্জাক মিঞা (সমন্বয়কারী)

সম্পাদক

ড. নূরে মোজাম্মেল কিরণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ : , ২০২২

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানবসম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ২৯টি ট্রেডের মধ্যে ১৩টি ট্রেডের ২৬টি পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি ট্রেডের ৩২টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-২

প্রথম পত্র (নবম শ্রেণি)			দ্বিতীয় পত্র (দশম শ্রেণি)		
অধ্যায়	*শিরোনাম*	*পৃষ্ঠা*	*অধ্যায়*	*শিরোনাম*	*পৃষ্ঠা*
প্রথম	**ক্লিনিক্যাল কেয়ার সাপোর্ট**	১-৪২	প্রথম	**ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা**	১২০-১৮০
দ্বিতীয়	**অনুজীববিদ্যা** এবং **প্রয়োগ**	৪৩-৬১	দ্বিতীয়	**শারীরিক অক্ষমতায় ব্যবহৃত পরিপূরক উপকরণ ব্যবহার সহায়তা**	১৮১-১৯১
তৃতীয়	**সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ**	৬২-৭৭	তৃতীয়	**জনস্বাস্থ্য এর প্রাথমিক ধারণা**	১৯২-২১৪
চতুর্থ	**দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সহযোগিতা**	৭৮-১১৭			

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-২

Patient Care Technique-2

প্রথম পত্র

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড: ৮৯১৪

প্রথম অধ্যায়

ক্লিনিক্যাল কেয়ার সাপোর্ট

Clinical Care Support

আমরা দেখেছি একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান অনেক ধরনের সেবা প্রদানের কাজ করে থাকে। যেমন: রোগীকে ঔষধ খাওয়ানো, রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ ও ইনসুলিন দেওয়া, রোগীকে হুইলচেয়ার ব্যবহারে সহায়তা করা প্রভৃতি। এগুলোকে বলা হয় ক্লিনিক্যাল কেয়ারগিভিং কার্যক্রম যা একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের ক্লিনিক্যাল দক্ষতার উল্লেখযোগ্য মানদন্ড নির্দেশ করে। এই কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা থাকাটা অতীব জরুরি। অন্যথায় রোগীর নানারকম অসুবিধা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রোগীকে ঔষধ খাওয়াতে পারবো
- রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করতে পারবো
- রোগীকে ইনসুলিন দিতে পারবো
- ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী স্যাম্পল বা পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করতে পারবো
- সেবাগ্রহীতাকে সঠিক পজিশনে রাখতে পারবো
- সেবাগ্রহীতাকে এক জায়গা হতে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করতে পারবো
- হুইলচেয়ার ব্যবহারে রোগীকে সহযোগিতা করতে পারবো।

উল্লেখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা মোট দুই আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করবো। এই জবের মাধ্যমে আমরা রক্তের গ্লুকোজ মেপে ইনসুলিন দিতে এবং পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে পারবো।

১.১ ঔষধ প্রদান করা

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সবাই কম বেশি রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার সাথে পরিচিত। আমরা অসুস্থ হলে বা সুস্থ থাকার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। ডাক্তার তখন আমাদের শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা করে পথ্য-ব্যবস্থাপনা দিয়ে থাকেন। প্রায় প্রতিটি মানুষই নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে ঔষধ সেবন করে থাকে। আমরা আমাদের বাসা-বাড়িতেও পরিবারের সদস্যদের অনেক সময় শারীরিক নানা অসুবিধার কারণে ঔষধ নিতে দেখি। আবার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অসুস্থ ব্যক্তি যিনি নিজে নিজে ঔষধ নিতে পারেন না, তাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিয়মমাফিক ঔষধ খাওয়ানো একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের প্রধানতম দায়িত্ব। এ কারণে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রোগীকে মুখে ঔষধ খাওয়ানোর জন্য এ সংক্রান্ত কিছু তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক।

১.১.১ ঔষধ বা ড্রাগ

যে সকল দ্রব্য রোগ নির্ণয়, আরোগ্য লাভ, উপশম, প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং যা মানবদেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে তাকে ঔষধ বলা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ঔষধ এমন দ্রব্য যার আরোগ্য এবং প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে অথবা যা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। আরো সহজ ভাষায় বলতে গেলে; Drug (ড্রাগ বা ঔষধ) হচ্ছে এমন একটা agent যেটিকে Diagnosis (ডায়াগনোসিস), Prevention (প্রিভেনশন) এবং Treatment (ট্রিটমেন্ট)করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে Diagnosis মানে হচ্ছে কোনো রোগ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ বা Reagent ব্যবহার করা হয়। Prevention মানে শরীরে যাতে কোনো রোগ আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য আগে থেকে শরীরকে প্রস্তুত করে রাখা। যেমন Vaccine বা টিকা হচ্ছে এক ধরনের ঔষধ যেটি ব্যবহার করলে শরীরে ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট রোগ সাধারণত আক্রমণ করতে পারে না। Treatment মানে যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় তবে সেই রোগকে নিরাময় করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা। বিভিন্ন ধরনের Antibiotic আছে যেগুলো treatment এর কাজে ব্যবহার করা হয়। তাই বলা যায় ঔষধ হতে পারে থেরাপিউটিক বা রোগনিরাময়কারী, প্রোফাইলেকটিক বা প্রতিরোধমূলক এবং ডায়াগনস্টিক বা রোগ নির্ণয়মূলক।

ঔষধ বিজ্ঞানের কতিপয় টার্ম / পরিভাষা

- **ফার্মাকোলজি:** বিজ্ঞানের যে শাখায় একটি ঔষধের উৎস থেকে শুরু করে এটি মানব দেহের উপর যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে "ফার্মাকোলজি" বলে। ফার্মাকোলজি'র দু'টি প্রধান শাখা হলো- ফার্মাকোকাইনেটিকস ও ফার্মাকোডাইনামিক।
- **ফার্মাকোকাইনেটিকস:** ফার্মাকোলজির যে শাখায় ঔষধের শোষণ, বন্টন, বিপাক এবং নিষ্কাশন নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে "ফার্মাকোকাইনেটিকস" বলে।

- **ফার্মাকোডাইনামিক:** ফার্মাকোলজির যে শাখায় দেহের উপর ঔষধ বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে "ফার্মাকোডাইনামিক" বলে।
- **ক্লিনিকাল ফার্মাকোলজি:** চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখা জীব ও মানব দেহের উপর চিকিৎসার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে।
- **নিউরোফার্মাকোলজি:** যে শাখা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতার উপর ঔষধের প্রভাব সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
- **সাইকোফার্মাকোলজি:** যে শাখা মস্তিস্কের উপর ঔষধের ক্রিয়া ও এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ, আচরণগত পার্থক্য নির্ণয় ও শারীরতাত্বিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
- **পোসোলজি:** যে শাখা কিভাবে ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় সে সম্পর্কিত জ্ঞান (নির্ভর করে রোগীর বয়স, ওজন, লিঙ্গ, আবহাওয়া ইত্যাদির উপর) নিয়ে আলোচনা করে।
- **ফার্মাকোগনসি:** যে শাখা ভেষজ গুনাগুণ সম্পনড়ব উদ্ভিদ বা প্রাণীজ পদার্থ থেকে চিকিৎসাগত দ্রব্যাদির আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, সুষ্ঠু বন্টন ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
- **ফার্মাকোজেনেটিক্স:** যে শাখা বিভিন্ন জাত, বিভাগ, বর্ণ, তারতম্য ভেদে ঔষধের প্রভাবে পার্থক্য নিরুপণ করা এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে সঠিক পরিমানের ও সর্বনিম্ন প্রতিক্রিয়াযুক্ত ঔষধ নির্বাচন করা নিয়ে আলোচনা করে।
- **ফার্মাকোজেনোমিক্স:** যে শাখা ঔষধ প্রযুক্তিতে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এই সম্পর্কিত বিদ্যমান ঔষধের গুনাবলি এবং নতুন ঔষধ আবিস্কারের নিমিত্তে গবেষণা করে।

১.১.২ বিভিন্ন প্রকার ঔষধ

ঔষধ বা ড্রাগকে তাদের উৎস, কার্যকারিতার ধরন, ওষধি ক্রিয়া ও গুণাগুণ প্রভৃতি নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। উৎসের উপর ভিত্তি করে ঔষধকে নিম্নোক্ত ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ: ভেষজ, উদ্ভিজ্জ, সামুদ্রিক ও খনিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ।
২. রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ: এ সকল ড্রাগের কিছু অংশ প্রাকৃতিক ও কিছু অংশ রাসায়নিক উপায়ে তৈরি হয়। যেমন: স্টেরয়েডীয় ড্রাগ।
৩. রাসায়নিকভাবে উৎপাদিত ড্রাগ
৪. প্রাণিজ উৎস থেকে প্রাপ্ত ড্রাগ: যেমন: হরমোন ও এনজাইম বা উৎসেচক।
৫. অণুজীব উৎস হতে প্রাপ্ত ড্রাগ: যেমন: এন্টিবায়োটিক।
৬. জীবপ্রযুক্তি ও জীনপ্রকৌশলের মাধ্যমে প্রাপ্ত ড্রাগ: যেমন: হাইব্রিডোমা টেকনিক।
৭. তেজস্ক্রিয় বস্তুর মাধ্যমে প্রাপ্ত ড্রাগ: যেমন: Stereotactic Body Radiation থেরপী, Potassium Iodide (K1) ইত্যাদি।

আরেক ধরনের মুখ্য শ্রেণিবিভাগ হলো-

- সিনথেটিক বা রাসায়নিক উপায়ে তৈরি ড্রাগ
- জৈবলব্ধ উপাদান যেমন- রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন, ভ্যাক্সিন বা প্রতিষেধক, স্টেম সেল থেরাপি ইত্যাদি।

কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে ঔষধকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়-

- **এন্টিপাইরেটিকস:** এগুলো জ্বর (পাইরেক্সিয়া বা পাইরেসিস) কমায়।
- **এনালজেসিক:** এরা বেদনা বা ব্যথার উপশম করে (ব্যথানাশক)।
- **এন্টিম্যালেরিয়াল ড্রাগ:** ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
- **এন্টিবায়োটিক:** জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করে।
- **এন্টিসেপটিক:** পোড়া, কাটা কিংবা ক্ষতের আশেপাশে জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করে।
- **মুড স্ট্যাবিলাইজার:** লিথিয়াম এবং ভ্যালপ্রোমাইড এ কাজ করে।
- **এন্টি স্পাজমোডিক:** স্পাজম বা পেট ব্যথা কমায়।
- **হরমোন রিপ্লেসমেন্টস:** প্রিমারিন। হরমোনের স্বল্পতা দূরীকরনে ব্যবহৃত হয়।
- **এন্টিহেলমেনথিক:** এগুলো কৃমিনাশক ঔষধ।

১.১.৩ ঔষধ কিভাবে কাজ করে?

ঔষধ সাধারণত মুখে খাওয়ার মাধ্যমে অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। ঔষধ মুখে খাওয়ার পর পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে অন্ত্রে প্রবেশ করে। সেখানে এগুলো বিশোষিত হয়ে রক্তের মধ্যে মিশে যায় এবং দেহের যে সমস্ত অংশে রক্তের সরবরাহ আছে সেখানে ঔষধ বহন করে নিয়ে যায়। যে সব ঔষধ ইনজেকশন হিসেবে দেওয়া হয় সেগুলো সরাসরি রক্ত স্রোত বা ব্লাড স্ট্রীমে মিশে। এজন্য ইনজেকশন তাড়াতাড়ি কাজ করে। ঔষধ শুধুমাত্র দেহের একটি অংশে কাজ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেও রক্তস্রোত এই ঔষধকে দেহের অনেক অংশে নিয়ে যায়। সেজন্য দেহের অন্যান্য অংশেও ঔষধ অযাচিতভাবে কাজ করতে পারে। যেমন: এসপিরিন- ইহা স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে ব্যথা উপসম করে। কিন্তু এটা আবার পাকস্থলীর ঝিল্লীতেও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে (যা ক্ষতিকর হতে পারে), তাছাড়া এসপিরিন সন্ধির প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে (যা উপকারী হতে পারে)। এ ধরনের ফলাফলকে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা সাইড ইফেক্ট বলা হয়। এছাড়াও এসপিরিন রক্তকে পাতলা করে বলে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের দেওয়া হয়। দেহে ঔষধের কাজ বিভিন্ন রকম হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন কাজ রয়েছে। এগুলোর কিছু কিছু নীচে বর্ণনা করা হলো:

১। যে সমস্ত ঔষধ রোগ জীবানুকে ধ্বংস করে। যেমন-

- এন্টিবায়োটিক- যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। পেনিসিলিন, এমপিসিলিন, এমক্সাসিলিন, কোট্রাইমোক্সাজল, টেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ। এছাড়াও new generation এর আরো অনেক antibiotics আছে।
- এন্টিপ্যারাসাইটিক- যা পরজীবিকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে। যেমন, বিভিন্ন ধরনের কৃমি হলো পরজীবি। এলবেনডাজল, মেবেনডাজল, লিভামিসল ইত্যাদি কৃমিনাশক ঔষধ।

২। যে সমস্ত ঔষধ কোনো অঙ্গ বা তন্ত্রের উপর কাজ করে। যেমন-

- **স্নায়ুতন্ত্রের উপর:** উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রশান্তিদায়ক বা স্নায়ুর উত্তেজনা শান্তকারক ঔষধ (Tranquilizer/Sedative), যেমন- ডায়াজিপাম। ব্যথানাশক ঔষধ (Analgesic), যেমন- প্যারাসিটামল, এসপিরিন, ডিসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম, হাইওসিন বিউটাইল ব্রোমাইড ইত্যাদি। জ্বর উপসমকারী ঔষধ (Antipyretic), যেমন- প্যারাসিটামল। অনুভুতিনাশক ঔষধ (Anaesthetic), যেমন-লিগনোকেইন (Lignocaine) ইত্যাদি।

- **জরায়ুর উপর:** প্রসবের পর রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু ঔষধ জরায়ুর মাংসপেশীর সংকোচন বাড়িয়ে দেয়। যেমন-অক্সিটোসিন, আরগোমেট্রিন।
- **ফুসফুসের উপর:** হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু ঔষধ ব্যবহার করা হয়। এ ঔষধ ফুসফুসের বাতাস প্রবেশের পথকে প্রসারিত/বড় করে দেয়। এগুলোকে ব্রংকোডাইলেটর (Bronchodilator) বলা হয়। যেমন- সালবিউটামল, থিওফাইলিন ইত্যাদি।

৩। যে সমস্ত ঔষধ খাদ্যের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে: এসব ঔষধ খাদ্যের অত্যাবশ্যকীয় অংশ যোগান দেয় যখন কোনো ব্যক্তি খাদ্যের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাচ্ছে না অথবা তা শরীরে বিশোষিত (Absorption) হচ্ছে না। যেমন: ভিটামিন-এ, আয়রন, ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি।

৪। যে সমস্ত ঔষধ দেহের বিভিন্ন অংশে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ ঠিক করে: যেমন- এন্টাসিড, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি। খাবার স্যালাইন একজন রোগীর ডায়রিয়াজনিত কারণে নির্গত পানি ও লবনের অভাব পূরণ করে।

রোগ/উপসর্গ অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ঔষধের পরিচিত:

ক্র.	রোগ/উপসর্গ	নির্দেশিত ঔষধ (জেনেরিক নাম)
০১	শ্বাস তন্ত্রের সংক্রমণ	ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন, এমপিসিলিন, কোট্রাইমক্সাজল
০২	জ্বর ব্যথা	প্যারাসিটামল, এসপিরিন, আইবুপ্রোফেন, এন্ডোমেথাসিন
০৩	পেট ব্যথা	হাইওসিন বিউটাইল ব্রোমাইড, ডোটাভেরিন
০৪	হাপানী	সালবিউটামল, এমাইনোফাইলিন, থিওফাইলিন
০৫	সাধারণ সর্দি-কাশি এলার্জি	প্রোমেথাজিন, ক্লোরফেনিরামিন
০৬	চুলকানি ও খোসপাঁচড়া	বেনজাইল বেনজোয়েট, পারমেথ্রিন
০৭	কৃমি	মেবেনডাজল, এলবানডাজল
০৮	রক্তস্বল্পতা	আয়রণ ও ফোলিক এসিড
০৯	বমি, বমি ভাব	ডমপেরিডোন মেলিয়েট
১০	ম্যালেরিয়া	ক্লোরোকুইন, কুইনাইন
২	অনিদ্রা ও মৃদু শান্তকারক	ডায়াজিপাম
১২	মুখের কোনায় বা জিহবায় ঘা	রিবোফ্লাবিন
১৩	অপুষ্টি, দুর্বলতা	ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, মাল্টিভিটামিন

ড্রাগ স্টোরেজ বা ঔষধ সংরক্ষণ

ক্লিনিক বা বাসায় যেখানেই হোক না কেন, ঔষধের সংরক্ষণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিক সময়ে মডেল ফার্মেসীগুলোতে ঔষধ সংরক্ষণ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। সেই ঔষধ আমাদেরকে সেবাদান কেন্দ্রে কিংবা বাসাবাড়িতে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হয়। এ সকল জায়গায় বেশি তাপ, বাতাস, আলো এবং ময়েশ্চার ওষুধকে নষ্ট করতে পারে। তাপ ও ময়েশ্চারে ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল জাতীয় ঔষধ সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে ওষুধ। সেই ওষুধ খেলে পেটের সমস্যা হতে পারে। আবার তরল ইঞ্জেকশন বা সিরাপ একবার সেবনের পর

বেশিদিন রাখা উচিৎ নয়। ইনসুলিন ও লিকুইড অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে বেশি সাবধানতা নেওয়া উচিত। যেমন, ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সাধারণত ৩০দিন পর্যন্ত ঠিক থাকে ইনসুলিন। তাই এ ধরনের ঔষধকে ফ্রিজে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আরো কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলা যায়, যেমন:

- ওষুধের খাপ থেকে ওষুধ খুলে রাখা যাবে না।
- ঠান্ডা এবং শুকনো জায়গায় রাখতে হবে ওষুধ। ড্রেসার ড্রয়ার কিংবা কিচেন ক্যাবিনেটে রাখা যেতে পারে ওষুধ। স্টোরেজ বক্স বা তাকে রাখা যেতে পারে ওষুধ। না হলে মেয়াদ উত্তীর্ণের আগেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে ওষুধ।
- তবে, আগুন, স্টোভ, সিঙ্ক এবং গরম কোনো সরঞ্জাম থেকে দূরে রাখতে হবে।
- ওষুধের বোতল থেকে তুলোর বল বের করে নিতে হবে। কারণ, এই তুলো থেকে ময়েশ্চার জন্ম নিতে পারে। প্লাস্টিকের ব্যাগে ওষুধ রাখা যাবে না। রাখলে ওষুধের প্রভাব কমে যেতে পারে।
- একটি পাত্রে অনেক ওষুধ একসঙ্গে না রাখাই উত্তম। অন্যথায় মেয়াদ উত্তীর্ণের আগেই বদলে যেতে পারে ওষুধের রং, গন্ধ। শিশুদের নাগাল থেকে দূরে রাখতে হবে ওষুধ।

১.১.৪ রুট অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন

যে উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হোক না কেন, ঔষধ সাধারণত শরীরের নির্দিষ্ট কিছু স্থান বা জায়গা দিয়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। Route বলতে বোঝায় এমন একটা পথ যার মধ্য দিয়ে একটা মেডিসিন (Drug) শরীরে প্রবেশ করে শরীরের নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে কাজ করে। ড্রাগ যখন শরীরে কাজ করে তখন তাকে Pharmacological Action বলে। তাহলে একটি ড্রাগ শরীরে কোন পথে প্রবেশ করবে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে যাবে, সেই রাস্তার সাথে মেডিসিনের সম্পর্ক কেমন হবে সেটাকে ঔষধের রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান (routes of administration) বলে। একটি ড্রাগ কি ধরনের রুট দিয়ে শরীরে প্রবেশ করবে ও কাজ করবে তা কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলো হচ্ছে-

ক. ঔষধের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন: একটা ড্রাগ কঠিন, তরল নাকি গ্যাসীয় তার উপর নির্ভর করবে সেই ড্রাগ কোন পথে মানবদেহে প্রবেশ করবে। উদাহরণস্বরূপ; Solid বা কঠীন ড্রাগগুলো শরীরে প্রবেশের পর সেটি ভেঙ্গে ছোট ছোট টুকরাতে পরিণত হয় (Disintegration ঘটে) এবং সবশেষে শরীরে শোষিত হয় (Dissolve ঘটে)। আবার Liquid বা তরল ঔষধ শরীরে প্রবেশের পর কেবলমাত্র শোষিত হয় বা Dissolve হয়। অন্যদিকে গ্যাসীয় ড্রাগগুলো শরীরে নাক বা মুখ দিয়ে প্রবেশ করে এবং সরাসরি এরা ফুসফুসে কাজ করে। এছাড়া ড্রাগ এর রুট নির্ভর করে সেটির দ্রাব্যতা এবং pH এর উপরেও।

খ. নির্দিষ্ট কাজের জন্য পছন্দসই জায়গা: এর মানে হচ্ছে একটা ঔষধ শরীরের ঠিক কোন জায়গায় কাজ করবে সেটা নির্বাচন করা। যদি আমাদের গালে ব্রণ উঠে তবে চিকিৎসক এমন ঔষধ দিয়ে থাকেন যেটা শুধুমাত্র গালের ওই ব্রণের অংশটাতে কাজ করে। আবার আমরা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে চিকিৎসক এমন ঔষধ দিয়ে থাকেন যেটা পুরো শরীর জুড়ে কাজ করে। কাজেই Route of Drug

Administration এক্ষেত্রে ভালো ভূমিকা পালন করে এবং ড্রাগের পথ ঠিক করে দেয়, যাতে সে আমাদের শরীরের নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে।

গ. ঔষধ শোষিত হবার শতকরা হার: এর মানে হচ্ছে একটি ঔষধ কোন পথে প্রবেশ করালে তা শরীরে সর্বোচ্চ পরিমানে শোষিত হবে সেটা। সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়ার জন্য ঔষধকে এমন রুটের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করাতে হবে যাতে সেটি সর্বোচ্চ পরিমানে শোষিত হয়।

ঘ. ঔষধের বিপাক: ঔষধের মেটাবলিজম বা বিপাক বলতে ঔষধ শরীরে প্রবেশের পর তার ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনকে বুঝায়। এটিকে ঔষধের বায়োট্রান্সফর্মেশনও বলা হয়ে থাকে। ঔষধের বিপাক দুই ধরনেরঃ First pass, By pass। First pass হচ্ছে গতানুগতিক পথ দিয়ে ড্রাগের পথ চলা, যেমন আমাদের মুখ দিয়ে কোনো ট্যাবলেট সেবন করলে সেটা অন্ননালী দিয়ে পাকস্থলীতে যাবে, সেখান থেকে অন্ত্রে যাবে, তারপর যকৃত হয়ে রক্তে যাবে। এক্ষেত্রে ড্রাগের কার্যক্ষমতা কমে যাবে। কিন্তু সরাসরি সে ড্রাগকে যদি রক্তে প্রয়োগ করা হয় তবে সেটি পুরোপুরি কাজ করবে। এই পদ্ধতিকে By pass বলে।

ঙ. কার্য্যকারিতার দ্রুততা: এর মানে হচ্ছে ঔষধ শরীরে প্রবেশের পর কত দ্রুত কাজ করবে। এক্ষেত্রেও Route of Drug Administration ভূমিকা রাখে। মুখে খাওয়ার ঔষধের চেয়ে সরাসরি শিরার মাধ্যমে রক্তে ইনজেকশন প্রয়োগ করলে সেটি অধিকতর দ্রুত কাজ করে।

চ. রোগীর অবস্থা: রোগী যদি শিশু হয় তবে তাকে সিরাপ বা Liquid জাতীয় ড্রাগ দিতে হয়, রোগী যদি কোমাতে থাকে তবে তাকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ শরীরে দিতে হয়, রোগী যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তবে তাকে ট্যাবলেট / ক্যাপসুল হিসেবে ড্রাগ খাওয়ানো যেতে পারে।
এ সকল বিষয় বিবেচনা করেই একজন চিকিসক Drug এর Route নির্বাচন নির্ধারণ করে থাকেন।

বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হলেও রুট অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন মূলত দুই প্রকার:

১. এন্টেরাল (Enteral): এটি হচ্ছে ড্রাগ চলাচলের এমন পথ যেখানে ড্রাগ সরাসরি ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্তের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। যেমন- Oral Route, এটির মাধ্যমে মুখ দিয়ে ট্যাবলেট, সিরাপ, ক্যাপসুল ইত্যাদি ক্ষুদ্রান্তে পৌছায়। এই রুট ব্যবহার করা তুলনামূলকভাবে সহজ। এটির অসুবিধা হচ্ছে এটি First Pass পদ্ধতি যেখানে ড্রাগের কার্যক্ষমতা কিছুটা কমে যায়, সাথে সাথে এই ড্রাগ শরীরে কাজ করে না। কিছুটা সময় নেয়।

২. প্যারেন্টাল (Parental): কোনো ড্রাগ যদি ক্ষুদ্রান্ত-বৃহদান্ত বাদে অন্য কোনো পথে শরীরে প্রবেশ করে সঠিক জায়গাতে গিয়ে কাজ করে তবে তাকে Parental রুট বলে। Parental Route নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত। যেমন:

ক. সাবলিঙ্গুয়াল (Sublingual) রুটঃ আমাদের জিহবার নিচে যদি কোনো ট্যাবলেট রাখা হয় তবে সেটি জিহবার নিচের ক্যাপিলারির মাধ্যমে সরাসরি নির্দিষ্ট জায়গার পৌছে যায়, ক্ষুদ্রান্ত – বৃহদান্তে যায় না।

খ. বাক্কাল (Buccal Route) রুট: যখন কোনো ট্যাবলেট মুখের ভেতর গালের কোণায় রাখা হয় তখনও ক্যাপিলারির মাধ্যমে সেটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে চলে যায় ক্ষুদ্রান্ত-বৃহদান্ত পার না হয়েই।

গ. রেকটাল (Rectal) রুট: শরীরের Rectal অংশে সরাসরি ড্রাগ প্রয়োগ করা যায়, এক্ষেত্রে সেটি দ্রুত কাজ করে।

ঘ. সাব-কিউটেনিয়াস (Sub-cutaneous) রুট: শরীরে যখন ত্বকের নিচে ড্রাগ পৌছানোর জন্য ইনজেকশন দেওয়া হয় তখন ড্রাগ যে রাস্তা ধরে সরাসরি নির্দিষ্ট অংশে যায়, তাকে Sub Cutaneous Route বলে। যেমন- ডাইবেটিকস রোগীর ইনসুলিন এই ধরনের route ফলো করে। এটির সুবিধা হচ্ছে ড্রাগ সরাসরি কম সময়ে কাঙ্খিত জায়গায় পৌঁছে যায়। এর অসুবিধা হচ্ছে এটির ফলে ত্বকের নিচে থাকা নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষতি হতে পারে।

ঙ. ইনহেলেশনাল (Inhalational Route) রুট: যখন গ্যাসীয় ড্রাগ সরাসরি ফুসফুসে যায় তখন এই route কাজ করে। এক্ষেত্রে সরাসরি ড্রাগ ফুসফুসে গিয়ে সেখানকার কৈশিকজালিকার (Capillary) মাধ্যমে রক্তে পৌছে যায়। তাই এই ধরনের পথ ব্যবহারের ফলে ড্রাগটি খুব দ্রুত শরীরের ভেতরে কাজ করতে পারে।

চ. ন্যসাল (Nasal) রুট: এক্ষেত্রে নাকের ভেতরে ড্রপলেট আকারে ড্রাগ ব্যবহার করা হয়, যেখানে ড্রাগটি নির্দিষ্ট পথ ধরে শরীরের কাঙ্খিত জায়গায় পৌছে যায়। এই পথকে Nasal Route বলে। যেমন – সোয়াইন ফ্লু এর ড্রাগ তরল প্রকৃতির। নেবুলাইজার নামক যন্ত্রের মাধ্যমে এই ড্রাগকে নাকের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে ফ্লু'এর প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করানো হয়।

ছ. ইন্ট্রামাস্কুলার (Intramuscular) রুট: ইনজেকশনের মাধ্যমে পেশীর ভেতরে ড্রাগ সাপ্লাই দেওয়ার ক্ষেত্রে এই Route কাজ করে। এক্ষেত্রেও ড্রাগ খুব দ্রুত কাজ করা শুরু করে কিন্তু একটা অসুবিধে হলো এই সিস্টেমে পেশীতে বেশ ব্যথা অনুভূত হয়।

জ. ইন্ট্রাভেনাস (Intravenous) রুট: যে Route ব্যবহার করে শরীরের রক্তনালী বা Vein এর মধ্যে ড্রাগ প্রয়োগ করলে সেটি শরীরের মধ্যে খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে সেটিই Intravenous route বলে। অর্থাৎ যে route এর ফলে ড্রাগ একদম ঠিক জায়গায় ঠিকমত কাজ করে সেটাই Intravenous route. এটি প্রয়োগের সুবিধা হচ্ছে খুব দ্রুত এটি শরীরে কাজ করতে পারে। তবে এর একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে যদি ভুল জায়গায় ইনজেকশন দেওয়া হয় তবে সেই জায়গা থেকে ড্রাগকে আর বের করে আনা যায় না এবং রোগী এক্ষেত্রে প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে। প্রধানত 1st & Quick Action এর জন্য শরীরে এই Route system ব্যবহার করে ড্রাগ প্রয়োগ করা হয়।

ঝ. ইন্ট্রা-আর্টিকুলার (Intra-articular) রুট: যেসব ড্রাগকে শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে, দুটো হাড়ের সংযোগস্থলে প্রয়োগ করা হয় সেগুলোকে Intraarticular Route বলে।

ঞ. ইন্ট্রা-আর্টারিয়াল (Intra-arterial) রুট: যেসব ড্রাগ আর্টারিতে সাপ্লাই দেওয়া হয় সেগুলো এই Route অনুসারে কাজ করে।

এছাড়া আরো একধরনের রুট হচ্ছে টপিক্যল রুট অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন। টপিক্যাল ঔষধগুলো শরীরের ত্বক বা শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর সরাসরি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যেমন: ক্রিম, ফোম, জেল, লোশন, মলম প্রভৃতি। ডাক্তার বা নার্সরা হাসপাতালে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রুট ব্যবহার করলেও, পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান হিসেবে আমরা কেবলমাত্র মুখে খাওয়ার ঔষধ, টপিক্যাল এডমিনিস্ট্রেশন এবং সাব-কিউটেনিয়াস ইনজেকশন প্রভৃতি নিয়ে কাজ করবো।

১.১.৫ ঔষধের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ পথের সুবিধা-অসুবিধাসমূহ

প্রধান প্রধান প্রয়োগ পথগুলোর সুবিধা-অসুবিধা নীচে উল্লেখ করা হলো:

১) মুখে খাওয়া (Oral Route)

সুবিধা:

ক) নিরাপদ, সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং তুলনামূলকভাবে খরচ অনেক কম।
খ) সহজেই প্রয়োগ করা যায়। রোগী নিজে বা তার আত্মীয়স্বজন ঔষধ প্রয়োগ করতে পারে।
গ) সূঁচ ফোড়ানোর ভয় ও উদ্বেগ থাকে না এবং ব্যথা পাওয়া বা ব্যথা সহ্য করতে হয় না।
ঘ) এই পথে ব্যবহৃত ঔষধ ইনজেকশনের মত সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা:

ক) অনেক সময় বমি হতে পারে এবং গৃহীত ঔষধ বেরিয়ে যেতে পারে।
খ) কিছু কিছু ঔষধ পাচক রস দ্বারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেজন্য দেহের যেখানে প্রয়োজন সেখানে পৌছায় না।
গ) কিছু ঔষধ খাদ্যের সাথে মিশে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করতে পারে যা সহজে বিশোষিত হতে পারে না।
ঘ) ডায়রিয়ার কারণে পর্যাপ্ত সময় অন্ত্রে না থাকার ফলে অনেক ঔষধ সম্পূর্ণরূপে বিশোষিত হতে পারে না।
ঙ) কিছু ঔষধ অন্ত্র থেকে মোটেই বিশোষিত হয় না।
চ) অন্ত্রে বিশোষিত হতে সময় লাগে তাই ইনজেকশনের তুলনায় মুখে খাওয়ার ঔষধ দেরীতে কাজ শুরু করে।
ছ) জরুরি অবস্থা, অজ্ঞান, মুখে খেতে চায়না ও অসহযোগী রোগীদের ক্ষেত্রে এই পথে ঔষধ প্রয়োগ উপযুক্ত নয়।

২) জিহ্বার নিচে (Sub-lingual Route)

এই পথে ঔষধ জিহ্বার নীচে রেখে আস্তে আস্তে গলতে দেওয়া হয়। জিহ্বার শ্লেষ্মা ঝিল্লীর মাধ্যমে এগুলো রক্ত স্রোতের সাথে মিশে যায় এবং খাওয়ার ঔষধের মত গিলতে হয় না এবং পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে যেতে হয় না।

সুবিধা:

ক) অপেক্ষাকৃত দ্রুত বিশোষিত হয়।

খ) চাহিদা অনুযায়ী ফল লাভের পর অবশিষ্ট ঔষধ ফেলে দেওয়া যায়।

অসুবিধা:

ক) যে সেকল ঔষধ স্বাদে অতৃপ্তিকর এই পথ সেসব ঔষধের জন্য উপযুক্ত নয়।

৩) ইনজেকশন (Injection)

সুবিধা:

ক) দ্রুত বিশোষিত হয়, যেহেতু পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় না।

খ) ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া যায়।

গ) ঔষধের পরিমাণ শুদ্ধরূপে নিরূপন করা যায়।

ঘ) অজ্ঞান ও অসহযোগী রোগীদেরকে প্রয়োগ করা যায়।

ঙ) অতিরিক্ত বমির জন্য যে সব রোগী ঔষধ খেতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে এই পথে ঔষধ প্রয়োগ ফলদায়ক।

অসুবিধা/সাবধানতা:

ক) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থান জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে ও জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।

খ) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থানে ব্যথা ও এমনকি ফোঁড়া হতে পারে।

গ) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থানে রক্তনালী বা স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। স্নায়ুর আঘাতের ফলে মাংসপেশী দুর্বল ও অবশ হতে পারে।

ঘ) নিজে নিজে প্রয়োগ করা উচিত নয়। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন হয়।

ঙ) মাংসপেশীতে দেবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া দেওয়া উচিত নয়।

১.১.৬ ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সকাল থেকে গা-হাত-পায়ে অসহ্য ব্যথা। মাথাটাও ঝিম ঝিম করছে। তাই তড়িঘড়ি করে একটি পেন কিলার খেয়ে কাজে নেমে পড়লেন। আর এভাবে চলতে চলতে তৈরি হল পেইন কিলার অ্যাডিকশন। জ্বর হলে না জেনে বুঝে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া, ব্যথা হলে যখন তখন পেইন কিলার খাওয়া, এসিড হলে মুঠো-মুঠো অ্যান্টাসিড খাওয়া এগুলো তো রোজকার রুটিন। কিন্তু কেউ যে কিছু না ভেবেই অ্যান্টিবায়োটিক, পেইন কিলার বা অন্য কোনো ওষুধ খেয়ে ফেলে, এতে কিন্তু সমস্যা আছে। যেমন: এলার্জিক রিয়েকশন ও এনাফাইলেকটিক শক। তাই জেনে রাখ বভিন্ন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে।

ড্রাগ ওভারডোজ

১। অনেকে ভাবেন, কড়া ডোজে বেশি ওষুধ খেলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। ওষুধ না জেনে খাওয়ার ফলে রোগী ছটফট করতে থাকেন, বুক ধড়ফড় করে, ঘাম হয়, ব্লাড প্রেশার ওঠানামা করে, হার্টবিটও কম-বেশি হয়। সময়মতো চিকিৎসা না হলে রোগী অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। এক একটি ওষুধের ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া একেক রকম। তাই একে অপরের সাথে গুলোয়ে ফেলা উচিত নয়।

২। ড্রাগ ওভারডোজ বাড়াবাড়ি রকমের হলে, দেরি না করে হাসপাতালে ভর্তি কড়া প্রয়োজন। স্যালাইনও দিতে হতে পারে। আর যদি বার বার ড্রাগ ওভারডোজ হয়, তাহলে মনোবিদের সাহায্য নিয়ে কাউন্সেলিং করাও।

৩। প্রেগনেন্সির সময় ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাবেন না। অন্যথা গর্ভস্থ সন্তানের হার্টের সমস্যা, স্পাইনাল কর্ডের সমস্যা, জন্ডিস, ব্লাড সুগার কমে যাওয়া, ইত্যাদি নানা রকমের অসুখ হতে পারে।

১.১.৭ ঔষধের মাত্রা ও প্রচলিত শব্দ

ঔষধের মাত্রা (Drug Dosage)

ঔষধের মাত্রা বলতে বুঝায় কি পরিমাণ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে তার পরিমাণ কে। ঔষধের মাত্রা সাধারণভাবে নিচের এককগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

ক. ওজন- গ্রাম (gm) বা মিলিগ্রাম (mg)

খ. পরিমাণ (Volume)- মিলিলিটার (ml) বা কিউবিক সেন্টিমিটার (cc)

গ. ইউনিট (Unit).

ঔষধের মাত্রা বা পরিমাণকে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো প্রভাবিত করে:

১। দেহের ওজন - রোগীর ওজন যত কম হবে ঔষধের মাত্রাও তত কম হবে।

২। প্রয়োগের পথ - ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসুলের তুলনায় ইনজেকশনের মাত্রা কম হয়।

৩। রোগের তীব্রতা - কখনও কখনও অসুখের তীব্রতা বেশী হলে বেশী মাত্রায় ঔষধ দরকার হয়।

৪। প্রয়োগের ব্যবধান - একই ঔষধ কম ব্যবধানে ব্যবহার করলে বেশী ব্যবধানের চেয়ে মাত্রা কম দরকার হয়।

৫। গর্ভাবস্থা - অনেক ঔষধ গর্ভাবস্থায় কম মাত্রায় দেওয়া হয়।

১.১.৮ ঔষধ খাওয়ানোর নিয়মাবলি

রোগ হলে সুস্থ হওয়ার জন্য ওষুধ সেবন করতে হয়। কোনো ওষুধই নিজে নিজে খাওয়া ঠিক নয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে লিখিত প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে ওষুধ সেবন করা জরুরি। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান কেয়ারগিভিং কাজে রোগীকে প্রায়ঃশই ঔষধ খাইয়ে থাকেন অথবা ঔষধ খাওয়াতে সহযোগীতা করে থাকেন। তবে ওষুধ সেবনের সময় কিছু ভুলের কারণে এর সম্পূর্ণ উপকারিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হই। এসব ভুলের কারণে পরবর্তীকালে রোগীর শরীরের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এমনকি রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ঔষধ খাওয়ানোর সাধারণ কিছু নিয়মাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো:

- শুরুতে ওষুধ খাওয়ার আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া উচিত। রোগী হাতে ওষুধ খেতে অক্ষম হলে, সেক্ষেত্রে কেয়ারগিভারকে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে। কারণ, আমাদের শরীরের প্রায় সকল রোগই ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, প্যারাসাইট ইত্যাদির জন্য হয়ে থাকে। আর হাত পরিস্কার না করে ওষুধ খেলে ওই জীবানু আরো বেশি করে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
- এবার চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষধের সাথে ফার্মেসি থেকে কিনে নিয়ে আসা ঔষধ ভালোভাবে মিলিয়ে নিতে হবে। মিল না থাকলে সে ওষুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ ভুল ওষুধ মৃত্যু ঢেকে আনতে পারে। প্রয়োজনে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

- এবার দেখতে হবে ওষুধের মেয়াদ আছে কিনা! ওষুধের মোড়কে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ দেওয়া থাকে। মেয়াদবিহীন ওষুধ বিষক্রিয়া তৈরি করতে পারে।
- ডাক্তারের নির্দেশনা মোতাবেক সঠিক রুটের মাধ্যমে সঠিক সময়ে ঔষধ খাওয়াতে হবে। যেমন, কোন ঔষধ খাবার আগে খেতে বলা হয়, আবার কোনটি বলা হয় খাবার পরে। এই সমস্ত নির্দেশনা সাধারণত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে সুস্পষ্টভাবে লিখা থাকে। কেয়ারগিভারকে সেই সমস্ত নির্দেশনা ভালোমত পড়ে, বুঝে অনুসরণ করতে হবে।

ঔষধ খাওয়ানোর ছয়টি বিষয়:

১. সঠিক রোগী বা ব্যক্তি: রোগীর নাম, বয়স, রোগ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের সাথে মিলিয়ে সঠিক রোগীকে সনাক্ত করতে হবে।
২. সঠিক ওষধ: ঔষধের নাম, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, ডোজ, রুট, অন্যান্য নির্দেশন যাচাই করে সঠিক ঔষধ সনাক্ত করা।
৩. সঠিক ডোজ বা পরিমাণ: সঠিক পরিমানের ঔষধ নিতে হবে।
৪. সঠিক রুট: ডাক্তার যেভাবে ঔষধ প্রয়োগ করার জন্য প্রেসক্রিপশনে লিখেছেন সেই রুট নির্ধারণ করা।
৫. সঠিক সময়: নির্ধারিত সময়ে ঔষধ খাওয়ানো।
৬. সঠিকভাবে রেকর্ড করা: সমস্ত কাজ সমাপ্ত হবার পর সঠিকভাবে রেকর্ড শীটে রেকর্ড করা।

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ভালোভাবে বুঝে তারপর ঔষধ খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে কোনপ্রকার ভুল করা যাবেনা। কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে ডাক্তার, নার্স বা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে। ডাক্তাররা সাধারণত কোন ঔষধ কখন ও কিভাবে খেতে হবে তা কিছু সংক্ষেপিত শব্দ দিয়ে লিখে থাকেন। যেমন:

- bid- দিনে ২বার। অর্থাৎ ১২ ঘন্টা পর পর।
- tid- দিনে ৩বার। অর্থাৎ ৮ ঘন্টা পর পর।
- qid- দিনে ৪ বার। অর্থাৎ ৬ ঘন্টা পর পর।
- hs- রাতে শুবার সময়।
- ac- খাবার আগে
- pc- খাবার পরে
- NPO- মুখে কোন কিছু খাওয়া যাবে না ইত্যাদি।

সকল ধরনের ওষুধ ডাক্তারদের পরামর্শে অনুযায়ী সঠিক সময় মত রোগীকে সেবন করাতে হবে।

১.২ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাপ ও ইনসুলিন প্রদান

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে, রক্ত আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অভ্যন্তরীণ পরিবহন মাধ্যম। এটি বাহিত হয় শিরা বা ধমনীর মধ্য দিয়ে। রক্ত দেহের প্রতিটি টিস্যুতে পৌঁছে দেয় খাবার ও অক্সিজেন। টিস্যুর বৃদ্ধি ও ক্ষয়রোধের জন্য এ খাবার ও অক্সিজেন অপরিহার্য। এছাড়া দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসরিত হরমোন রক্তের মাধ্যমেই পৌঁছে যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, নিশ্চিত করে ওই অঙ্গের কর্মক্ষমতাকে। এমনই একটি হরমোনের নাম হচ্ছে ইনসুলিন। ইনসুলিন একটি প্রোটিনধর্মী হরমোন।

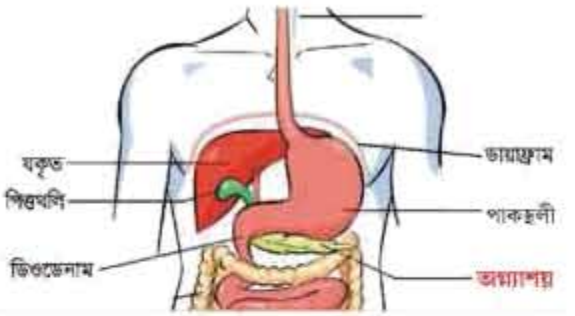

চিত্র ১.১: অগ্নাশয় মানবদেহে ইনসুলিন তৈরি করে

এটি দেহের অপ্রয়োজনীয় গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে দেহকে সঠিক পরিমাণের গ্লুকোজ সরবরাহে সাহায্য করে। গুরুত্বপূর্ণ এই হরমোনটি তৈরি হয় দেহের প্যানক্রিয়াস নামের অঙ্গে। বাংলায় প্যানক্রিয়াসকে বলে অগ্ন্যাশয়। এই শিখনফলে আমরা রক্তের গ্লুকোজের নরমাল ভ্যাল্যু, এর তাৎপর্য, বহুমূত্র রোগ এবং এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবো। ইনসুলিন পরিমাপ করার পাশাপাশি ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী বহুমূত্র রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীও আমরা এই শিখন ফলে অনুশীলন করব।

১.২.১ রক্তের গ্লুকোজ ও এর স্বাভাবিক মাত্রা

শর্করা মানবদেহের শক্তির মূল জোগানদাতা। শর্করা ভেঙে তৈরি হয় গ্লুকোজ বা চিনি। আমরা যখন শর্করা জাতীয় খাবার খাই, সেটি যে খাবারই হোক, যে পরিমাণই হোক, শরীরে সেই খাবার গ্লুকোজ হিসেবেই জমা হয়। শরীরের স্বাভাবিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার জন্য এই গ্লুকোজের নিয়মিত তাপন বা নিয়ন্ত্রন অতীব জরুরি, যে কাজটি করে থাকে ইনসুলিন নামক হরমোন যেটি নিঃসৃত হয় অগ্নাশয়ের আইলেট্স অব লেঙ্গারহেন্স থেকে। রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ না করলে হৃদরোগ, কিডনি রোগ ও দৃষ্টিশক্তি হারানোর মতো জটিলতার ঝুঁকি রয়েছে। মানবদেহে গ্লুকোজের স্বাভাবিক পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাওয়ার আগে প্রতি লিটার রক্তে ৩.৯-৫.৬ মিলিমোল এবং খাওয়ার ২ ঘন্টা পর ৭.৮ মিলিমোলের নিচে গ্লুকোজের মাত্রা থাকলে তাকে স্বাভাবিক বলা যায়। এর বেশি হলেই কোনো ব্যক্তির ডায়াবেটিস আছে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে বয়স, অন্যান্য অসুখ, ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা, গর্ভাবস্থা এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে রক্তে গ্লুকোজের লক্ষ্যমাত্রা ভিন্নতর হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে নিতে হবে। কোনো কোনো গ্লুকোমিটার মিলিগ্রাম এককে গ্লুকোজের ফলাফল দেয়, এ ক্ষেত্রে এই মাত্রাকে ১৮ দিয়ে ভাগ করলে মিলিমোল এককে ফলাফল পাওয়া যাবে।

নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা

সুস্থ্য বা অসুস্থ্য যেকোনো বয়সের মানুষের জন্যই নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন সম্ভব না হলেও সপ্তাহে অন্তত একদিন অবশ্যই রক্তের গ্লুকোজ মেপে দেখা উচিত। আর ডায়াবেটিক বা বহুমূত্র রোগীর জন্য ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী রক্তের এ পরীক্ষা দিনের বিভিন্ন সময়ে করতে হতে পারে যেমন: সকালে খালি পেটে, নাশতার দুই ঘণ্টা পরে, দুপুরে খাওয়ার আগে ও পরে, রাতে খাওয়ার আগে ও পরে প্রভৃতি। রোগী যদি নিজে নিজে করতে সক্ষম না হয়, গ্লুকোমিটার নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান বা কেয়ারগিভার খুব সহজেই এই পরীক্ষাটি করতে পারে। প্রাপ্ত ফলাফল ভালোভাবে রেকর্ড করে ডাক্তার বা নার্সকে রিপোর্ট করতে হয়।

রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপের পদ্ধতি:

রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য জরুরি। এই জরুরি কাজটিই কেবলমাত্র এক ফোঁটা রক্ত ব্যবহার করে তাতক্ষনিকভাবেই সম্পাদন করা যায়। সে জন্য প্রয়োজন হয় গ্লুকোমিটার নামক একটি যন্ত্র। গ্লুকোমিটার থাকলে সহজে ঘরে বসে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই কাজটি করতে পারেন। যন্ত্রটি হাতের কাছে রাখা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও জটিলতা প্রতিরোধে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে বিভিন্ন নামে গ্লুকোমিটার পাওয়া যায়। সকল গ্লুকোমিটারের ক্ষেত্রেই রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপ করার পদ্ধতি একই রকম। নিচে একজন পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের জন্য রক্তের গ্লুকোজ পরিমাপের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো:

১। প্রথমেই কেয়ারগিভারকে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে। রোগীকে শুভেচ্ছা বিনিময় করে সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করবে এবং তার অনুমতি গ্রহণ করবে।

২। গ্লুকোমিটারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে কার্যকারিতা যাচাই করে নিতে হবে। সুঁই বা নীডল লেনসেট পেনে ঠিকভাবে লাগিয়ে নিতে হবে।

৩। রোগীর যে আঙুল থেকে রক্ত নেয়া হবে সেটি নির্বাচন করতে হবে। অ্যালকোহল প্যাড বা জীবাণুনাশক দিয়ে আঙুলের মাথা পরিষ্কার করে নিয়ে পুরোপুরি শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

৪। গ্লুকোমিটারে একটি পরীক্ষার স্ট্রিপ প্রবেশ করাতে হবে। গ্লুকোমিটারের মডেলভেদে স্ট্রিপ আলাদা হয়, তাই শুধু তোমার মিটারের জন্য নির্দিষ্ট স্ট্রিপ ব্যবহার কর। নকল ও মেয়াদোত্তীর্ণ স্ট্রিপ ব্যবহার করা যাবেনা, এতে ভুল ফলাফল আসতে পারে। স্ট্রিপের কৌটা খোলার পর একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়, এ বিষয়ে নির্দেশিকায় লেখা তথ্য অনুসরণ করতে হবে। আধুনিক গ্লুকোমিটারে স্ট্রিপ প্রবেশ করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তা চালু হয়ে যায়।

৫। সুই বা ল্যানসেট (যা একটি কলমের মধ্যে থাকে) দিয়ে রোগীর হাতের আঙুলের অগ্রভাগ ফুটো করতে হবে। প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন আঙুল ব্যবহার করা উচিৎ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়ে আসা বড় এক ফোঁটা রক্তই যথেষ্ট।

৬। রক্তের ফোঁটা পরীক্ষার স্ট্রিপের নির্দিষ্ট জায়গায় স্পর্শ ধরে রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় রক্তের পরিমাণ গ্লুকোমিটারভেদে ভিন্ন (০.৩ থেকে ১ মাইক্রো লিটার) হতে পারে। খুব কম বা ছোট রক্ত হলে মিটারে কোনো

ফলাফল নাও আসতে পারে। রক্ত নির্দিষ্ট সেনসরে লাগলে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শোষিত হয় এবং মিটারটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পর্দায় প্রদর্শন করবে।

৭। তারিখ ও সময় দিয়ে প্রাপ্ত ফলাফল রেকর্ড করে রাখতে হবে এবং ব্যবহৃত সুই এবং স্ট্রিপ নির্দিষ্ট ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে হবে। অন্যান্য যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্র গুছিয়ে রাখতে হবে।

চিকিৎসককে রিপোর্ট করার সময় গ্লুকোজের রেকর্ড চার্ট সরবরাহ করতে হবে, যাতে রেকর্ড করা গ্লুকোজের মাত্রা দেখে ডাক্তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১.২.২ ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ অথবা ডায়াবেটিস মেলিটাস (ইংরেজিতে Diabetes mellitus) একটি হরমোন সংশ্লিষ্ট রোগ। দেহে অগ্ন্যাশয় যদি যথেষ্ট পরিমাণ ইনসুলিন তৈরি করতে না পারে অথবা শরীর যদি উৎপন্ন ইনসুলিন ব্যবহারে ব্যর্থ হয় তাহলে যে রোগ হয় তাকে 'ডায়াবেটিস' বা 'বহুমূত্র রোগ'। একে মধুমেহ রোগও বলা হয়ে থাকে। এসময় রক্তে চিনি বা শর্করার অতিরিক্ত উপস্থিতির কারণে কিছু অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, যেমন- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, বার বার ক্ষুধা পাওয়া, অতিরিক্ত পিপাসা লাগা ইত্যাদি। ইনসুলিনের ঘাটতিই হল এ রোগের মূল কথা। ইনসুলিন হল অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন, যার সহায়তায় দেহের কোষগুলো রক্ত থেকে গ্লুকোজকে নিতে সমর্থ হয় এবং একে শক্তির জন্য ব্যবহার করতে পারে। ইনসুলিন উৎপাদন বা ইনসুলিনের কাজ করার ক্ষমতা-এর যেকোনো একটি বা দুটোই যদি না হয়, তাহলে রক্তে বাড়তে থাকে গ্লুকোজ। আর একে নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে ঘটে নানা রকম জটিলতা, দেহের টিস্যু ও বিভিন্ন অঙ্গ বিকল হতে থাকে।

প্রকারভেদ:

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ টাইপ ওয়ান (টাইপ-১) ডায়াবেটিস ও টাইপ টু (টাইপ-২) ডায়াবেটিস। টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। শরীরে তখন গ্লুকোজ জমা হতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা এখনও সঠিকভাবে এর কারণ খুজে বের করতে পারেনি। তবে বিশ্বাস করা হয় যে এর পেছনে জিনগত কারণ থাকতে পারে অথবা অগ্ন্যাশয়ে ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলো নষ্ট হয়ে গেলেও এমনটি হতে পারে। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের শতকরা ১০ শতাংশ এই টাইপ ওয়ানে আক্রান্ত। অন্যদিকে টাইপ টু ডায়াবেটিসে যারা আক্রান্ত তাদের অগ্ন্যাশয়ে যথেষ্ট পরিমাণ ইনসুলিন উৎপন্ন হয়না অথবা এই হরমোনটি ঠিক মতো কাজ করে না। সাধারণত মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধ ব্যক্তিরা টাইপ টু ডায়াবেটিসে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও যাদের ওজন বেশি এবং যাদেরকে বেশিরভাগ সময় বসে বসে কাজ করতে হয় তাদেরও এই ধরনের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ এর সাধারণ লক্ষণসমূহ

- ঘন ঘন ক্ষুধা পাওয়া
- অল্প কাজ করেই ক্লান্ত হয়ে যাওয়া
- শরীরে এনার্জির অভাব বোধ করা
- প্রচুর পরিমাণে এবং ঘন ঘন পানির পিপাসা পাওয়া
- ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হওয়া
- হঠাৎ করে ওজন খুব বেড়ে যাওয়া বা খুব কমে যাওয়া
- চোখের ঝাপসা দেখা।
- জিভ শুকিয়ে যাওয়া
- গা চুলকানো, কেটে যাওয়া ক্ষত শুকোতে বেশি সময় নেয়া

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগের কারণসমূহ

যে কেউ যে কোনো বয়সে যেকোনো সময় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে নিম্নোক্ত শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে-

- যাদের বংশে বিশেষ করে বাবা-মা বা রক্ত সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে।
- যাদের ওজন অনেক বেশি ও যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করেন না।
- যারা বহুদিন ধরে কর্টিসোল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করেন।
- যেসব মহিলার গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস ছিল বা যাদের পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রম থাকে।
- যাদের রক্তচাপ আছে এবং রক্তে কোলেস্টেরল বেশি থাকে।

ডায়াবেটিস-সংক্রান্ত জটিলতা

ডায়াবেটিস এর কারণে ধীরে ধীরে দেহে বিভিন্নরকম জটিলতা দেখা দেয়, যত দীর্ঘ সময় ধরে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত থাকে জটিলতা তত বাড়তে থাকে। যা কখনো কখনো মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়। তার মধ্যে হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, কিডনিজনিত সমস্যা বা কিডনি ফেইলিওর, চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং তা থেকে অন্ধত্ব ইত্যাদি সমস্যা অন্যতম। এছাড়াও ডায়েবেটিক ফুট বা পায়ের আলসার ও ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আরেক আতংক, এর ফলে অনেক সময় রোগীর পাও কেটে ফেলতে হতে পারে। চর্মরোগ, শ্রবণজনিত সমস্যা, বিষণ্নতা ইত্যাদিও হতে পারে। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হট করে কমে গেলেও বিপদ হতে পারে। আবার হাইপারগ্লাইসেমিয়া বা রক্তের গ্লুকোজের মাত্রাধিক্যতায় রোগী ডায়াবেটিক কোমায় (অজ্ঞান) চলে যেতে পারে। অতিরিক্ত ঘাম, মাথা ঘোরা, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি, খিঁচুনি এমনকি এ থেকে অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে যদি সঠিক সময়ের মধ্যে তা ঠিক না করা হয়।

ডায়াবেটিস বা বহমূত্র রোগের প্রতিরোধ

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ-এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু করণীয় নিম্নরূপ:

- কায়িক শ্রম ও নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম করা যা ওজন ও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
- খাদ্য তালিকায় বেশি বেশি আঁশযুক্ত খাবার রাখা যেমন ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি ।
- শস্যদানা যেমন গম, ভুট্টা, বার্লি ইত্যাদি বা এসব থেকে তৈরি খাবার যেমন ব্রেড বা পাস্তাজাতীয় খাবার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। এটি শুধু ডায়াবেটিস নয়, অন্য আরো অনেক ধরনের রোগ যেমন- হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা, আরথ্রাইটিস ইত্যাদি প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- খাদ্য তালিকা থেকে শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাবার বাদ দেওয়া বা খুব অল্প পরিমাণে রাখা।

এগুলো মেনে চলা ছাড়াও যাদের পরিবারে বা রক্তের সম্পর্ক আছে এমন আত্মীয়দের মাঝে ডায়াবেটিস আছে তারা ৪৫ বছর বয়সের পর নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করাতে পারেন। এছাড়াও ৪৫ বছর বয়সের আগেও যদি অতিরিক্ত ওজন থাকে তবে সেই ব্যক্তিও পরীক্ষা করাতে পারেন।

ডায়াবেটিস বা বহমূত্র রোগীর ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই ডায়াবেটিস এখন এক মহামারী রোগ। মাত্র কয়েক দশক আগেও এটি ছিল খুব স্বল্প পরিচিত রোগ। অথচ বর্তমানে শুধু উন্নত বিশ্বেই নয়, বরং উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত বিশ্বেও অসংক্রামক ব্যাধির তালিকায় ডায়াবেটিস অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৭৯ লাখ ৫০ হাজার এবং প্রতি বছর গড়ে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ নতুন করে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন। স্থূলতা বা ওজন বৃদ্ধি, মেদবাহুল্য, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা, মানসিক চাপ, ধূমপান ইত্যাদির কারণে এ রোগে আক্রান্তের হার বাড়ছে। এ ছাড়াও অনিয়িমিত জীবনযাপন, দ্রুত নগরায়ন এবং পাশাপাশি উচ্চ শর্করা এবং কম আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে। বংশগত কারণেও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। কোন ধরনের ডায়াবেটিস তার উপর নির্ভর করে নিয়মিত রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয়, মুখে খাওয়ার ঔষধ, ইনসুলিন ইত্যাদির মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডায়েট মেনে চলা এবং নিয়মিত হাঁটা বা ব্যায়াম করা ডায়াবেটিস চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খাদ্য তালিকায় বেশি বেশি আঁশযুক্ত খাবার যুক্ত করা এবং চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার ত্যাগ করা জরুরি। প্রতিবেলায় একবারে বেশি করে না খেয়ে বারে বারে অল্প করে খাওয়ার অভ্যাস করতে ডায়াবেটিস রোগীদের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনটি ‘ডি’ মেনে চলা জরুরি। যেমন- ডায়েট, ডিসিপ্লিন এবং ড্রাগ। ডায়াবেটিক রোগীর খাদ্যাভ্যাসে কিছু সাধারণ নিয়মাবলি মেনে চলা উচিত, যেমন-

- তিনবেলার খাবার ছয়বারে ভাগ করে খেতে হবে এবং কোনো বেলার খাবারই বাদ দেওয়া যাবে না।
- চর্বিজাতীয় খাবার কম গ্রহণ এবং মিষ্টি জাতীয় খাদ্য পরিহার করতে হবে।

- ওজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাদ্যতালিকা মেনে চলতে হবে।
- খাবার খেতে অসুবিধা হলে রক্তে শর্করার পরিমাণ পরীক্ষা করে ঔষুধ সমন্বয় করে নিতে হবে।
- প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

ডায়াবেটিস রোগীর ব্যায়াম

ডায়াবেটিস রোগীরা সাধারণত শারীরিকভাবে সক্ষম হলে নিয়মিত হাঁটা, জগিং, ব্যায়াম ইত্যাদি করতে পারেন। ব্যায়াম রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। ব্যায়ামের মধ্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে হাঁটা। সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট করে হাঁটতে হবে। দিনের যেকোনো সময় হাঁটা যায়। এ ছাড়া ট্রেডমিলে হাঁটা বা দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, সাইক্লিং, দড়িলাফ ইত্যাদি হাঁটার বিকল্প ব্যায়াম হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এই কাজগুলো করা সক্ষম হয়না। তখন পরোক্ষ উপায়ে ব্যক্তিটিকে কিছুটা নড়া-চড়া করানো যেতে পারে। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানকে ডাক্তার বা ফিজিওথেরাপিস্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এই কাজগুলো করতে হয়।

১.২.৩ ইনসুলিন প্রদান

ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ইনসুলিন একটি প্রধানতম চিকিৎসা। বিভিন্ন ধরনের ইনসুলিন বাজারে পাওয়া যায়। রাসায়নিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে কোনোটিকে স্বল্পমেয়াদি, মাঝারি, আবার কোনোটিকে দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে তৈরি করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য সারা দিনের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করা। এসব ইনসুলিন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রোগীর সঙ্গে আলোচনা করে তার জন্য উপযোগী নির্দিষ্ট মাত্রা—দিনে দুই, তিন ও চারবার, আবার অনেক ক্ষেত্রে দুই ধরনের ইনসুলিনই নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। সাধারণত যখন মুখে খাওয়ার ঔষধ রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, তখনই কেবল ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন রোগীর শরীরে দেওয়া হয়ে থাকে।

ইনসুলিন কি?

ইনসুলিন আমাদের দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। পাকস্থলীর পেছনে থাকা অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস নামের একটি গ্রন্থি থেকে এটি তৈরি হয়। ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজ অর্থাৎ সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ডায়াবেটিস হলে দেহে সুগার নিয়ন্ত্রণের এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। এই ব্যাঘাত তিনভাবে ঘটতে পারে—

১. শরীরে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি না হয়ে
২. পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি হয়েও সেটি সঠিকভাবে কাজ না করলে। একে 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স' বলা হয়
৩. শরীরে ইনসুলিন তৈরি হওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে

ইনসুলিন প্রোটিনজাতীয় একটি হরমোন। মুখের মাধ্যমে গ্রহণ করা হলে অন্যান্য প্রোটিনের মতো এটিও হজম প্রক্রিয়ায় ভেঙে যায়। ফলে রক্তপ্রবাহে সঠিকভাবে পৌঁছতে পারে না। তাই এটি ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসুল হিসেবে সেবন করা যায় না। ইনসুলিন যেন রক্তপ্রবাহে সঠিকভাবে পৌঁছতে পারে সেটি নিশ্চিত করার জন্য ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিতে হয়। রোগীর ডায়াবেটিসের ধরন এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুযায়ী ডাক্তার ইনসুলিনের ধরন ও ডোজ নির্ধারণ করে দিবেন।

ইনসুলিন দেওয়ার পদ্ধতি

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনেক রোগীকেই রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইনসুলিন নিতে হয়। কিন্তু সঠিক পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে অনেকে শরীরের ভুল স্থানে ভুল ডোজে ইনসুলিন নিয়ে ফেলেন। একারণে একদিকে রক্তের সুগার সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে চামড়া শক্ত হয়ে গিয়ে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে। এই অনুচ্ছেদে ইনসুলিন সিরিঞ্জ ও ইনসুলিন পেনের সাহায্যে ইনসুলিন দেওয়ার উপায় তুলে ধরা হয়েছে। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে রোগী নিজেই সহজ ও সঠিকভাবে ইনসুলিন নিতে পারবেন। পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানও রোগীকে সঠিকভাবে ইনসুলিন প্রদান করতে পারবে।

ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

১. ইনসুলিন: বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক ইনসুলিন।

২. ইনসুলিন সিরিঞ্জ অথবা ইনসুলিন পেন: ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়ার জন্য সিরিঞ্জ অথবা পেন—যেকোনো একটি ব্যবহার করা যায়।

- ইনসুলিন সিরিঞ্জ: এই বিশেষ সিরিঞ্জগুলো বিভিন্ন সাইজের হতে পারে। ইনসুলিনের ধরনভেদে নির্দিষ্ট সাইজের সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হয়। প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সিরিঞ্জে ইনসুলিন নিয়ে এরপরে ইনজেকশনটি করতে হয়।
- ইনসুলিন পেন বা কলম: এটি দুই ধরনের হতে পারে। এক ধরনের ইনসুলিন পেন আছে যাতে আগে থেকেই ইনসুলিন ভরা থাকে। কলমের ভেতরের ইনসুলিন শেষ হয়ে গেলে কলমটি ফেলে দিতে হয়। আরেক ধরনের ইনসুলিন পেন আছে যেটির ভায়াল অথবা কার্তুজ (কার্ট্রিজ) পরিবর্তন করে বারবার ব্যবহার করা যায়।

এসব কলমের সাথে আলাদাভাবে সুঁই ব্যবহার করতে হয়। সুঁইগুলো কেবল একবার ব্যবহার করা যায়। এসব সুঁইকে কেবল ত্বকের নিচে বা সাব-কিউটেনিয়াস উপায়ে দিতে হয়—পেশী অথবা শিরার মধ্য দিয়ে দিতে হয় না। বলে এগুলো বেশ ছোটো ও সরু হয়।

৩. ধারালো বস্তু ফেলার নির্দিষ্ট স্থান: হোম কেয়ার সেটিংসে ধারালো বস্তু ফেলার জন্য একটি ঝুড়ি নির্দিষ্ট করে রাখা যেতে পারে যেখানে ব্যবহৃত সুঁইটি নিরাপদে ফেলে দেওয়া যাবে। হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন রঙের কন্টেইনার থাকে। সেক্ষেত্রে লাল রঙের কন্টেইনারে ব্যবহৃত সুঁইটি ফেলতে হবে।

চিত্র ১.২: ইনসুলিন সিরিঞ্জ ও ইনসুলিন কলম পেন

ইনসুলিন সিরিঞ্জ দিয়ে ইনসুলিন দেওয়ার নিয়ম

আটটি সহজ ধাপ অনুসরণ করে রোগী নিজেই ঘরে বসে ইনসুলিন সিরিঞ্জ এর সাহায্যে ইনসুলিন নিতে পারেন। আবার একই ধাপ অনুসরণ করে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানও ইনসুলিন প্রদান করতে পারে। ধাপগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—

ধাপ ১: হাত ভালোভাবে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

ধাপ ২: ইনজেকশনটি শরীরের কোন জায়গায় দেওয়া হবে সেটি ঠিক করে নিতে হবে। ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হলো শরীরের চর্বিযুক্ত স্থান। যেমন: তলপেট (নাভির নিচের অংশ), উরু অথবা নিতম্ব প্রভৃতি স্থান। প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা নির্বাচন করা উচিত। আগে যেখানে ইনসুলিন নেয়া হয়েছে তার থেকে অন্তত ১ সেন্টিমিটার বা আধা ইঞ্চি দূরে পরের ইনজেকশনটি দেওয়া উচিত। একই জায়গায় বারবার ইনজেকশন দিলে ওই জায়গাটি শক্ত হয়ে ফুলে যেতে পারে—যা পরবর্তীতে ইনসুলিন শোষণে ও সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দিতে পারে।

ধাপ ৩: ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক ইনসুলিনটি বেছে দাও। ইনসুলিনের মেয়াদ আছে কি না সেটি বোতলের গায়ে লেখা তারিখ থেকে জেনে নাও। ইনসুলিন ব্যবহারের পূর্বে সাধারণত বোতল বা ভায়াল ঝাঁকিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে ঘোলা প্রকৃতির ইনসুলিন ব্যবহারের পূর্বে ইনসুলিন পুরোপুরি মিশে যাওয়া পর্যন্ত ভায়ালটি দুই হাতের তালুর মাঝে রেখে আলতো করে ঘুরিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ইনসুলিনের প্যাকেটে থাকা নির্দেশনাটি ভালোমতো পড়ে নিতে হবে।

ধাপ ৪: ইনসুলিন সিরিঞ্জটি মোড়ক থেকে বের করে ওপরের ক্যাপটি খুলে নাও। সিরিঞ্জটি খাড়া করে ধর। এবার সিরিঞ্জের প্লাঞ্জার বা দন্ড টেনে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যত ইউনিট ইনসুলিন নিতে হবে ততটুকু (তত cc বা ml) বাতাস সিরিঞ্জে প্রবেশ করাও। ইনসুলিনের ধরনভেদে নির্দিষ্ট সাইজের সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হয়। তা নাহলে ভুল ডোজে ইনসুলিন নেওয়ার মাধ্যমে মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ইনসুলিন নেওয়ার সময়ে ইউনিট অনুযায়ী উপযুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হচ্ছে কি না সেই বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। ডাক্তারের কাছ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিতে হবে।

ধাপ ৫: ইনসুলিনের ভায়ালটি খাড়া করে ধরে বোতলের ভেতরে সিরিঞ্জের সুঁইটি পুরোপুরি ঢুকিয়ে দাও। এরপর সিরিঞ্জের প্লাঞ্জার বা দন্ড চেপে সিরিঞ্জের ভেতরে থাকা বাতাস ভায়ালে ঢুকিয়ে দাও। এতে করে সিরিঞ্জে ইনসুলিন তুলতে সুবিধা হবে। এবার ভায়ালটি উল্টো করে ধরে নির্ধারিত ইউনিটের চেয়ে সামান্য বেশি ইনসুলিন সিরিঞ্জে টেনে নাও। খেয়াল রাখবে ভায়ালের ভেতরে সুঁইয়ের মাথার চারিদিকে যেন ইনসুলিন থাকে এবং কোনো বাতাস না থাকে।

ধাপ ৬: এরপর এমনভাবে সিরিঞ্জটি ধর যেন সুঁই ওপরে ও প্লাঞ্জার নিচে থাকে। সিরিঞ্জের গায়ে আলতো করে কয়েকটি টোকা দাও যেন ভেতরে কোনো বাতাস থাকলে তা ওপরের দিকে উঠে আসে। এবার যতক্ষণ পর্যন্ত সুঁইয়ের মাথায় ইনসুলিন না দেখা যায় ততক্ষণ সিরিঞ্জের নিচের দিকে থাকা প্লাঞ্জারে ধীরে ধীরে চাপ দিন।

এই কাজটিকে বলা হয় 'প্রাইমিং'। সুঁই ও সিরিঞ্জের ভেতরে কোনো বাতাস থাকলে তা এই পদ্ধতিতে বের করা যায়। ফলে ডোজ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়। এভাবে সিরিঞ্জে যেন কেবল নির্ধারিত ডোজের ইনসুলিন থাকে সেটি নিশ্চিত কর।

ধাপ ৭: যেখানে ইনজেকশনটি নিবে সেই স্থান পরিষ্কার ও শুকনো আছে কি না সেটি নিশ্চিত কর। এক্ষেত্রে এলকোহল সোয়াব ব্যবহার করা যেতে পাড়ে। ইনজেকশন দেওয়ার আগে ত্বক আস্তে চিমটি দিয়ে উঠিয়ে নিতে পার। এবার সমকোণে বা খাড়াভাবে (৯০ ডিগ্রী কোণে) সুঁইটি শরীরে পুরোপুরি প্রবেশ করাও। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো সিরিঞ্জ খালি না হয় ততক্ষণ প্লাঞ্জারে চাপ দিয়ে ধরে রাখ।

ধাপ ৮: সুঁইটি বের করে ফেলার আগে ইনসুলিন যেন শরীরে প্রবেশ করার যথেষ্ট সময় পায় সেজন্য এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনে নাও। ত্বকে চিমটি দিয়ে রাখলে তা সরিয়ে নাও। এবার সুঁইটি বের করে ফেল। অবশেষে সুঁইসহ সিরিঞ্জটি নিরাপদ স্থানে ফেলে দাও।

ইনসুলিন পেন বা কলম দিয়ে ইনসুলিন দেওয়ার নিয়ম

ইনসুলিন পেন এর সাহায্যে সাতটি সহজ ধাপে ইনসুলিন নেওয়া যায়। ধাপগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—

ধাপ ১: হাত ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

ধাপ ২: ইনজেকশনটি শরীরের কোন জায়গায় দিবে সেটি ঠিক কর। ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হলো শরীরের চর্বিযুক্ত স্থান। যেমন: তলপেট (নাভির নিচের অংশ), উরু অথবা নিতম্ব। প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ইনজেকশন নেওয়া উচিত। আগে যেখানে ইনসুলিন নেওয়া হয়েছে তার থেকে থেকে অন্তত ১ সেন্টিমিটার বা আধা ইঞ্চি দূরে পরের ইনজেকশনটি দেওয়া উচিত। একই জায়গায় বারবার ইনজেকশন দিলে ওই জায়গাটি শক্ত হয়ে ফুলে যেতে পারে—যা পরবর্তীতে ইনসুলিন শোষণে ও সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দিবে।

ধাপ ৩: ইনসুলিন পেন এর বাইরের ও ভেতরের ক্যাপ খুলে এতে সুঁইটি লাগিয়ে নাও। ডায়াল ঘুরিয়ে দুই ইউনিটে নিয়ে আসুন। এরপর পেনটিকে সোজা করে ধর। যতক্ষণ পর্যন্ত সুঁইয়ের মাথায় ইনসুলিন না দেখা যায় ততক্ষণ পেনের পেছনে থাকা প্লাঞ্জারে ধীরে ধীরে চাপ দাও। এই কাজটিকে বলা হয় 'প্রাইমিং'। সুঁই ও ইনসুলিন ভায়াল বা কার্তুজের ভেতরে কোনো বাতাস থাকলে তা এই পদ্ধতিতে বের করা যায়, ফলে ডোজ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

ধাপ ৪: এবার ডায়াল ঘুরিয়ে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ডোজটি বাছাই কর। যেখানে ইনজেকশনটি নিবে সেই স্থান পরিষ্কার ও শুকনো আছে কি না তা নিশ্চিত কর।

ধাপ ৫: সমকোণে বা খাড়াভাবে (৯০ ডিগ্রী কোণে) সুঁইটি শরীরে প্রবেশ করাও। ইনজেকশন দেওয়ার আগে ত্বক আস্তে চিমটি দিয়ে উঠিয়ে নিতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ডায়ালটি জিরোতে (০) ফেরত না যায়, ততক্ষণ প্লাঞ্জারে চাপ দিয়ে ধরে রাখ।

ধাপ ৬: সুঁইটি সরানোর আগে ইনসুলিন যেন শরীরে প্রবেশ করার যথেষ্ট সময় পায়, সেজন্য ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনে নাও। ত্বকে চিমটি দিয়ে রাখলে তা সরিয়ে নাও।

ধাপ ৭: সুঁইটি সরিয়ে নিরাপদ স্থানে ফেলে দাও।

ইনসুলিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: অনেকেই ইনসুলিন ইনজেকশন শুরু করার আগে এটি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন। কারও কারও সুঁই দেখে ভয় লাগতে পারে, কেউ কেউ অস্থির বোধ করতে পারে, ব্যথা নিয়ে চিন্তিত হতে পারে—এমনকি অনেকে অন্যদের সামনে ইনজেকশন নিতে লজ্জা অথবা ভয় পেতে পারে। এই ধরনের অনুভূতি হওয়া একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ানের দায়িত্ব হচ্ছে রোগীকে সঠিকভাবে কাউন্সেলিং করা। পরিচিত কোনো আত্মীয়, বন্ধু, সহকর্মী অথবা প্রতিবেশী যদি ইনসুলিন ব্যবহার করে থাকে তাহলে তাদের সাথেও এই ব্যাপারে রোগীকে কথা বলানো যেতে পারে। ডায়াবেটিস ও ইনসুলিন নিয়ে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, তাই এসব আলোচনা থেকে রোগী তার নিজের জন্য উপযোগী কিছু পরামর্শ পেতে পারে। অন্যান্য ঔষধের মতোই ইনসুলিন নিলে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন:

- মাথাব্যথা, বমি বমি লাগা, সর্দিজ্বর অথবা ফ্লু এর মতো লক্ষণ
- হাইপোগ্লাইসেমিয়া: ইনসুলিনের সবচেয়ে কমন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো হাইপোগ্লাইসেমিয়া। রক্তে গ্লুকোজ তথা সুগারের পরিমাণ ন্যূনতম স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কমে গেলে তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলা হয়। অনেকে একে সংক্ষেপে 'হাইপো' হিসেবে চেনেন। মূলত ইনসুলিন নিতে হয় এমন ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দেয়। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে ইনসুলিন নিলে অথবা ইনসুলিন নেওয়ার পরে খাবার না খেলে এই অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। ঘন ঘন হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার অন্যতম কারণ হলো ভুল ডোজে ইনসুলিন নেওয়া। তাই এমন ক্ষেত্রে ডাক্তারের সাথে কথা বলে সঠিক ডোজ এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।
- ইনজেকশনের জায়গায় কালশিটে দাগ পড়া: ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়ার সময়ে চামড়ার নিচের কোনো ছোটো রক্তনালিকায় আঘাত লাগলে তা থেকে ত্বকে কালশিটে দাগ পড়তে পারে। যারা নিয়মিত ইনসুলিন নেয় তাদের ইনজেকশন নেওয়ার পদ্ধতিতে ত্রুটি না থাকলেও, কখনো কখনো এমন কালশিটে হতে পারে। এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে ইনসুলিন দেওয়া চালিয়ে যেতে হবে এবং রোগীকেও সঠিক নিয়ম অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল সুঁইয়ের সাইজ পরিবর্তন করে অথবা প্রতিবার ইনসুলিন নেওয়ার পরে ব্যবহৃত সুঁই পরিবর্তন করে এমন কালশিটে দাগ পড়া কমিয়ে আনা যায়।
- ইনজেকশনের জায়গা ফুলে যাওয়া: একই জায়গায় বারবার ইনসুলিন নেওয়া হলে জায়গাটি শক্ত হয়ে ফুলে যায়। একে মেডিকেলের ভাষায় 'লাইপো-হাইপারট্রফি' বা সংক্ষেপে 'লাইপো' বলা হয়। এমন ফোলা ইনসুলিন শোষণে ও সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। তাই প্রতিবার ইনসুলিন নেওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গা বেছে নিতে হবে। আগেরবার যেখানে ইনসুলিন নেওয়া হয়েছে সেটি থেকে অন্তত এক সেন্টিমিটার বা আধা ইঞ্চি দূরে পরের ইনজেকশনটি দেওয়া উচিত। বেশ কিছুদিন পার হওয়ার পরেও 'লাইপো' বা ফোলা সেরে না উঠলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

১.৩ স্যাম্পল কালেকশন বা নমুনা সংগ্রহ

আমরা জানি যে, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমেই একজন সুস্থ অথবা অসুস্থ রোগীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। সঠিক রোগ নির্নয় বা ডায়গনসিস এবং চিকিৎসার সিদ্ধান্তগুলো আংশিকভাবে এই পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভুলতার উপর নির্ভর করে। তাই সঠিক ফলাফলের জন্য যথাযথভাবে রোগীকে প্রস্তুতকরন, নমুনা সংগ্রহ এবং পদ্ধতি হল একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। তাই যে সমস্ত সেটিংসে নানা ধরনের নমুনাগুলো সংগ্রহ করা হয় সে সমস্ত জায়গায় দায়িত্বে থাকা নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের বর্তমান প্রচলিত জীবাণুমুক্ত কৌশলগুলো অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। যেমন, সুঁচ, সিরিঞ্জ, ক্যাথেটার, কলোস্টমি ব্যাগ, বাটারফ্লাই নিডল, পিপিই এবং অন্যান্য সরঞ্জাম জীবানুমুক্তকরন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সতর্কতামূলক জ্ঞান থাকা জরুরি। মনে রাখতে হবে নমুনা সংগ্রহ করা হয় এমন সব জৈবিক উপাদানকে বিষাক্ত উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে এর বর্জ্য ব্যাবস্থাপনার পাশাপাশি সঠিক পদ্ধতি সমূহ গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। রোগীদের এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের উভয়ের নিরাপত্তার জন্য নমুনা সংগ্রহকারী এবং প্রস্তুতির সাথে জড়িত সকলকেই বর্তমানে সুপারিশকৃত সকল মান বজায় রেখে এই কাজটি সম্পন্ন করতে হয়।

স্যাম্পল বা নমুনা: ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য কোনো ব্যক্তির শরীর থেকে যে পদার্থ নেওয়া হয় তাকে নমুনা (Specimen) বলে। যেমন: রক্ত, মল, কফ, প্রসাব, সোয়াব ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরনের স্যাম্পল: চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসংখ্য পরীক্ষা রয়েছে এবং যেগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ধরনের নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। তবে সাধারণত যে সমস্ত নমুনাসমূহ সংগ্রহ করা হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

ক) রক্তের নমুনা: এটি করার জন্য প্রশিক্ষিত কেউ (সাধারণত একজন ফ্লেবোটোমিস্ট, ডাক্তার বা নার্স) দ্বারা রক্তনালী (কৈশিক, শিরা এবং কখনও কখনও ধমনী) থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিশেষ সংগ্রহের টিউবে রক্ত বের করার জন্য একটি সুই ব্যবহার করে নমুনা নেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের টিউব ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু রক্তের নমুনা আঙুলের খোঁচা দিয়ে পাওয়া যেতে পারে যা শুধুমাত্র এক ফোঁটা রক্ত দিয়েই করা যায়, যেমন গ্লুকোজ পরীক্ষা।	 চিত্র ১.৩: বাটারফ্লাই সুচ ব্যবহার করে রক্তের নমুনা সংগ্রহ
খ) মল সংগ্রহ: ব্যক্তিকে টয়লেটে পাঠিয়েই সাধারণত এই নমুনা নিজেকেই সংগ্রহ করতে বলা হয়। তবে মুমূর্ষ রোগীর কাছ থেকে সংগ্রহ করার পদ্ধতিটি ভিন্ন থেকে ভিন্নতর হতে পারে। মলের সাথে যাতে প্রসাব মিশ্রিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখাটাই এই নমুনা সংগ্রহের মূল সাবধানতার বিষয়। এই অধ্যায়ে পরবর্তীতে মল সংগ্রহের পদ্ধতি আলোচনা করা হবে।	 চিত্র ১.৪: মল সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত কন্টেইনার বা কৌটা।

গ) প্রস্রাবের নমুনা: এই নমুনা সংগ্রহের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীকে একটি পাত্রে বা কন্টেইনারে প্রস্রাব ধরার জন্য বলা হয়। কন্টেইনারে প্রসাব ধারনের পূর্বে মূত্রনালীর বাইরের অংগের সংস্পর্শের দ্বারা যাতে নমুনা দূষিত না হয় সে জন্যে রোগী কীভাবে যৌনাঙ্গ পরিষ্কার করবে সে বিষয়ে নির্দেশনাবলি দেওয়া হয়। তাছাড়া ব্যক্তিকে কিছু প্রসাব নিঃসরণ করার পর মাঝ পথে কিভাবে কন্টেইনারে প্রসাব সংগ্রহ করবে সে ব্যাপারেও স্বাস্থ্যজ্ঞান প্রদান করা হয়। রোগীর অবস্থাভেদে কখনও কখনও ক্যাথেটার থেকেও বিশেষ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে প্রসাবের নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।	 চিত্র ১.৫: ক্যাথেটার থেকে সিরিঞ্জের মাধ্যমে প্রসাবের নমুনা সংগ্রহ।
ঘ) কফ সংগ্রহ: এই নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে রোগীকে যতটা সম্ভব ফুসফুসের ভিতর দিক থেকে কাশির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। (একজন স্বাস্থ্যকর্মী এ কাজটি করার জন্য রোগীকে সহায়তা করতে পারেন।) কোনো কিছু পান অথবা খাবারের পূর্বে কফ সংগ্রহের জন্য সকাল বেলাকেই মোক্ষম সময় বলে বিবেচনা করা হয়। এ সময় রোগীকে কন্টেইনারে কফ দেওয়ার আগে ধীরে ধীরে কয়েকবার গভীর শ্বাস নেওয়ার পরে কাশি দিতে বলা হয়। সংগৃহীত কফ অপেক্ষাকৃত ঘন হওয়া উচিত যেন সেটা সাধারণ লালা মিশ্রিত না হয়।	 চিত্র ১.৬:ব্যক্তি নিজে নিজে কফ সংগ্রহে অংশগ্রহণ করছেন।
ঙ) নাসোফেরেঞ্জিয়াল সোয়াব (Nasopharyngeal Swab) সংগ্রহ : এটি ক্লিনিকাল পরীক্ষার জন্য একটি পদ্ধতি যেটি রোগীর অনুনাসিক ফরণ এর পিছনে থেকে নাক এবং গলা থেকে সোয়াব সংগ্রহের মাধ্যমে করা হয়। নাকের শেষ প্রান্তে গিয়ে গলার পিছনের দেওয়াল (Nasopharynx) থেকে একটি প্লাস্টিকের সুক্তি সোয়াব বেষ্টিত সরু কাঠি দিয়ে এই নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। এটি নাকে প্রবেশের সাথে সাথেই রোগী হাঁচি দিতে শুরু করে। যার ফলে নাকের শেষ পর্যন্ত যাওয়া এবং সেখানে স্টিকের কটন সোক করার জন্য নুন্যতম ২ সেকেন্ড স্টিকটি ধরে রাখতে হয়। এই ক্ষেত্রে যিনি নমুনা নিবেন তাকে ভালোভাবে পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুয়েপমেন্ট (PPE) পরতে হয় ইনফেকশন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।	 চিত্র ১.৭: নাসোফেরেঞ্জিয়াল সোয়াব সংগ্রহ

১.৪ রোগীকে সঠিক পজিশনিং ও স্থানান্তর করা

পজিশনিং বলতে একজন রোগীকে বিছানায় বা অন্য কোথাও সঠিকভাবে শোয়ানো কিংবা বসানোকে বুঝানো হয় যাতে করে তার শরীরের এলাইনমেন্ট নিরপেক্ষ থাকে এবং রোগীর সর্বোচ্চ আরাম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। আমরা সুস্থ মানুষেরাও সাধারণত একভাবে বেশিক্ষণ শুয়ে বা বসে থাকতে পারিনা। হাতে-পায়ে ঝিম ঝিম ধরাসহ আরো অনেক সমস্যা সামনে এসে হাজির হয়। ঠিক তেমনি একজন রোগী যিনি শারীরিক বা মানসিক সমস্যাগ্রস্ত হয়ে কেয়ারগিভারের সহায়তা নিচ্ছেন, তাকেও আমাদের উচিৎ হবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্দিষ্ট নিয়মে পজিশনিং করা। বিশেষ করে অজ্ঞান রোগী কিংবা সম্পূর্ণরূপে বিছানায় শয্যাশায়ী রোগীর (Bed Ridden Patient) ক্ষেত্রে এটি অতীব জরুরি। অন্যথায় প্রেসার সোরের মত মারাত্মক অসুবিধা তৈরি হতে পারে। আবার নানা প্রয়োজনে আমাদেরকে হাসপাতালে বা বাসাবাড়িতে থাকা রোগীকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করতে হয়। যেমন; টয়লেট করানো, গোসল করানো, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। হইলচেয়ার থেকে বিছানা, বিছানা থেকে হইলচেয়ার, চেয়ার থেকে হইলচেয়ার এরকম অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে। সঠিকভাবে স্থানান্তর করতে না পারলে রোগী পড়ে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। একজন রোগীকে সঠিকভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করা কেয়ারগিভারের অত্যাবশ্যকীয় একটি দক্ষতা। এই অংশে রোগীকে সঠিকভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করার উপায় অনুশীলন করার পাশাপাশি হইলচেয়ারের ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

১.৪.১ রোগীকে সঠিক পজিশনে রাখা ও স্থানান্তর করার গুরুত্ব

কখন করতে হয়: যখন একজন রোগী-

- শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম হয়।
- শারীরিক কোনো সমস্যাগ্রস্ত কিংবা তীব্র ব্যথা থাকে যেক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হয়।
- প্রেসার আলসারে আক্রান্ত থাকেন কিংবা প্রেসার আলসারে আক্রান্ত হবার ঝুকিতে থাকেন।
- মস্তিস্কের সমস্যায় ভুগেন যেক্ষেত্রে তার স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যহত হচ্ছে।
- রেস্টলেস কিংবা অস্থীর প্রকৃতির।
- দাঁত মাজা, গোসল করা, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি দৈনন্দিন কাজকর্ম বিছানাতেই সম্পন্ন করতে বাধ্য হচ্ছেন কিংবা নিজে নিজে করতে পারছেন না।
- কোন নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিংবা অপারেশন কিংবা অন্য কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবেন।

গুরুত্ব:

- সঠিক পজিশনিং ও স্থানান্তর রোগীকে শরীরবৃত্তীয়ভাবে স্বক্রিয় রাখে। রোগীর রক্ত ও স্নায়ুবিক চলাচলকে স্বাভাবিক রাখে।
- প্রেসার সোর বা প্রেসার আলসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- সঠিকভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করার মাধ্যমে রোগীকে আরাম ও স্থিরতা প্রদান করা সম্ভব, এতে রোগী নির্ভার অনুভব করে
- সঠিক পজিশনিং ডাক্তার, নার্সদের কিছু কিছু পদ্ধতি সম্পন্ন করতে সুবিধা প্রদান করে
- রোগীর পড়ে যাওয়ার আশংকা কমায় এবং রোগীর নিরাপত্তা জোরদার করে। এতে রোগীর বিভিন্ন ইনজুরির ঝুঁকি হ্রাস পায়।
- সঠিকভাবে পজিশনিং ও স্থানান্তর করা গেলে রোগী অনেক কাজ নিজে নিজেই সম্পন্ন করতে পারে। যেমন: দাঁত মাজা ও মুখ ধোয়া, খাবার খাওয়া প্রভৃতি। এতে রোগীর স্বনির্ভরতা ও আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পায়।

প্রেসার আলসার:

রোগী শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম হলে একটি খুব জটিল সমস্যা তৈরি হতে পারে যার নাম প্রেসার আলসার। একে প্রেসার সোর বা বেড সোর নামেও অভিহিত করা হয়। ইহা এক ধরনের ক্ষত যাহা রোগীর শরীরে বিছানা, ম্যাট্রেস বা অন্য কোনো শক্ত কিছুর সাথে দীর্ঘদিন চাপের ফলে সৃষ্টি হয়। সাধারণত রোগীর দেহের হাড় সংশ্লিষ্ট অংশে (Bony Prominense; উচ্চারণ: বোনি প্রমিনেন্স) এটি বেশি হয়ে থাকে। এ ধরনের কিছু স্থানের উদাহরণ হচ্ছে; মাথার পিছনের অংশ, দুই কাঁধের শক্ত অংশ, কনুই, নিতম্ব, পুচ্ছদেশীয় অংশ, হাঁটু, পায়ের গোড়ালি ও হিল প্রভৃতি। এ ধরনের অংশ যখন দীর্ঘক্ষণ চাপ খেয়ে থাকে, তখন আস্তে আস্তে এ সমস্ত অংশের টিস্যুতে অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত হয়, যার ফলে টিস্যুগুলো মরে যেতে থাকে। সুস্থ স্বাভাবিক চামড়ায় এভাবে ফাটল ধরে যার থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে প্রেসার সোর বা চাপ ক্ষত।

(ক) মাথার পিছনের অংশ; শোল্ডার ব্লেড; কোমরের নিচ পায়ের হিল (খ) কান কাঁধ; কোমর; হাঁটু; পায়ের গোড়ালি

চিত্র ১.৮: প্রেসার আলসারের সচরাচর জায়গা

প্রেসার আলসারের পর্যায়: প্রেসার আলসার সাধারণত ৪টি পর্যায়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা:

প্রথম পর্যায়: জায়গাটি লালচে, ফ্যাকাশে অথবা কালচে বর্ণ ধারণ করে এবং চাপ বন্ধ করার ১ মিনিটের মধ্যে তার স্বাভাবিক রঙে ফিরে আসেনা। জায়গাটি আশেপাশের অংশগুলো থেকে তুলনামূলকভাবে একটি বেশি শক্ত, নরম, উষ্ণ বা ঠান্ডা, অথবা বেশি ব্যথাদায়ক থাকতে পারে। ত্বকের রঙ কালো এরকম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি শুরুর দিকে বুঝতে পারা একটু কঠিন বটে।	চিত্র ১.৯: চতুর্থ পর্যায়ের একটি প্রেসার আলসার

দ্বিতীয় পর্যায়: এ পর্যায়ে জায়গাটিকে গোলাপি বা লালচে রঙের টিস্যুসহ একটি অগভীর খোলা ক্ষতের মত দেখাবে। মাঝে মাঝে এটিকে ফোস্কার মতোও দেখাতে পারে।

তৃতীয় পর্যায়: এ পর্যায়ে আরো অধিক টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চামড়ার নিচে অবস্থিত চর্বি এ পর্যায়ে দৃশ্যমান হয়।

চতুর্থ পর্যায়: একটি গভীর গর্ত তৈরী হয়। মাংশপেশি কিংবা হাড় দৃশ্যমান হতে পারে।

প্রেসার আলসারের ঝুঁকিসমূহ:

১। ইমোবিলিট বা অনড় অবস্থা
২। অধিক বয়স
৩। ভঙ্গুর ও শুকনো ত্বক
৪। আর্দ্র ত্বক; যখন একটি ত্বক অপর ত্বকের সাথে কিংবা কোনো আর্দ্র বিছানার চাদরের সাথে লাগানো থাকে।
৫। অপুষ্টি
৬। নিম্ন মানের হাইড্রেশন; যথেষ্ট পরিমাণ পানি পান না করা
৭। নিম্ন মানের রক্ত সঞ্চালন
৮। নিম্ন মানের অক্সিজেন সরবরাহ প্রভৃতি।

প্রেসার আলসার প্রতিরোধে করণীয়:

১। ত্বকের যত্ন করা
২। রোগীকে নড়াচড়া করা এবং নিজে নিজে নড়াচড়া করতে অনুপ্রেরণা দেওয়া
৩। ত্বকে ফাটল ধরার বিভিন্ন লক্ষণ পরীক্ষা করা
৪। নিয়মিত টয়লেট ব্যবহারে সহায়তা করা এবং পেরিনিয়াল কেয়ার প্রদান করা
৫। পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার ও পানি পানে উৎসাহিত করা
৬। নিয়মিতভাবে পজিশন বা রোগীর অবস্থান পরিবর্তন করা এবং ঘর্ষণ বা অন্য কোনো আঘাত যেনো রোগী না পায় সেদিকে খেয়াল রাখা। সাধারণত প্রতি ২ ঘন্টা পর পর পজিশন বা রোগীর অবস্থানের পরিবর্তন করতে হয়।
৭। পরিষ্কার, পরিপাটি কাপড়চোপড় এবং বিছানার চাদর নিশ্চিত করতে হবে।

পজিশনিং এর প্রকারভেদ:

প্রেসার আলসার প্রতিরোধে সঠিক পজিশনিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক ধরনের পজিশনিং এর কথা বলা আছে। এখানে কয়েকধরনের পজিশনিং যেগুলো একজন কেয়ারগিভারকে প্রায়শই সম্পন্ন করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

সুপাইন পজিশন এটি মূলত চিত করে শোয়ানো। রোগী তার পিঠ বিছানার সমান্তরালে রেখে মাথা উপর দিকে দিয়ে সোজা হয়ে শুয়ে থাকেন। বাড়তি আরাম ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য অন্যান্য সরঞ্জাম যেমন বালিশ, ম্যাট্রেস, সাইড রেইল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	
প্রোন পজিশন রোগীকে তার বুক-পেট বিছানার সাথে রেখে এবং মাথা একপাশে দিয়ে সোজা করে শোয়ানো হয়। বাড়তি আরাম ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে বালিশ, ম্যাট্রেস, সাইড রেইল ইত্যাদি।	
লেটারাল পজিশন রোগীকে একপাশে কাত করে শোয়ানো হয়, যেক্ষেত্রে তার এক পা আরেক পায়ের উপরে থাকে। কক্সিজিয়াল রিজিওন বা গুচ্ছদেশীয় হাড়ের উপর চাপ কমাতে এই পজিশন উপকারী। এটি লেফট ও রাইট লেটারেল পজিশন এই দুইভাবে বিভক্ত।	
সিম'স পজিশন এক্ষেত্রে রোগীকে সুপাইন ও প্রোন এই দুইয়ের মাঝামাঝি একটি অবস্থানে রাখা হয় যেক্ষেত্রে রোগীর এক পাশের হাত-পা সামনের দিকে এবং অন্য পাশের হাত-পা পিছনের দিকে থাকে। কোনো অবস্থাতেই হাত যেনো রোগীর শরীরের নিচে চাপা না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।	

ফাওলারস পজিশন রোগীর বিছানার মাথার দিকে অংশ ৪৫ ডিগ্রি কোণে উপরের দিকে উঁচিয়ে রাখা হয়। কোমরের উপর ভর দিয়ে রোগী এক্ষেত্রে আধশোয়া অবস্থায় থাকে। রোগীকে বিছানায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য এটি একটি সুবিধাজনক পজিশন।	
সেমি-ফাওলারস পজিশন রোগীর বিছানার মাথার দিকে অংশ ৩০ ডিগ্রি কোণে উপরের দিকে উঁচিয়ে রাখা হয়। যেসকল রোগীর হৃৎপিন্ড কিংবা ফুসফুসের সমস্যা আছে এবং যাদের নল দিয়ে তরল খাবার দিতে হয়, তাদেরকে সাধারণত এই ধরনের পজিশনে রাখা হয়।	
ট্রেন্ডলেনবার্গ পজিশন এক্ষেত্রে রোগী মাথা পায়ের নিচে নামিয়ে রোগীকে চিত্রের ন্যায় সমান্তরালে রাখতে হয়। হাপোটেনশন কিংবা এধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে এ ধরনের পজিশনিং কার্যকরি। এটিকে ভাইটাল অরগানসমূহে রক্ত চলাচলকে বাড়িয়ে দেয়, যেমন মস্তিষ্ক ও হৃৎপিন্ড।	

চিত্র ১.১০: বিভিন্ন প্রকার পজিশনিং

সঠিকভাবে পজিশনিং পদ্ধতি:

পজিশনিং করার সময় রোগী ও কেয়ারগিভার উভয়েরই ইনজুরি এড়ানোর জন্য এ কাজটি অত্যন্ত সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়। উপরোল্লেখিত পজিশনগুলোর কিছু নির্দিষ্ট উপায় থাকলেও যেকোনো পজিশনিং এর ক্ষেত্রেই এর মূলনীতি আসলে একই রকম। যেমন:

১। পদ্ধতিটি রোগীকে ব্যাখ্যা করা ও বুঝিয়ে বলা। কি করতে যাওয়া হচ্ছে সেটি রোগীকে শুরুতেই বুঝিয়ে বলতে হবে। পাশাপাশি সেটি কেন করা হচ্ছে, করলে কি উপকার হবে আর না করলে কি হতে পারে তাও নরম সুরে বলতে হবে। রোগীর কাছ থেকে এভাবে ভালো সম্পর্কের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে পজিশনিং করলে সেটি রোগী অনুসরণ করে থাকে।

২। রোগীকে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে রোগী তার সাধ্যমত সহযোগীতা করে। আগেই ঠিক করে নিতে হবে রোগী কি কিছুটা সহায়তা করতে পারবে নাকি একেবারেই পারবেনা। যদি মনে হয় রোগীর পক্ষে সহযোগীতা করা সম্ভব তাহলে সেটি করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতে করে রোগীর স্বনির্ভরতা ও আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায়।

৩। আর যদি মনে হয় যে রোগীর পক্ষে কোনোপ্রকার সহযোগীতা করা সম্ভব নয়, তাহলে প্রয়োজনে অন্য কারো সাহায্য নিতে হবে। কোনভাবেই রোগীকে মাটিতে ফেলে দেওয়া যাবেনা। অনেক সময় খুব ভারি রোগীকে উত্তোলন, পজিশনিং কিংবা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

৪। সম্ভব হলে কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন: বেড বোর্ড, স্লাইড বোর্ড, বালিশ, পেশেন্ট লিফ্ট, স্লিংস, হোয়েস্ট ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে পজিশনিং ও ট্রান্সফারের কাজটি সহজ হয়।

৫। রোগীর বিছানা প্রয়োজন মত উপর-নিচে এডজাস্ট করে নিতে হবে। বর্তমানে রোগীর বিছানা সাধারণত মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক হয়ে থাকে যেখানে সুইচ বোর্ডের বাটন টিপে প্রয়োজন মত ৪৫ বা ৩০ ডিগ্রি কোণে মাথার বা পায়ের দিকে বিছানা এডজাস্ট করে রোগীকে পজিশন করা যেতে পারে। আবার সাধারণ বিছানার ক্ষেত্রে ঘাড়ের নিচে ও পিঠে অতিরিক্ত বালিশ বা ম্যাট্রেস দিয়ে মাথার দিকটা উঁচু করা যেতে পারে। পায়ের নিচে বালিশ দিয়ে পা গুলোকে উপরে তুলে পজিশনিং করা যায়।

৬। নিয়মিত পজিশন বা অবস্থানের পরিবর্তন করা। মনে রাখতে হবে, যেকোনো পজিশনই রোগীর জন্য ক্ষতিকর যদি সেটি অনেক লম্বা সময় ধরে রাখা হয়। তাই খেয়াল করে প্রতি দুই ঘন্টা পর পর রোগীর অবস্তার পরিবর্তন করিয়ে দিতে হবে। এতে করে রোগীর আরাম ও স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি পায় এবং প্রেসার আলসারের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৭। রোগীর শরীর যাতে দেওয়ালে বা বিছানায় ঘষা না খায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রোগী স্থানান্তর করার সময় রোগীকে ভারসহ উত্তোলন করতে হবে যাতে করে কোথাও ঘষা লেগে রোগীর ক্ষতি না হয়।

৮। নিজের ও রোগীর উভয়েরই সঠিক বডি মেকানিক্স বা এনাটমিক্যাল এলাইনমেন্ট বজায় রাখতে হবে।

- নিজেকে যথাসম্ভব রোগীর কাছাকাছি রাখতে হবে।
- প্রয়োজনে নিজের হাঁটু ভাঁজ করতে হবে এবং পা দুটো যথেষ্ঠ পরিমাণ ফাঁকা করে দাঁড়াতে হবে।
- রোগীর পজিশনিং, লিফ্টিং বা ট্রান্সফারের সময় হাতের বা পায়ের উপর ভর দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। কোমরের উপর ভর দেওয়া যাবেনা। এতে নিজের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা তৈরি হতে পারে।
- রোগী নড়ানোর সময় পেটের মাংশপেশিকে শক্ত করে রাখা যেতে পারে। এতে বলপ্রয়োগ সহজ হয়।

১.৪.২ রোগীকে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরের উপায়

রোগীকে নানা প্রয়োজনে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে হয়। যেমন; টয়লেট করানো, গোসল করানো, খাবার খাওয়ানো, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি। শারীরিকভাবে চলাচলে অক্ষম বয়স্ক ব্যক্তি বা যে কোনো বয়সের রোগীকে বিভিন্ন পরিপূরক যন্ত্রের সাহায্যে এই স্থানান্তরের কাজটি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ে আরেকটু বিষদভাবে জানতে পারবো। এই অংশে আমরা রোগীকে কেবলমাত্র বিছানা থেকে হুইলচেয়ার ও হুইলচেয়ার থেকে বিছানায় স্থানান্তরের কৌশল অনুশীলন করবো।

বিছানা থেকে হুইলচেয়ারে স্থানান্তর:

রোগীর মাথা ও কাঁধ বিছানার উপরে উত্তোলন করা:

প্রস্তুতি-

১। সঠিকভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

২। প্রয়োজনীয় উপকরন সংগ্রহ করতে হবে

৩। রোগীকে সঠিকভাবে সম্ভাব্য জানিয়ে অনুমতি নিতে হবে।

৪। রোগীর গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

৫। রোগীকে পদ্ধতিটি বর্ণনা করতে হবে এবং সাধ্যমত সহায়তা করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৬। প্রয়োজন অনুযায়ী বিছানার উচ্চতা এডজাস্ট করে নিতে হবে যাতে করে স্বাচ্ছন্দের সাথেই কাজটি করা যায়। বিছানার চাকা অবশ্যই লক করে নিতে হবে।

৭। সম্ভব হলে রোগীকে সুপাইন পজিশনে রাখতে হবে।

পদ্ধতি-

১। বিছানার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আনুমানিক ১২ ইঞ্চি ফাঁকা রেখে এক পায়ের সামনে আরেক পায়ের পজিশন নিতে হবে

২। রোগী যদি সক্ষম হয় তাহলে তাকে তার হাত তোমার নিজের হাতের নিচে রেখে শক্ত করে আকড়ে ধরতে বলতে হবে। আর যদি না পারে তাহলে কেয়ারগিভারকে একাই রোগীর হাত শক্ত করে ধরতে হবে।

৩। এক হাত দিয়ে রোগীর নিকটবর্তী হাত শক্ত করে ধরে অপর হাত দিয়ে রোগীর কাঁধে শক্ত করে সাপোর্ট দিতে হবে (চিত্রের ন্যায়)।

৪। এবারে নিজের দুই পায়ে ভর দিয়ে দুই হাতের সাহায্যে রোগীর মাথা উপরে উত্তোলন করতে হবে। রোগীকে সাধ্যমত সহযোগীতা করার কথা বলতে হবে।

৫। কাঁধের নিচে হাত দিয়ে রোগীর পিঠে ও ঘাড়ে বালিশ বা কুশন রেখে উচ্চতা ঠিক করে নিতে হবে যাতে রোগী তার নতুন পজিশনে আরামদায়কভাবে বসতে পারেন। এই কাজটি ইলেকট্রিক বেডেও খুব সহজেই করা যায়।

৬। এবার রোগীকে সতর্কতার সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী ফাওলার্স, সেমি-ফাওলার্স বা অন্য কোন পজিশনে বিছানায় রাখতে হবে।

চিত্র ১.১১: রোগীর মাথা বিছানা থেকে উঠিয়ে ফাউলার্স পজিশনে রাখার কৌশল।

সমাপ্তি-

১। রোগীর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা, আরামদায়ক অবস্থা ও শারীরিক অবস্থান বজায় রাখতে হবে।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী বিছানার উচ্চতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে হবে যাতে করে কেয়ার প্ল্যান অনুযায়ী নির্ধারিত সেবাটি খুব সহজেই প্রদান করা যায়।

৩। কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখতে হবে।

৪। হাত ধুয়ে নিতে হবে।

৫। রেকর্ড সম্পাদন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।

৬। রোগীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মটি সম্পাদন করতে হবে।

রোগীকে বিছানায় একপাশ থেকে অন্য পাশে সরানো: প্রস্তুতি ও সমাপ্তি আগের মতই। পার্থক্য কেবল প্রক্রিয়াগত। মৌলিক কিছু ধাপ নিম্নরূপ:

১। বিছানার উচ্চতা একটি নামিয়ে নিতে হবে এবং রোগীকে মাথা উঁচু করার জন্য বলতে হবে। যদি রোগী করতে সক্ষম না হয় তাহলে পূর্বের পদ্ধতি অনুশীলন করে আগে রোগীর মাথা উঁচিয়ে পিছনে থেকে বালিশটি সরিয়ে নিতে হবে।

২। একই নিয়মে বিছানার দিকে মুখ করে দুই পায়ের পজিশন ঠিক করে দাঁড়াতে হবে।

৩। রোগীর দুই হাত চিত্রের ন্যায় বুকের উপর ক্রস করে রাখতে হবে।

৪। একহাত রোগীর ঘাড়ের পিছনে এবং অপর হাত রোগীর কোমরের উপরে রাখতে হবে। এক দুই তিন বলার মধ্যেই রোগীর শরীরকে খুব সাবধানে নিজের দিকে গড়িয়ে বিছানার একপাশে নিয়ে আসতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে কোনো অবস্থাতেই রোগী যেনো বিছানা থেকে পড়ে না যায়।

৫। এবার হাতের পজিশন পরিবর্তন করতে হবে। একহাত রোগীর কোমরের উপরের অংশে একবার আরেকহাত রোগীর পায়ের উপরের অংশে রাখতে হবে। সুপাইন পজিশনে রেখে রোগীর সর্বোচ্চ আরাম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। রোগীকে সাধারণত বিছানার একপাশ থেকে অন্য পাশে সরানো হয় কোন নির্দিষ্ট সেবা প্রদান করার জন্য। যেমন, বেড মেকিং, কিংবা ড্রেস পরিবর্তন করা ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট সেবা প্রদানের কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদন করতে হবে।

চিত্র ১.১২: রোগীকে বিছানায় এক পাশ থেকে অন্য পাশে সরানোর উপায়

রোগীকে বিছানা থেকে হুইলচেয়ারে স্থানান্তর করা: এক্ষেত্রে প্রস্তুতি ও সমাপনি কাজের ধারা একই হওয়ায় সেগুলো পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছেনা। রোগীকে হুইলচেয়ারে স্থানান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি আগে থেকেই প্রস্তুত করে নিতে হবে। যেমন: ট্রান্সফার বেল্ট, হুইলচেয়ার, রোগীর পোশাক ও জুতা প্রভৃতি।

প্রক্রিয়া:

১। হুইলচেয়ারটিকে বিছানার কাছে রোগী যে পাশে বেশি শক্তি অনুভব করেন সে পাশে রাখতে হবে। হুইলচেয়ারের পা দানিটি ভাঁজ করে রাখতে হবে এবং হুইলচেয়ারের চাকার লক অবশ্যই বন্ধ করে রাখতে হবে। অন্যথায় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

২। সুবিধামত বিছানার উচ্চতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে হবে।

৩। বিছানার দিকে মুখ করে আনুমানিক ১২ ইঞ্চি ফাঁকা রেখে এক পায়ের সামনে আরেক পায়ের পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে হবে। একহাত রোগীর পিঠে ও আরেকহাত রোগীর পায়ের উপরের অংশে শক্তভাবে রেখে এক দুই তিন বলার মধ্যেই নিজের শরীরকে বাকিয়ে রোগীকে বিছানার একপাশে সিটিং পজিশনে নিয়ে আসতে হবে।

৪। এবারে প্রয়োজন মত রোগীর জামাকাপড় পরিবর্তন জন্য কোনো কাজ করা যেতে পারে। সিটিং পজিশনে রোগীকে রেখে ২-১ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে রোগীর কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা।

৫। এরপর ট্রান্সফার বেল্টটি রোগীর কোমরে শক্ত করে আটকে দিতে হবে।

৬। রোগীকে দাড়া করানোর জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করা যায়। একটি হচ্ছে, চিত্রের ন্যায় রোগীর পিছনে হাত দিয়ে ট্রান্সফার বেল্টটি শক্ত করে আকড়ে ধরতে হবে অথবা ট্রান্সফার বেল্ট না থাকলে রোগীর দুই বাহুর নিচ দিয়ে তার দুই কাঁধে শক্ত করে ধরতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই রোগীর দুই হাত কেয়ারগিভারের ঘাড়ের উপর দিয়ে দুই পাশে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য বলতে হবে। আর যদি কোনো সাহায্যকারী থাকে, তাহলেও কাজটি একইভাবে আরো সহজেই সম্পাদন করা যায়।

৭। রোগীকে শক্ত করে সাপোর্ট দিয়ে এক দুই তিন পর্যন্ত বলার সাথে সাথেই রোগীকে বসা থেকে দাড় করিয়ে ফেলতে হবে। এরপর রোগীকে ধীরে ধীরে চেয়ারের দিকে পিছনে করে নিয়ে যেতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেনো রোগীকে দুই একটির বেশি কদম ফেলতে না হয়।

৮। চেয়ার পর্যন্ত নিয়ে রোগীকে ধীরে ধীরে বসার জন্য বলতে হবে। বসানোর পর রোগীর দুই হাতকে একটির পর একটি করে নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে চেয়ারের হাতলে রাখতে হবে।

৯। এরপর রোগীকে সঠিকভাবে আরামদায়ক পজিশনে বসতে সহায়তা করতে হবে। পা দানির তাঁজ খুলে রোগীর পা দুটো এর উপর রাখতে হবে।

১০। ট্রান্সফার বেল্ট অপসারণ করতে হবে এবং হুইলচেয়ারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বেল্টের লকটি লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর প্রয়োজন হলে হুইলচেয়ারের লকটি খুলে রোগীকে নির্দিষ্ট জায়গায় অতীব সাবধানে নিয়ে যেতে হবে।

চিত্র ১.১৩: রোগীকে বিছানা থেকে হুইলচেয়ারে স্থানান্তরের উপায়

১.৫ ইনটেক ও আউটপুট চার্ট

কোনো রোগী গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের (মুখের) অথবা শিরাপথ (প্যারেন্টালি) -এর মাধ্যমে যেসব তরল/খাবার আকারে গ্রহণ করে (ইনটেক) এবং যা কিছু নিষ্কাশিত বা অপসারণ (আউটপুট) করে তা যে চার্টে বা টুলসে রেকর্ড করা হয় তাকে ইনটেক এবং আউটপুট চার্ট বলে। কখনও কখনও এটি ফ্লুয়েড-ব্যালেন্স চার্ট হিসাবেও পরিচিত। সাধারণত মিলিলিটার (ml) হিসেবে ইনটেক ও আউটপুট চার্টে পরিমাণ লিখা হয়।

১.৫.১ ইনটেক ও আউটপুট মনিটরিং-এর গুরুত্ব

ইনটেক ও আউটপুট মনিটরিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লিনিকাল কেয়ার প্রক্রিয়া যা রোগের-

ক) অগ্রগতি এবং উপকারের পাশাপাশি চিকিৎসার ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো নির্ধারণে সহায়তাকরে।
খ)ইনটেক ও আউটপুট পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কেয়ারগিভারগণ স্বাস্থ্যসেবার সাথে সাথে রোগীর তরল ও পুষ্টির সঠিক চাহিদা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
গ) আউটপুট পরিমাপ পর্যবেক্ষণ করে প্রস্রাবের পর্যাপ্ততা নিশ্চিতের পাশাপাশি স্বাভাবিক মলত্যাগ করছে কিনা তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।মোটকথা ইনটেক ও আউটপুট মনিটরিং চিকিৎসা-প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

ইনটেক হিসেবে যা পরিমাপ করা হয়	**আউটপুট হিসেবে যা পরিমাপ করা হয়**
ইনটেক হিসেবে যেসব জিনিস পরিমাপ করা হয় তা হল- ক) ওরাল ইনটেক, খ) টিউব ফিডিংস, গ) ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড, ঘ) মেডিকেশন, ঙ) টোটাল প্যারেন্টেরাল নিউট্রিশন, চ) ব্লাড প্রোডাক্টস, ছ) ডায়লাইসিস ফ্লুইডস ইত্যাদি।	আউটপুট হিসেবে যেসব জিনিস পরিমাপ করা হয় তা হল- ক) ইউরিন, খ) তরল পায়খানা গ) বমি, ঘ) চেষ্ট ড্রেইনেজ ইত্যাদি।

ইউরিন পরিমাপ ও স্যাম্পল গ্রহণ

বিভিন্ন প্রকার রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইউরিন খুবই উল্লেখযোগ্য একটি স্যাম্পল বা নমুনা। ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী তাই কেয়ারগিভারকে প্রায়শই ইউরিন বা প্রস্রাবের স্যাম্পল নিতে হয়। আবার নির্দেশনা অনুযায়ী পরিমাপ করতে হয় শরীর থেকে কতটুকু তরল প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে গেছে সেটিও। এক্ষেত্রে যে রোগী সজাগ, সতর্ক এবং নিজে নিজেই প্রস্রাব করতে পারেন, তিনি প্রতিবার প্রস্রাব করার সময় একটি ইউরিনাল বা বোতলে প্রস্রাব সংগ্রহ করতে পারেন। কেয়ারগিভারও এ কাজে সহযোগীতা করতে পারেন। আবার, যে সমস্ত রোগীর প্রস্রাবে সমস্যা হয়, তাদেরকে অনেক সময় ডাক্তার-নার্সরা কেথেটার পরিয়ে দেন। অনেক সময় আবার অপারেশনের আগে ব্লাডার বা মূত্রথলি খালি করতেও এটি ব্যবহৃত হয়। ইউরিনারি কেথেটার হচ্ছে রাবার বা সিলিকোনের তৈরি বিশেষ এক ধরনের নল যেটি মূত্রনালী দিয়ে প্রবেশ করানো হয় যেখান দিয়ে প্রস্রাব এশে এর সাথে সংযুক্ত একটি ব্যাগে জমা হয়। এই ব্যাগটিকে বলা হয় ইউরোব্যাগ।

চিত্র ১.১৪: ইউরোব্যাগ

চিত্র ১.১৫: ইউরিনারি ক্যাথেটার

ইউরোব্যাগে মিলিলিটার এককে দাগ কাটা থাকে যেটা দেখে ঘণ্টায় ইউরিন আউটপুট কত হলো তা দেখা যায় এবং প্রয়োজনমত ইউরিন স্যাম্পলও নেয়া যায়। সাধারণত ১০০০ মিলি. বা ১ লিটার পর্যন্ত প্রস্রাব এখানে জমা হতে পারে। তাই ইউরোব্যাগটি পূর্ণ হয়ে গেলে এটি পরিষ্কার করে আবার লাগিয়ে দেওয়া কেয়ারগিভারের দায়িত্ব। সেই সাথে কখনো কখনো নতুন ইউরোব্যাগ সংযুক্ত করতে হয়। নিচে একটি কেথেটারাইজড রোগীর ইউরোব্যাগ থেকে আউটপুট দেখা ও ইউরিন স্যাম্পল সংগ্রহের পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো:

১. প্রথমেই সঠিক উপায়ে হ্যান্ড ওয়াশ করে পিপিই পরে নিতে হবে।
২. স্যাম্পল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কৌটা বা পাত্র এবং অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে নিতে হবে।
৩. রোগীর কাছে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে অনুমতি নিতে হবে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি রোগীকে বুঝিয়ে বলতে হবে।
৪. রোগীর আরামদায়ক অবস্থানে রেখে প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. কতক্ষণ আগে ইউরিন ব্যাগ সংযুক্ত করা হয়েছিলো সেটি জেনে নিতে হবে এবং সর্বশেষ ইউরিনের পরিমাণ দেখে ইউরিন আউটপুট কত হলো তা দেখে নিতে হবে।
৬. স্যাম্পল কালেকশনের নির্দেশনা থাকলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্যাম্পল কালেকশন করে নিতে হবে। এজন্য ইউরোব্যাগের চাবি সাবধানতার সাথে খুলতে হবে যাতে করে প্রস্রাব রোগীর শরীরে বা আশেপাশে ছড়িয়ে না যায়।
৭. ইউরিন দ্বারা ইউরোব্যাগ পরিপূর্ণ হয়ে যাবার মত মনে হলে ব্যাগটি সাবধানে খুলে নিয়ে প্রস্রাবটুকু টয়লেটে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার ব্যাগ বা নতুন ইউরোব্যাগ আবার লাগিয়ে দিতে হবে।
৮. ক্যাথেটারের টিউব ধরে টানাটানি করা যাবেনা এবং রোগীর কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।
৯. সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে ইনটেক-আউটপুট চার্টে ইউরিন আউটপুটের পরিমাণ ও সময় লিখে রাখতে হবে।
১০. গৃহীত স্যাম্পল কৌটায় সঠিকভাবে ল্যাবেল করে ল্যাবে পাঠাতে হবে।

কোলোস্টোমি ব্যাগ:

কোলোস্টোমি ব্যাগ হচ্ছে প্লাস্টিকের তৈরি বিশেষ এক ধরনের ব্যাগ যেটিকে রোগীর পেটের উপর দিয়ে অন্ত্রের সাথে সংযুক্ত করে মল পদার্থ সংগ্রহ করা হয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার একটি ছোট অপারেশনের মাধ্যমে এই কাজটি করে থাকেন। সাধারণত নিম্নোক্ত সমস্যা আছে এরকম রোগীদের ক্ষেত্রে কোলোস্টোমি ব্যাগ প্রয়োজন হয়।

- অন্ত্রের গুরুতর ইনফেকশন যেমন: ডাইভার্টিকুলাস
- ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিস
- কোলন বা অন্ত্রের আঘাত
- মলদ্বার বা কোলনের কোনো অংশে অবস্ট্রাকশন (বাধা) বা ইনফেকশন এবং এনাল ফিস্টুলা ।

চিত্র ১.১৬: কোলোস্টোমি ব্যাগের বিভিন্ন অংশ

কোলোস্টোমি ব্যাগের যত্ন নেয়া:

১. প্রথমেই সঠিক উপায়ে হ্যান্ড ওয়াশ করে পিপিই পরে নিতে হবে।

২. স্যাম্পল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কৌটা বা পাত্র এবং অন্যান্য উপকরন সঙ্গে নিতে হবে।

৩. রোগীর কাছে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে অনুমতি নিতে হবে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি রোগীকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

৪. রোগীর আরামদায়ক অবস্থানে রেখে প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. কবে কোলোস্টোমি ব্যাগ সংযুক্ত করা হয়েছিলো সেটি জেনে নিতে হবে এবং সর্বশেষ পরিমাণ দেখে আউটপুট কত হলো তা দেখে নিতে হবে।

৬. স্যাম্পল কালেকশনের নির্দেশনা থাকলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ স্যাম্পল কালেকশন করে নিতে হবে।

৭. সাবধানতার সাথে কোলোস্টোমি ব্যাগের পাউচ সরিয়ে ব্যাগটি খুলে নিয়ে আসতে হবে। স্টোমা ও চামড়ার চারপাশ পরিষ্কার পানিতে জীবাণুমুক্ত গজের টুকরা দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

৮. পুরানো ব্যাগটি সঠিক উপায়ে ডিসপোস করে নতুন ব্যাগটি সংযুক্ত করে দিতে হবে।

৯. সংযুক্ত ব্যাগ ধরে টানাটানি করা যাবেনা এবং রোগীর কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

৯. সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে ইনটেক-আউটপুট চার্টে স্টুল আউটপুটের পরিমাণ ও সময় লিখে রাখতে হবে।

১০. গৃহীত স্যাম্পল কৌটায় সঠিকভাবে ল্যাবেল করে ল্যাবে পাঠাতে হবে।

জব ১: রক্তের শর্করা পরিমাপ করা

পারদর্শিতার মানদণ্ড- প্রশিক্ষণার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়েকবার অনুসরণ করার গ্লুকোমিটার ব্যবহারের মাধ্যমে ব্লাড গ্লুকোজ পরিমাপের পদ্ধতিসম্পন্ন করতে পারবে।

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্র্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন): ব্লাড গ্লুকোজ মিটার, টেস্ট স্ট্রিপ, ল্যান্সেট ডিভাইস ও নিডল, সার্প বক্স, ড্রাই সোয়াব (অ্যালকোহল সোয়াব), রেকর্ড চার্ট।

কাজের ধারাবাহিকতা: প্রথমে মেডিক্যাল গাইডলাইন অনুযায়ী নিম্ন লিখিত পদ্ধতিতে গ্লুকোমিটার ব্যাবহারের মাধ্যমে ব্লাড গ্লুকোজ পরিমাপের কাজটি সম্পন্ন করবে।

ধাপ-১। মিটারের ডিসপ্লে প্যানেলে কোড নম্বর এর সাথে টেস্ট স্ট্রিপের বোতলের কোড নম্বর মিলিয়ে নাও।	ধাপ-২। বাক্সে টেস্ট স্ট্রিপের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখটি পরীক্ষা করে নাও।
ধাপ-৩। হাত ধুয়ে ভালো করে শুকিয়ে নাও।	ধাপ-৪। ল্যানসেট ডিভাইস এবং ল্যানসেট যথাযথভাবে প্রস্তুত কর।
ধাপ-৫। ল্যানসেট কভারটি সরিয়ে ফেল।	ধাপ-৬। সুঁচ লোড করে ক্যাপটি খুল।

 ধাপ-৭। সাবধানতার সাথে ল্যানসেট কভারটি প্রতিস্থাপন কর।	 ধাপ-৮। ত্বকের পুরুত্ব অনুসারে সূঁচের গভীরতার সামঞ্জস্য নির্ধারণ কর।
 ধাপ-৯।লিভারটি টেনে এবং ল্যানসেট ডিভাইসটিকে প্রাইম হিসাবে ছেড়ে দাও।	 ধাপ-১০। কন্টেনার থেকে পরীক্ষার স্ট্রিপটি সরিয়ে গ্লুকোজ মিটার পরীক্ষার স্ট্রিপ স্লটে প্রবেশ করাও।
 ধাপ-২। শুকনো সোয়াব দিয়ে আঙুলের মাথা পরিষ্কার করে নাও।	 ধাপ-১২। ল্যানসেট ডিভাইসটি আঙুলের পাশে সমতল করে এবং আলতো ভাবে প্রেস কর।
 ধাপ-১৩। ল্যানসেট ডিভাইস দিয়ে আঙুল প্রিক করে দ্রুত বের করে নাও।	 ধাপ-১৪। পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত পেতে আঙুলের দিকে ম্যাসেজ কর।
 ধাপ-১৫। পরীক্ষার স্ট্রিপের ডগায় এক ফোঁটা রক্ত রাখ।	 ধাপ-১৬। আঙুলের খোঁচা সাইটের উপর শুকনো সোয়াব প্রয়োগ কর।
 ধাপ-১৭। গ্লুকোজ মিটারের রিডিং এর জন্য অপেক্ষা কর।	 ধাপ-১৮। ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত ভ্যালুটি গ্লুকোজ রেজাল্ট হিসেবে রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ কর।

ধাপ-১৯। সঠিকভাবে এবং নিরাপদে সমস্ত ব্যবহৃত আইটেম সরিয়ে ফেলো।	ধাপ-২০। ল্যানসেট ডিভাইস কভারটি সাবধানে সরিয়ে এবং রিক্যাপ করে একটি শক্ত ঢাকনাযুক্ত পাত্রে ফেলে দাও।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: প্রশিক্ষনার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়েকবার অনুসরণ করার পর গ্লুকোমিটার ব্যবহার করে রক্তে শর্করার পরিমাণ সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারবে।

ফলাফল বিশ্লেষণ ও মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২: ক্যাথেটার দিয়ে প্রস্রাবের নমুনা সংগ্রহ করার দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় ম্যাটারিয়্যালস:

১। ফলিস ক্যাথেটার, ২। ইউরিন ব্যাগ, ৩। এ্যালকোহল প্যাড, ৪। ড্রাই কটন বল, ৫। ৫.০ সিসি ডিস্পজেবল সিরিঞ্জ, ৬। ২১ সাইজের নিডেল, ৭। প্লাস্টিক প্রসাবের কন্টেইনার, ৮। কালো মারকার, ৯। রোগীর রেকর্ড ফাইল, ১০। সাবান, ২। পানি, ১৩। হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ১৪। স্যাম্পল লেভেল, ১৫। টিস্যু পেপার, ১৬। বর্জ্য ধারক ইত্যাদি।

চিত্র ১.১৬: **সিরিঞ্জ ব্যবহার করে** ক্যাথেটার দিয়ে প্রসাবের নমুনা সংগ্রহের ছবি

কাজের ধারা

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পড়।

২। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ কর এবং প্রস্তুত কর।

৩। আদর্শ নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধোয়ার স্বাস্থ্যবিধি সম্পাদন কর।

৪। রোগীকে নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর এবং মৌখিক সম্মতি নাও।

৫। প্রয়োজন অনুযায়ী একটি নমুনা চাহিদা (Riquisition) প্রস্তুত কর।

৬। নমুনা সংগ্রহের জন্য রোগীর পজিশন আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে নাও।

৭। একের পর এক ধাপ মেনে ফোলির ক্যাথেটার থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্রাব একটি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পাত্রে সংগ্রহ কর।

৮। নমুনার ধরন, রোগীর নাম, বয়স, লিঙ্গ এবং নমুনা সংগ্রহের তারিখ এবং সময় পাত্রের গায়ে লেবেল করে দিন।

৯। ব্যবহৃত হয়েছে এমন বর্জ্য নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে রাখ।

১০। নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ কর।

২। উপযুক্ত তাপমাত্রার অবস্থায় নমুনা সংরক্ষণ কর।

১২। ল্যাবে অবস্থানরত ব্যক্তির সাথে সমন্বয় কর এবং পরীক্ষাগার পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠান।

১৩। সরঞ্জাম, উপকরণসমূহ এবং কাজের এলাকাটি পরিষ্কার কর।

১৪। নির্দেশ অনুসারে সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ কর।

সিরিঞ্জে নিডেল লাগানো

ক্ল্যাম্পিং ক্যাথেটার

এ্যালকোহল প্যাড দিয়ে ক্যাথেটারের নল পরিষ্কার

নিডেলের মাধ্যমে প্রসাব সংগ্রহ; কন্টেইনার এ প্রসাব সংগ্রহ

চিত্র ১.১৭: প্রসাবের নমুনা সংগ্রহের ধারাবাহিক চিত্র

কাজের সতর্কতা:

- কাজের সময় পিপিই ব্যবহার কর।
- প্রস্রাবের নমুনা সংগ্রহের জন্য সিরিঞ্জের সাথে সুই সংযুক্ত কর।
- ক্যাথেটারের সংযোগস্থলে বা ঠিক নীচে ক্লেনেজ টিউব আরটারি ফরসেপ দিয়ে ক্লাম্প করে বন্ধ কর।
- যেখান থেকে নিডেল প্রবেশ করবে সেই স্থানটি এ্যালকোহল প্যাড দিয়ে পরিষ্কার কর।
- ফোলি ক্যাথেটারটিতে ৪৫ ডিগ্রী কোণে আলতোভাবে সুই ঢোকান।
- ফোলি ক্যাথেটার থেকে সুই প্রবেশ করিয়ে প্রয়োজন পরিমাণে প্রসাব সংগ্রহ করে সুই বের কর এবং উক্ত নমুনা একটি জীবাণুমুক্ত পাত্রে ঢেলে দিন।
- ক্ল্যাম্প খুলে রোগিকে আরামদায়ক অবস্থানে পজিশনিং কর। খেয়াল রাখবে কোন অপরিষ্কার উন্মুক্ত স্থানে যেন ক্যাথেটার অথবা প্রসাবের কন্টেইনারে স্পর্শ না লাগে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: প্রশিক্ষণার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়েকবার অনুসরণ করার পর ক্যাথেটার থেকে প্রস্রাবের নমুনা সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পারবে।

ফলাফল বিশ্লেষন ও মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?

২. সুস্থ মানুষের রক্তের স্বাভাবিক গ্লুকোজের মান কত?

৩. স্যাম্পল বা নমুনা কি? উদাহরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎসের উপর ভিত্তি করে ঔষধকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয় উল্লেখ কর।

২. ঔষধ সংরক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

৩. ইনসুলিন কি?

৪. রোগীকে ঔষধ খাওয়ানোর সময় কি কি বিষয় খেয়াল রাখতে হয় উল্লেখ কর।

৫. ডায়াবেটিস কী? কত প্রকার ও কি কি?

৬. ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণসমূহ উল্লেখ কর।

৭. প্রেসার আলসার কি? এর পর্যায়গুলো উল্লেখ কর।

৮. পজিশনিং কি? কত প্রকার ও কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রুট অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন বলতে কি বুঝায়? ঔষধের রুট কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে বর্ণনা কর।

২. ঔষধ মুখে খাওয়ার সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর।

৩. রোগীকে সঠিক অবস্থানে রাখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৪. রোগীর প্রেসার আলসার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কেয়ারগিভারের করণীয় উল্লেখ কর।

৫. ইনটেক ও আউটপুট কি? এটি মনিটরিং এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুজীব বিদ্যা এবং এর প্রয়োগ

Microbiology

বিজ্ঞানের যে শাখায় অণুজীব বা Microorganism সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে অণুজীব বিদ্যা বা Microbiology বলে। অণুজীবগুলো অতি ক্ষুদ্র হওয়ায়, অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এদের সনাক্ত করা সম্ভব নয়। তাই অনুজীব বিদ্যার অগ্রগতি ইলেক্ট্রন- মাইক্রোস্কোপের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষের সাথে জড়িত। সেবা দানের জন্য অনুজীব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা জরুরি। অনুজীবের সংজ্ঞা, গঠন, শ্রেণিবিভাগ, বিশেষ করে 'সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির' আওতায় যে সব অনুজীবের বিরুদ্ধে টিকা দেওয়া হয়, তাদের নাম, সৃষ্ট রোগ, জীবনচক্র, সংক্রমণ, সনাক্তকরণ পদ্ধতি ও সরঞ্জামাদি, জীবানুমুক্তকরণ পদ্ধতি, জীবাণু ধ্বংসের পদ্ধতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কাজের পরিধি ও পরিকল্পনা করার পূর্ব শর্ত। এ অধ্যায়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ অনুজীবের নাম, সৃষ্ট রোগ, জীবানুমুক্তকরণ, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার ও জীবাণু ধ্বংসকরণ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- অনুজীব ও এর শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখ করতে পারবো।
- অনুজীব সৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রোগের নাম উল্লেখ করতে পারবো।
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবো।
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহারবিধি উল্লেখ করতে পারবো।
- জীবানুমুক্তকরণ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবো।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবো।

উল্লেখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দুইটি অব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই অবের মাধ্যমে অনুজীবের গঠন, সৃষ্ট রোগ, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার, জীবানুমুক্তকরণ পদ্ধতিসমূহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির নাম উল্লেখ করা, সনাক্ত করা, কার্যাবলি উল্লেখ করা, চিকিৎসা শাস্ত্রে এর ব্যবহার, গুরুত্ব ও কাজ উল্লেখ করা এবং এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারব। অবগুলো সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

২.১ অনুজীব

অণুজীব বা Microorganism অণুজীব অতি ক্ষুদ্র জীবাণু (Organism) যা খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) -এর সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস, প্রটোজোয়া ইত্যাদি।

২.১.১ অনুজীবের শ্রেণিবিভাগ-

জৈবিক গঠনের উপর ভিত্তি করে ৩ টি শ্রেণিতে বিভক্ত-

১) আদিকোষী অণুজীব (Prokaryotic micro-organism), যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ব্লু-গ্রীন এলজি ইত্যাদি।

২) প্রকৃতকোষী অণুজীব (Eukaryotic micro-organism), যেমন- ছত্রাক, প্রেটোজোয়া ইত্যাদি।

৩) উপকোষী অণুজীব (Subcellular micro-organism), যেমন- ভাইরাস।

পরজীবী (Parasite): যে সকল প্রাণি অন্য প্রাণির উপর বসবাস করে, ঐ প্রাণী হতে খাদ্য গ্রহণ করে নিজে উপকৃত হয় কিন্তু আশ্রয়দাতা প্রাণির (Host) ক্ষতি সাধন করে তাকে পরজীবী (Parasite) বলে। যেমন- কৃমি, উকুন, প্লাজমোডিয়াম ইত্যাদি।

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria): ব্যাকটেরিয়া এক প্রকার এককোষী জীবাণু। এদের নিউক্লিয়াস আছে কিন্তু নিউক্লিয়ার মেম্পব্রেন নেই- কক্কাস, ব্যাসিলাস, স্পাইরোকিটস ইত্যাদি।

ভাইরাস (Virus): ভাইরাস এরা এক প্রকার ক্ষুদ্র জীবাণু। এরা কখনও জীব আবার কখনও জড় পদার্থের মতো আচরণ করে। যেমন- এইচ.আই.ভি; হেপাটাইটিস ভাইরাস, পক্স ভাইরাস ইত্যাদি।

প্রটোজোয়া (Protozoa): প্রটোজোয়া এক প্রকার এককোষী প্রাণী। এরা একটি মাত্র কোষ দিয়েই তার জীবন চক্রের সকল কাজ সম্পন্ন করে থাকে। যেমন- এমিবা, জিয়ারডিয়া, ট্রাইকোমোনাস ইত্যাদি।

ছত্রাক (Fungus): ছত্রাক ক্লোরোফিলবিহীন এমন একটি জীবগোষ্ঠী যারা বিভিন্ন পরিবেশে মৃতজীবী অথবা পরজীবী হিসেবে বসবাস করে এবং খাদ্যকে শোষণ করে দেহের অভ্যন্তরে নেয়। বর্ষাকালে স্যাঁতসেঁতে জায়গায়, বাসি পাউরুটির গায়ে, জুতার ওপর ছাতা পড়তে থাকবে, এরা সব ছত্রাক। খুব সহজ-সরল পরগাছা হলো ছত্রাক এবং শ্রেণিগতভাবে উদ্ভিদ। এদের পরগাছা বলার কারণ হলো যে এদের দেহে অন্য উদ্ভিদের মতো শিকড়, কান্ড ও পাতা বলতে কিছুই থাকে না, নিজেদের খাবারও নিজেরা জোগাড় করতে পারে না।

স্পোর (Spore): ব্যাকটেরিয়া যখন প্রতিকূল অবস্থায় থাকে তখন এর সাইটোপ্লাজম থেকে এক প্রকার আঠালো রস (ক্যারোটিন জাতীয় আমিষ দ্বারা গঠিত) নিঃসৃত হয়ে ব্যাকটেরিয়ার গায়ে লেগে থাকে এবং একে শৈত, তাপ ও বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে তাকে স্পোর বলে।

স্পোর (Spore) এর বৈশিষ্ট-

ক) এরা প্রতিকূল পরিবেশে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে পারে।

খ) এরা অনেক দিন না খেয়েবেঁচে থাকতে পারে।

গ) স্পোরকে অল্প তাপ দিয়ে ধ্বংস করা যায় না।

স্পোর এর কাজ: ব্যাকটেরিয়াকে শুষ্ক, তাপ, ঠান্ডা থেকে রক্ষা করা, বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে ব্যাকটেরিয়াকে রক্ষা করা।

(ক) ব্যাকটেরিয়া (খ) ভাইরাস (গ)প্রোটোজোয়া

(ঘ) স্পোর (ঙ) চত্রাক (চ) মেটাজোয়া

চিত্র ২.১: বিভিন্ন প্রকারের অনুজীব

২.২ জীবাণু সনাক্তকরণ (Identification of Organism)

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope): অণুজীবগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। সুতরাং খালি চোখে জীবাণু সনাক্তকরণ বাস্তবসম্মত নয়। অণুজীবগুলোকে সনাক্তকরণের জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) ব্যবহৃত হয়। রোগের কারণ নিরূপণের জন্য রোগ জীবাণু সনাক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রোগের জীবাণু দেখে নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসা করতে হলে ক্ষুদ্রাকৃতির জীবাণুগুলোকে সঠিকভাবে সনাক্ত করার জন্য ৫০ থেকে ১০০গুণ বড়করে দেখা দরকার। যান্ত্রিক গঠন ও বীক্ষণ ক্ষমতার (Magnification) ভিত্তিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা: সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple microscope), বীক্ষণ ক্ষমতা ১০ থেকে ২০ গুণ বড়; যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound microscope), বীক্ষণ ক্ষমতা ২০ থেকে ১০০ গুণ বড় ও ইলেক্ট্রোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron microscope), বীক্ষণ ক্ষমতা ২ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বড়। সকল অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই দুই ধরনের যন্ত্রাংশ রয়েছে-

ক) **যান্ত্রিক অংশ Mechanical part** যে সমস্ত যন্ত্রাংশ অন্যান্য যন্ত্রাংশকে উঠা নামা ও নড়া চড়া করতে সাহায্যে করে সেগুলো যান্ত্রিক অংশ।

খ) **দর্শন অংশ (Optical part):** যে সমস্ত যন্ত্রাংশের সাহায্যে দর্শনীয় বস্তু বড়ও স্পষ্ট করে দেখার ব্যাপারে সহায়তা করে সেগুলো দর্শন অংশ।

ক) যান্ত্রিক অংশ (Mechanical part)

- টানা নল (Draw tube)
- দেহ নল (Body tube)
- বাহু (Limb)
- মঞ্চ ক্লিপ (Stage clip)
- মঞ্চ (Stage)
- ডায়াফ্রাম (Diaphragm)
- স্তম্ভ (Pillar).
- পাদদেশ (Microscope base)
- স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু (Coarse adjustment screw)
- সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু (Micrometre screw)
- বাকানো স্ক্রু (Inclination screw)

খ) দর্শন অংশ (Optical part)

- অভিনেত্র (Eye piece)
- নাসিকা স্ক্রু (Nose piece screw)
- অভিলক্ষ (Objectives)
- দর্পণ (Mirror)

চিত্র ২.২ যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

চিত্র ২.৩ : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার

১) রোগের জীবাণু সনাক্ত করা- ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং অন্যান্য বিভিন্ন রোগের জীবাণু;

২) শরীরের বিভিন্ন উপাদান পরীক্ষা- রক্ত, প্রস্রাব, পায়খানা ও অন্যান্য উপাদানসমূহ পরীক্ষা করে লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, অণুচক্রিকার পরিমাণ নিরূপণ, কফ, কাশি ও পূজ পর্যবেক্ষণ

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহারবিধি-

একটি পরজীবী নিরিক্ষণের প্রক্রিয়া নিচে বর্ণনা করা হল-

১) অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহারযোগ্য কিছু কাচের স্লাইড (slide) সংগ্রহ করে সেগুলো বিশুদ্ধ পানি (Distilled water) ও রেক্টিফায়েড স্পিরিট বা ইথাইল এলকোহলের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করা;

২) জীবাণুমুক্ত স্লাইডে পরজীবী আক্রান্ত রোগীর পায়খানার পাতলা প্রলেপ সৃষ্টি করা;

ক) পায়খানার নমুনার সাথে সমানুপাতিক হারে ডিস্টিল্ড পানির মিশ্রন তৈরি করা;

খ) মিশ্রণটি দিয়ে স্লাইডের উপর পাতলা প্রলেপ বা Smear তৈরি করা;

৩) নমুনাসহ স্লাইড অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মঞ্চে নির্ধারিত স্থানে মঞ্চ-ক্লিপ দিয়ে ভালোভাবে সেট করা;

৪) অণুবিক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ (Objectives) প্রথমে অল্পবীক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন অভিলক্ষ সেট করে অভিনেত্রের (Eye piece) সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বেশি বীক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা;

৫) ফোকাস ঠিক করা (Adjustment of focus)- অভিনেত্রে (Eye piece) চোখ রেখে স্থুল সন্নিবেশক ক্রু (Coarse adjustment screw) ও সুক্ষ্ম সন্নিবেশক ক্রু (Micromere screw) ঘুড়িয়ে অভিলক্ষকে উঠা নামা করে স্লাইডে রক্ষিত নমুনা যাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় সে জন্য সঠিক অবস্থানে অভিলক্ষকে সেট করা;

৬) ফোকাস করা সঠিক হলে স্লাইডের মধ্যে কৃমির বাচ্চা অথবা কৃমির ডিম স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়;

৭) নমুনাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে আর যা কিছু দেখা যায় তার ফলাফল একটি কাগজে লিপিবদ্ধ করা;

৮) পরিশেষে পর্যবেক্ষণের ফলাফল ও নমুনাসহ স্লাইডটিতে একটি কোড নং দিয়ে এমনভাবে সংরক্ষণ কর যাতে সহজেই বোঝা যায় যে স্লাইডটি কোনো রোগীর নমুনা দিয়ে তৈরি হয়েছিল;

৯) নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য উপরের নিয়মে আরও কয়েকটি পর্যবেক্ষণ স্লাইড ও কাগজ তৈরির কাজ সম্পন্ন করা;

এভাবেই অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অণুজীব ও পরজীবীর উপস্থিতি নিরূপণ করা হয়।

২.৩ অণুজীবের প্রকারভেদ

২.৩.১ ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

অধিকাংশ ছোঁয়াচে রোগের কারণ ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া এক প্রকার এককোষী আণুবীক্ষণিক জীবাণু। স্বভাবতই এদের খালি চোখে দেখা যায় না। এদের কোষে নিউক্লিয়াস আছে কিন্তু নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাই নাই। তবে কোষপ্রাচীর থাকে। অনুকুল পরিবেশ পেলে এরা দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে বংশ বৃদ্ধি করে। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের সংক্রমণ রোধ ও চিকিৎসার জন্য ব্যাকটেরিয়ার জীবনচক্রের জ্ঞান প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য অপরিহার্য।

ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১) খালি চোখে দেখা যায় না।
২) কোষ প্রাচীর ফ্লাজেলা, ফিম্ব্রিয়া ও ক্যাপসুল আছে।
৩) এদের নিউক্লিয়াস আছে।

৪) এদের দেহে কোনো ক্লোরোফিল নেই।

৫) এদের নিউক্লিয়াস এর মাঝে ক্রোমজম আছে।

৬) এদের মাইটোকন্ড্রিয়া ও এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম নেই।

৭) এরা দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তার করে।

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ:

১) কাকাস (Coccus) : গোলাকার বা চ্যাপ্টা

২) ব্যাসিলাস (Bacillus) : দন্ডাকৃতি

৩) স্পাইরোকিট (Spirochetes) : স্প্রিং এর মত।

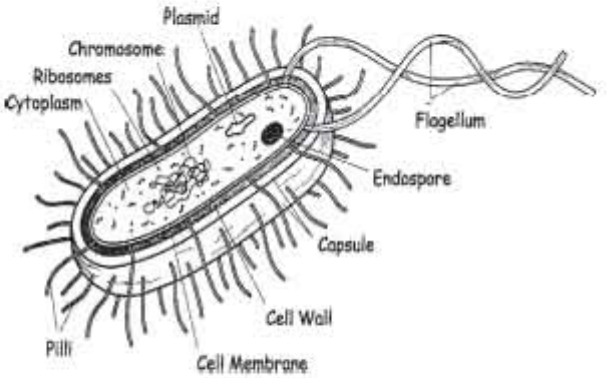

চিত্র ২.৪: ব্যাক্টেরিয়ার গঠন

ব্যাকটেরিয়ার জীবন প্রক্রিয়া

ব্যাকটেরিয়া দ্বি-মাত্রিক বৃদ্ধি (Binary fission) হারে বংশবৃদ্ধি করে। বংশবৃদ্ধির পর্যায় বা ধাপগুলো হল-

ক) খাদ্য গ্রহণ পর্যায় (Lag phase),

খ) বংশ বৃদ্ধি পর্যায় (Log phase),

গ) স্থির অবস্থা (Stationary phase),

ঘ) হ্রাস পর্যায় (Phase of decline)

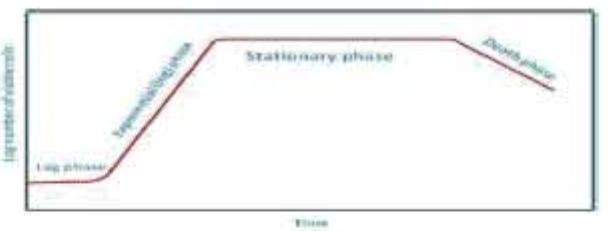

চিত্র ২.৫: ব্যাক্টেরিয়ার বৃদ্ধির কার্ভ

২.৩.২ ভাইরাস (Virus)

ভাইরাস সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জীব যাদের ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। ভাইরাস এর মাঝে ডিএনএ বা আরএনএ থাকে কিন্তু নিইক্লিয়াস থাকে না। গঠনের দিক থেকে ভাইরাস একটি পরিপূর্ণ কোষ নয় বলে একে সাবসেলুলার বা ননসেলুলার বলা হয়। ভাইরাসকে আন্তঃকোষীয় পরজীবীও (Intercellular parasite) বলা হয়। ভাইরাস কখনও জীব আবার কখনও জড়পদার্থের ন্যায় আচরণ করে। মানব দেহে ভাইরাস বাহিত রোগের উদাহরণ- হেপাটাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এইডস, কোভিড-১৯ প্রভৃতি।

ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য –

১) ভাইরাস অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীবাণু।

২) ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এটা দেখা যায় না।

৩) কালচার মিডিয়াতে বংশবৃদ্ধি করা যায় না।

৪) এদের বংশবৃদ্ধি হয় রেপ্লিকেশন (DNA বা RNA এর অনুলিপিকরণ)-এর মাধ্যমে।

৫) ভাইরাস এ রাইবোজম অনুপস্থিত থাকে।

ভাইরাসের আকার ও আকৃতি-

- এটি পূর্ণাঙ্গ জীবকোষ নয়।
- ভাইরাসের আকার সাধারণত ২০ থেকে ৩০০ ন্যানোমিটার।
- ভাইরাস বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে- লম্বাকৃতি, বুলেট আকৃতি অথবা ইট এর আকৃতির।
- ভাইরাস-এর আকৃতি ক্যাপসিড-এর উপর নির্ভির করে।

ভাইরাসের আণ্বিক গঠনের উপাদানসমূহ-

১) নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid),

২) ক্যাপসিড (Capsid),

৩) ভাইরাস প্রোটিন (Virus protein),

৪) এনভেলপ (Envelope),

৫) রাসায়নিক মিশ্রণ (Chemical composition)

২.৩.৩ ছত্রাক (Fungi)

ছত্রাক একধরনের বহুকোষী অণুজীব যার মধ্যে অনেকগুলো মানুষের রোগ সৃষ্টি করে। আবার কিছু ছত্রাক মানুষের উপকার করে থাকে। যেমন Penicillium chrysogenum নামক ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয়।

ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য -

১) সাধারণত বহুকোষী এবং সুতার মতো দেখতে হয়।
২) বেশির ভাগই মানব শরীরে রোগ সৃষ্টি করে না।
৩) এরা বাডিং বা স্পোরের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে।
৪) অধিকাংশ ছত্রাকই গ্রাম পজিটিভ
৫) এদের দেহে কোন ক্লোরোফিল নেই।

মানবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী গুরুত্বপুর্ণ কিছু ছত্রাক-

১) ক্যান্ডিডা (Candida),
২) এসপারজিলাস (Aspergillus),
৩) ক্রিপটোকক্কাস (Cryptococcus)
৪) ট্রিকোফাইটন (Trichophyton) ও মাইক্রোস্পোরিয়াম (Microsporium) সহ রিং ওয়ার্ম (Ring worm) সৃষ্টিকারী ছত্রাক

২.৩.৪ প্রোটোজোয়া (Protozoa)

Protista-এর বৃহৎ এক প্রাণি-দল (subkingdom), যাদের সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো মাত্র একটি কোষে দেহ গঠিত। প্রকৃত নিউক্লিয়াস, সুচিহ্নিত কোষকাঠামো এবং একটি বিপাকীয় প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট ধরন দ্বারা প্রোটোজোয়া অন্যান্য প্রটিস্টা থেকে স্বতন্ত্র, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিভাজন খুব স্পষ্ট নয়। এই এককোষী প্রাণীরা জীবনের জন্য জরুরি যাবতীয় কাজকর্ম কোষের মধ্যেই চালাতে পারে, যা অনেক উচ্চতর শ্রেণির প্রাণীর ক্ষেত্রে বিশেষ অঙ্গ বা অঙ্গতন্ত্র সম্পাদন করে। প্রাণিজগতের এ উপসর্গটি নিশ্চিতই বহুজাতিক (polyphylletic)। এটি জীবরাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত এবং তা দেখিয়েছে যে প্রোটোজোয়ার কোনো কোনো পর্ব (phylum) অন্যান্য প্রোটোজোয়ার চেয়ে সুনির্দিষ্ট এককোষী উদ্ভিদের সঙ্গেই অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

চিত্র ২.৬: প্রোটোজোয়া

প্রোটোজোয়ার বৈশিষ্ট-

১। এরা এককোষী ও কোষে কোষপ্রাচীর নাই। তবে এরা উদ্ভিদ বিভাগেরও হতে পারে যেমন ছত্রাকের কিছু প্রজাতি। প্লাজমোডিয়াম দশা।

২। এদের আকার সাধারণত ১ মাইক্রোমিটার হতে ২ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তবে অধিকাংশ সদস্যই অতি আনুবীক্ষনিক এবং অনুবীক্ষন যন্ত্র ছাড়া ভালো দেখা যায়না।

৩। এরা দেহের আকার পরিবর্তন করতে পারে বলে নির্দিষ্ট আকার আকৃতি থাকেনা।

৪। এরা ক্ষণপদের সাহায্যে চলাচল করে। পরজীব প্রোটোজোয়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় আন্তঃকোষীয় ফাকা স্থানে যেতে পারে। এদের কিছু সদস্যের ফ্লাজেলার মত অঙ্গ দেখা যায়।

৫। প্রতিকূল পরিবেশে এরা সিস্ট তৈরি করে এবং অনুকূল পরিবেশ ফেলে সিস্ট ভেঙ্গে অনেকগুলো প্রোটোজোয়া প্রাণির সৃষ্টি করতে পারে। সিস্ট হচ্ছে এদের নিষ্ক্রিয় দশা। দেহের চারপাশে একধরনের পুরু আবরণী সৃষ্টি করে তার ভেতর নিজেকে গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় রাখে এবং নিউক্লিয়াসের উপাদানগুলো সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে বিপাক ক্রিয়া কমে যায়।

৬। এরা পানিতে বা ভেজা স্যাতসেতে পরিবেশে থাকে, শুষ্ক পরিবেশে সক্রিয় থাকেনা তবে সিস্ট গঠনের মাধ্যমে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে।

৬। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় খাদ্য গ্রহণ করে যেমন এমিবা।

৭। এরা রোগ সৃষ্টি করতে পারে যেমন, ম্যালেরিয়া জীবানু।

২.৩.৫ মেটাজোয়া (Metazoa):

যেসব প্রাণীর দেহ অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত তাদের বহুকোষী প্রাণী বা মেটাজোয়া (Metazoa) বলে। পরিফেরা (Porifera) থেকে কর্ডাটা (Chordata) পর্ব পর্যন্ত প্রাণীদের দেহ বহুসংখ্যক কোষ দ্বারা গঠিত। যেমন: Hydra vulgaris (হাইড্রা), Copsychus saularis (দোয়েল), Homo sapiens (মানুষ), কৃমি ইত্যাদি। যেমন-

কৃমি বা হেলমিন্থ

কৃমি বা হেলমিন্থ : যে সমস্ত পরজীবী খালি চোখে দেখা যায় তাদের মধ্যে কৃমি বা হেলমিন্থ অন্যতম। সকল কৃমিই মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে বাস করে তবে পরিপাকতন্ত্রের সকল অঙ্গে এর অবাধ বিচরণ রয়েছে। আঙ্গিক গঠনের ভিত্তিতে কৃমিকে প্রধানত: ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমন-

ক) নেমা কৃমি (Nema Helminth) : এরা গোলাকার ও নলাকার কৃমি।

খ) প্লাটি কৃমি (Platy Helminth) : এরা চ্যাপ্টা ও ফিতাকার কৃমি।

ক) নেমা কৃমি (Nema Helminth) : বাংলাদেশে প্রধানত ৪ প্রকার নেমা কৃমি দেকা যায়। যেমন-

i) কেঁচো কৃমি (Round worm or Ascaris lumbricoides) রোগ - দীর্ঘ মেয়াদি বদ হজম, পেট ব্যথা, পাতলা পায়খানাসহ সর্দি ও কাশি লেগে থাকা।

ii) বক্র কৃমি (Hook worm or Ankylostoma duodenale) রোগ- রক্ত শুন্যতা ও ভগ্ন স্বাস্থ্য।

iii) সুতা কৃমি (Thread worm or Enterobius vermicularis) রোগ- বদ হজম ও মলদ্বারে চুলকানি বোধ করা।

iv) ট্রাইচুরী কৃমি (Trichuris trichuria) রোগ- দীর্ঘ মেয়াদি ডায়রিয়া।

খ) প্লাটি কৃমি (Platy Helminth) : বাংলাদেশে প্রধানত ৩ প্রকারের প্লাটি কৃমি বা ফিতা কৃমি (Tape worm or Cestodes) দেখা যায়। যেমন-

i) টেনিয়া সাজিনাটা (Beef tape worm or Taenia soginata)

ii) টেনিয়া সোলিয়াম (Pork tape worm or taenia solium)

iii) হাইমেনোলেপিস (Dwarf tape worm or Hymenolepis nana)

কেঁচো কৃমি | বক্র কৃমি | সুতা কৃমি | ট্রাইচুরী কৃমি

২.৭: বিভিন্ন ধরণের কৃমি

২.৪ জীবাণুমুক্তকরণ ও নির্জীবকরণ

জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization): জীবাণুমুক্তকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমস্ত জীবাণু স্পোরসহ ধ্বংস করা বা সরিয়েফেলা হয়।

নির্জীবকরণ (Disinfection): নির্জীবকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীবণুগুলোর সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হয় যাতে এরা প্রদাহ সৃষ্টি করতে না পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সব জীবাণু ধ্বংস হয়না কিছু জীবাণু ও স্পোর বেঁচে থাকে। এ পদ্ধতিকে ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক পদ্ধতিও বলে। আবার, ব্যাকটেরিওসাইডালে জীবাণু পূর্ণাঙ্গ ধ্বংস হয়। যেমন: তাপ ও বিকিরণ পদ্ধতি।

নির্জীবকারক (Disinfectants) বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা নির্জীবকরণে ব্যবহার করা হয়।

জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি: প্রধানত দুই প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করা হয়-

ক) ভৌত প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্তকরণ (Physical sterilization)

১) তাপ জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Heat)-

২) বিকিরণ জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Radiation)

৩) ছাকন জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Filtration)

খ) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্তকরণ (Chemical sterilization),

তাপ জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া (Heat)-

তাপ হলো জীবাণুমুক্তকরণের সবচেয়ে দ্রুত ও কার্যকরি প্রক্রিয়া। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় কোষের প্রোটিন জমাট বেধে অণুজীব মারা যায়। অল্প তাপমাত্রায় অণুজীব বিপাকীয় কাজে স্থবিরতা আসার ফলে জীবাণু দমন করা সহজ হয়। তাপের ধরনের উপর ভিত্তি করে দুইটি পদ্ধতি বিদ্যমান-

ক) কম তাপে জীবনুমুক্তকরণ (১০০± সেলসিয়াস তাপমাত্রার কম)

খ) উচ্চ তাপে জীবাণুমুক্তকরণ (১০০± সেলসিয়স তাপমাত্রার বেশি)

ক) **কম তাপে জীবাণুমুক্তকরণ**

১) **পাস্তুরীকরণ (Pasteurization):** এই পদ্ধতিতে দুধকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, নির্দিষ্ট সময় ধরে গরম করা হয় যাতে দুধে অবস্থিত সকল জীবাণু মারা গেলেও দুধের রং, গন্ধ ও পুষ্টি মান অপরিবর্তিত থাকে। পাস্তুরীকরণ প্রক্রিয়ায় যেসব জীবাণু ধ্বংস হয়- মাইকোব্যাকটেরিয়াম বোভিস (Mycobacterium bovis), ই-কোলাই (E.coli), ব্রুসেলা (Brucella) ইত্যাদি।

পাস্তুরীকরণ পদ্ধতি

I. **ফ্লাস পদ্ধতি (Flash method)**- এ পদ্ধতিতে তাপ দেওয়া হয় ৭২± সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড ধরে।

II. **হোল্ডিং পদ্ধতি (Holding method)** এই পদ্ধতিতে তাপ দেওয়া হয় ৬৩±- ৬৬± সেলসিয়াস তাপমাত্র পর্যন্ত এবং ৩০ মিনিট ধরে।

২) **সেরাম ঘনকরণ (Serum Inspissation):** এই পদ্ধতি সংগঠিত হয় ৭৫± থেকে ৮৫± সেলসিয়াস এর মধ্যে। এই পদ্ধতিতে জমাট বাধা ছাড়াই প্রোটিণ শক্ত করে ফেলা হয়। যে সব কালচার মিডিয়াতে সিরাম থাকে তাদের এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করা হয়।

খ) **উচ্চ তাপে জীবাণুমুক্তকরণ:** ২টি প্রক্রিয়ায় করা হয়।

১) **শুষ্কতাপ (Dry heat)**

সাধারণত ১৬০± সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, এক ঘন্টা ধরে, শুষ্ক জায়গায় তাপ দেওয়া হয় যাতে সকল জীবাণু ধবংস হয়ে যায়।

শুষ্কতাপের জীবাণুমুক্তকরণ কার্যপ্রনালী

I. প্রোটিন বিকৃতিকরণ (Protein denaturation)

II. অক্সিজেন ঘটিত ক্ষতি (Oxidative damage)

III. লবনের বিষক্রিয়া (Toxic effect of electrolyte)

কয়েকটি শুষ্কতাপের জীবাণুমুক্তকরণের উদাহরণ

i. **জলন্ত শিখা (Flaming)**

নির্ধারিত বস্তুকে আগুনের শিখার উপরে রাখ ধীরে ধীরে গরম করে গনগনে লাল রং ধারনা করার মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

ii. **হট এয়ার ওভেন (Hot air oven)**

এই প্রক্রিয়ায় ১৬০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এক ঘন্টা ধরে রাখা হয়। কাচের তৈরী পাত্র, কাঠি, সিরিঞ্জ; পাউডার ও তৈলাক্ত জিনিষ এর মাধ্যমে জীবাণু মুক্ত করা হয়। হট এয়ার ওভেন বিদ্যুৎ বা গ্যাস চালিত হতে পারে।

iii. **অবলোহিত বিকিরণ (Infrared irradiation)**

এ প্রক্রিয়ায় ১৮০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৭.৫ মিনিট ধরে উত্তপ্ত করা হয়। তাপরোধী বস্তু, ধাতব ও কাঁচের যন্ত্রপাতি, ধারালো বস্তু ছাড়াও ঘরের মেঝে, দেওয়াল, আসবাবপত্রের পৃষ্ঠ অবলোহিত বিকিরণের মাধ্যমে উত্তপ্ত করে জীবানুমুক্ত করা হয়।

২) **আদ্র তাপে জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization by Moist Heat)**

আদ্রতা বা বাতাসে জলীয় বাষ্পের সাহায্যে তাপ সঞ্চালন করে জীবাণু ধ্বংস করা হয়।

আদ্র তাপের জীবাণুমুক্তকরণ কার্যপ্রণালী

I. জীবাণুর প্রোটিন ভেঙ্গে দেয় ও জমাট বাধায়,

II. ডিএনএ সুত্রক গুলোকে ভেঙে দেয়,

III. জীবাণুর কোষ পর্দা নষ্ট করে।

কয়েকটি আদ্র তাপের জীবাণুমুক্তকরণের উদাহরণ

i. **জলগাহ (Water bath):** এ প্রক্রিয়ায় ১০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট ধরে পানিতে সিদ্ধ করা হয়। এর মাধ্যমে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া ও তাদের স্পোর ধ্বংস হয়েযায়। এর কারণ, ১০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাস্পীভূত তাপ, একই তাপমাত্রায় শুষ্ক তাপের চেয়ে বিদ্ধকারী ও বিধংসী শক্তি বেশি।

ii. **বাষ্পীয় জীবাণুমুক্তকরণ (Steam sterilizer):** এ প্রক্রিয়ায় ১০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় স্বাভাবিক বায়ুমন্ডলীর চাপে বাষ্প (Steam) বস্তুর উপর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়।

iii. **অটোক্লেভ (Autoclave):** এই প্রক্রিয়ায় ১২১ সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, ৩০ থেকে ৬০ মিনিট ধরে, প্রতিতে ১৫ পাউন্ড/বর্গ ইঞ্চি চাপে বাষ্পের সাহায্যে তাপ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে সকল জীবাণু ও স্পোর ধ্বংস হয়ে যায়। বাষ্পের চাপ বেশি হলে নিরাপত্তা ভালোবের সাহায্যে অতিরিক্ত বাষ্প বের করে দেওয়া যায়। শৈল্য চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত বস্তু এর মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

বিকিরণের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করণ (Sterilization by radiation)

বিভিন্ন রশ্মির বিকিরণ জীবাণুমুক্ত করতে সক্ষম । এই রশ্মিগুলো ডিএনএ ধ্বংস করতে পারে।

উধাহরন- গামা রশ্মি (Gamma ray), আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি (Ultraviolet ray), এক্স-রে (x-ray) প্রভৃতি।

গামা রশ্মি (Gamma ray): জীবানুমুক্তকরণে ব্যবহার করা হয়।

ক) ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ খ) নিডল। গ) ট্রান্সফিউশন উপকরণ ঘ) বায়োলজিকাল দ্রব্যাদি।

আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি (Ultraviolet ray): সাধারণত ঔষধ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও বিশেষ করে অপারেশন থিয়েটার জীবানুমুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ছাকন (Filtration): নিচে উল্লেখিত ক্ষেত্রে জীবাণুমুক্তকরণ কাজে ছাকন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন:

১। খাবার পানি বিশুদ্ধকরণ কাজে।

২। দ্রবীভূত পদার্থ জীবাণু থেকে আলাদা করতে।

৩। ভাইরাস থেকে ব্যাকটেরিয়া আলাদা করতে।

৪। ভাইরাসের আকার সনাক্ত করতে।

৫। পরীক্ষার যন্ত্রপাতি বা মিডিয়া জীবাণুমুক্তকরণ কাজে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Chemical method):

১) ইথাইল এলকোহল (Ethyl alcohol): রেক্টিফাইড স্পিরীট বা ৭০% ইথাইল এলকোহল জীবাণুমুক্তকরণ কাজে ব্যবহার করা হয়। ইথাইল এলকোহল জীবাণুর প্রোটিন জমাট বেঁধে দেয়, যার ফলে জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২) ফিনল এবং ডেটল (Phenol and Dettol): ফিনল এবং ডেটল জীবানু নাশক হিসাবে বহুল ব্যবহৃত যা জীবাণুর প্রোটিনকে জমাট বাধায়। বর্তমানে জীবাণুমুক্তকরণ কাজে শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ ফিনল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩) হ্যালোজেন (Halogen): ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হ্যালোজেন বলা হয়। এরা জীবাণু ধ্বংস করে। যেমন- ব্লিচিং পাউডারে ক্লোরিন থাকায় জীবাণু ধ্বংসের ক্ষেত্রে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার হয়।

৪) ফরমালিন বা ফরমাল্ডিহাইড (Formaldehyde): ফরমালিন বা ফরমালডিহাইড স্পোরকে ধ্বংস করে থাকে। বাষ্পীয় ফরমাল্ডিহাইডের জীবাণু ধ্বংসকরার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। ঘর বিছানা এবং কাপড়জীবাণুমুক্ত করতে ফরমাল্ডিহাইডের ব্যবহার করা হয়।৪০% ফরমালিডিহাইড জীবাণুমুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৫। ইথিলিন অক্সাইড (Ethylene oxide): এটা, গ্যাসীয় জীবাণু ধ্বংস কারক। এটা প্লাষ্টিক, রবারের জিনিস, জটিল যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থ জীবাণুমুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

৬) ডিটার্জেন্ট (Detergent): ডিটার্জেন্ট জীবাণুর কোষ পর্দা নষ্ট করে এবং ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে।

জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবহার-

১) শৈল্য চিকিৎসায় জীবাণুমুক্তকরণ- অস্ত্রপচারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ।

২) অণুজীব পরীক্ষায় জীবাণুমুক্তকরণ- অণুজীব পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ।

২.৫ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বেশির ভাগ মানব কর্মকান্ডের মতন সেবার ক্ষেত্রেও প্রচুর বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ৭৫% বর্জ্যই পৌরসভার সাধারণ অন্যান্য ময়লার মত, বিপদজনক নয়। শুধুমাত্র ২৫% চিকিৎসা বর্জ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এর জন্য প্রথমে এই বিপদজনক বর্জ্য সনাক্ত করে আলাদা করে ফেলতে হবে।

বিপদজনক বর্জ্য-

বর্জ্যের উদাহরণ	ছবি	নির্ধারিত বিন
ধারালো বর্জ্য (Sharps) ব্লেড, সুঁই, কাঁচের টুকরা		
সংক্রামক বর্জ্য (Infectious) রক্ত ,কফ , পুঁজ ও অন্যান্য ছোঁয়াচে বস্তু রোগগত নমুনা বর্জ্য (Pathological) রক্ত , মৃত অঙ্গ ,টিস্যু ,কফ		
ক্ষতিকারক ঔষুধি বর্জ্য (Pharmaceutical) ক্যান্সারের ওষুধ ,		
রাসায়নিক বর্জ্য (Chemical)		
বিকিরণ প্রবন বর্জ্য (Radioactive) বিকিরণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও এ চিকিৎসা পরবর্তী রোগীর মল মুত্র		

বর্ণ কোড সম্বলিত চিকিৎসা বর্জ্য ধারক

Color	Category of MW	Class of MW	MOC of Pot/Container
BLACK	সাধারণ বর্জ্য GENERAL WASTE	Class – 1, 11	Non-perforated Plastic Bin
YELLOW	ক্ষতিকারক বর্জ্য HAZARDOUS WASTE	Class – 2, 3, 4, 5, & 6	Non-perforated Plastic Bin
RED	ধারালো বর্জ্য SHARP WASTE	Class – 8	Non-perforated, tightly closed Plastic Bin or Box
BLUE	তরল বর্জ্য LIQUID WASTE	Class – 10, 4	Non-perforated plastic bin or bowl
SILVER	তেজস্ক্রিয় বর্জ্য RADIOACTIVE WASTE	Class – 6	Non-perforated lead box
GREEN	পুনঃব্যবহারযোগ্য সাধারণ বর্জ্য RECYCLEABLE GENERAL WASTE	Class – 9	Non-perforated Plastic Bin

চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ৩টি ধাপ: ১. সংগ্রহ ও পৃথকীকরণ (Collection & Segregation); ২. সংরক্ষণ ও পরিবহন (Storage & Transport) ও ৩. জীবানুমুক্ত ও নিষ্পত্তি করণ (Treatment & Disposal)

জব ১ জীবাণু সনাক্তকরণ পদ্ধতিতে সহায়তাকরণ।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী সরঞ্জাম ও উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস ও ইকুইপমেন্ট)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩)	অনুবীক্ষণ যন্ত্র	নমুনা মোতাবেক	১টি
৪)	মডেল স্লাইড	নমুনা মোতাবেক	১ টি

অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার উপযোগী করার কৌশলসমূহ:

১. পর্যবেক্ষণ টেবিলে অনুবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করা।

২. পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা।

৩. নিরক্ষণীয় স্লাইড যথাস্থানে বসিয়ে প্রস্তুত করা।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করার কৌশলসমূহ:

১. ছবিতে চিহ্নিত অনুবীক্ষণ যন্ত্রের অংশগুলো সনাক্ত করা।

২. ছবিতে চিহ্নিত অনুবীক্ষণ যন্ত্রের অংশগুলোর নাম পাশে লিখা।

৩. অংশগুলোর কাজ উল্লেখ করা।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র

কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান কর;
- ছকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর;
- নমুনা অনুযায়ী সনাক্ত করার ড্রয়িং বুঝে নাও;
- অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার উপযোগি কর;
- সেটআপ করার সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখ;

- নমুনা অনুসারে মার্ক করা অংশ সনাক্ত কর;
- চিহ্নিত করার পর মার্ক করা নমুনার নাম ও এর কাজ লিখ;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার কর;
- সকল মালামাল চেক লিস্ট মিলিয়ে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ কর;
- বর্জ্য যথাস্থানে ফেলে দাও।

কাজের সতর্কতা

- নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:

- নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।
- **ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য:** বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২ বর্জ্য সনাক্ত ও নিষ্পত্তিকরন

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- ছবিতে প্রদর্শিত নমুনা অনুযায়ী বর্জ্যটি কোন প্রকারের তা সনাক্ত করা।
- সনাক্তকৃত বর্জ্যের জন্য নির্ধারিত ধারণ পাত্র বা বিন সনাক্ত করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুযায়ী সরঞ্জাম ও উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস ও ইকুইপমেন্ট)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩)	বর্জ্য	নমুনা মোতাবেক	১টি
৪)	বিন / বর্জ্য ধারক	লাল, হলুদ, কালো, সবুজ ও রুপালি	৫ টি

বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থা করার কৌশলসমূহ:

১. নমুনা ছবি বা বর্জ্য সনাক্ত করা।
২. যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করে পর্যবেক্ষণ করা।
৩. বর্জ্যের প্রকারভেদ উল্লেখ ও পৃথকিকরণ করা।
৪. নির্ধারিত বিন বা বালতি সনাক্ত করা।
৫. বর্জ্য সংরক্ষণ ও পরিবহনের মাধ্যম উল্লেখ করা।
৬. বর্জ্য নিষ্পত্তিকরণের উপায়গুলো উল্লেখ করা।

চিত্র ২.৭: ইনফেকশাস মেডিকেল বর্জ্য (ব্যবহৃত মাস্ক, গ্লোভস)

চিত্র ২.৭: খারাপো মেডিকেল বর্জ্য (সিরিঞ্জ সুচ, ভায়েল, নমুনা সংগ্রহের টিউব)

কাজের ধারা

- প্রয়োজনীয় পিপিই পরিধান কর;
- ছকে উল্লেখিত তালিকা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ কর;
- নমুনা অনুযায়ী সনাক্ত করার ড্রয়িং বুঝে নাও;
- সেটআপ করার সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখ;
- নমুনা অনুসারে মার্ক করা অংশ সনাক্ত কর;
- চিহ্নিত করার পর মার্ক করা নমুনার নাম ও এর কাজ লিখ;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার কর;
- সকল মালামাল চেক লিস্ট মিলিয়ে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ কর;
- বর্জ্য যথাস্থানে ফেলে দাও

কাজের সতর্কতা: নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন করা।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. অণুজীব বলতে কি বুঝায়?
২. অণুজীবের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
৩. ব্যাক্টেরিয়া- জনিত কয়েকটি রোগের নাম লিখ।
৪. ধারালো বর্জ্য কোথায় ফেলা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. অণুজীব কি? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
২. আর্দ্র ও শুষ্ক নির্জীবকরণের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
৩. জীবানুমুক্ত করনের পদ্ধতিগুলো উল্লেখ কর।
৪. অনুবীক্ষন যন্ত্রের ব্যবহারবিধি উল্লেখ কর।
৫. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ডায়াগ্রাম আঁকো।

২.জীবাণুমুক্তকরণ কেন করা হয়? যুক্তিসহ উল্লেখ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

সংক্রমণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

Infection, Prevention & Control

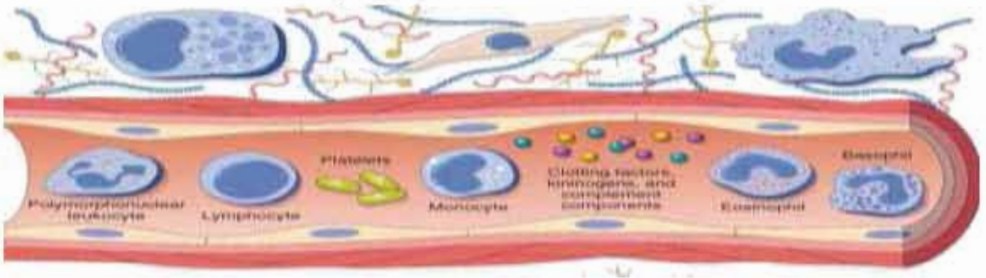

মানব শরীরের সকল রোগের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া প্রদাহের মাধ্যমে হয়, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শরীরকে বৃহত্তর ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। সেবাদানের জন্য সংক্রমণ, প্রতিরোধ, প্রদাহ ও নিরাময় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে আমরা সংক্রমণ, প্রতিরোধ, প্রদাহ ও নিরাময় এবং এদের গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করব।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- বিভিন্ন প্রকার প্রদাহ সম্পর্কে বলতে পারবো।
- নিরাময় কী তা উল্লেখ করতে পারবো।
- বিভিন্ন প্রকার সংক্রমণের দ্বারা সৃষ্ট রোগের নাম উল্লেখ করতে পারবো।
- সংক্রমণের দ্বারা সৃষ্ট রোগের লক্ষন বা উপসর্গ চিহ্নিত করতে পারবো।
- সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবো।

উল্লেখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা তিনটি জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে সংক্রমণের প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময় এর প্রকারভেদ, উপসর্গ ও পরিচর্যা সম্পর্কে জানতে পারবো এবং এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারব। জবগুলো সম্পন্ন করার আগে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

৩.১ প্রদাহ (Inflammation)

জীবিত রক্তসঞ্চালিত টিস্যুতে কোনো ক্ষতি হলে দেহ যে ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পরবর্তী ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দেয় তাকে প্রদাহ বলে। প্রদাহের অবস্থান যে অঙ্গে তার নামের শেষে আইটিস (Itis) কথাটি যোগ করে প্রদাহের নাম উল্লেখ করা হয়। যেমন- এপেন্ডিকস সাইটিস (Appendicitis), টনসিলাইটিস (Tonsilitis) ইত্যাদি। প্রদাহের ইংরেজি পরিভাষা Inflammation শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ ইনফ্লামেয়ার (Inflammare) থেকে, যার অর্থ পুড়ে যাওয়া।

প্রদাহের শ্রেণিবিন্যাস:

১। **তীব্র প্রদাহ (Acute inflammation):** আঘাত, অস্ত্রোপচার অথবা সংক্রমণের ফলে ফ্লুইড, প্রাজমা প্রোটিন, লিউকোসাইট ও নিউট্রোফিল ইত্যাদির ক্ষরণ হয়। আঘাতের ফলে অতিরিক্ত প্রোটিন এবং মৃত কোষযুক্ত তরল পদার্থ ক্ষরণ হয়। যা প্রদাহের জন্য রক্তনালী থেকে বেরিয়ে টিস্যুতে জমা হয়। এই প্রদাহ কয়েক মিনিট, ঘন্টা অথবা কয়েক দিন স্থায়ীহয়।

তীব্র প্রদাহের চিহ্ন:

১) তাপ (Heat),

২) লাল হয়ে যাওয়া (Redness),

৩) ফুলে যাওয়া (Swelling),

৪) ব্যথা (Pain)

৫) কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া (Loss of function)।

চিত্র ৩.১: তীব্র প্রদাহের চিহ্ন

তীব্র প্রদাহের কারণ:

ক) সংক্রামক (Infectious agent): ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি। ব্যাকটেরিয়াই সাধারণত বেশি প্রদাহ করে থাকে।

খ) স্বতঃঅনাক্রম্য ক্ষত (Immunologic injury): রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে। যেমন- এলার্জিক রাইনাইটিস (Allergic rhinitis)

গ) ভৌত ও প্রাকৃতিক (Physical agent): বিভিন্ন ধরনের আঘাতে থেতলে যাওয়া, কেটে যাওয়া, ঠান্ডা, তাপ এবং বিকিরণের ফলে প্রদাহ সৃষ্টি হয়।

ঘ) রাসায়নিক বস্তু (Chemical agent) : শক্তিশালী অ্যাসিড, ক্ষার ও অন্যান্য অনেক রাসায়নিক পদার্থ শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে।

২। **স্থায়ীপ্রদাহ (Chronic inflammation):**

তীব্র প্রদাহ দীর্ঘ স্থায়ীহলে স্থায়ীপ্রদাহের রূপ নেয়।

স্থায়ীপ্রদাহের কারণ:

স্থায়ীপ্রদাহ সাধারণত তীব্র প্রদাহের অনুন্নতি থেকে সৃষ্টি হয়।

ক) সংক্রামক (Infectious agent): মাইকো ব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস (Mycobacterium tuberculosis) বা যক্ষ্মা জীবাণু, মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপরি (Mycobacterium leprae) বা কুষ্ঠ জীবাণু, হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি (Helicobacter pylori) গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডেনাল আলসার সৃষ্টিকারী জীবাণু।

খ) ভৌত ও রাসায়নিক বস্তু (Physical and chemical agent): দীর্ঘ সময় ক্ষতিকারক পদার্থের সংস্পর্শ, যেমন- ধূমপান ফুসফুসে ব্রংকাইটিস ও ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে।

গ) স্বয়ং অনাক্রম্য ব্যাধি- (Autoimmune disease):

রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস (Rheumatoid arthritis),

ক্রনস ডিজিস (Crohn's disease),

আলসারেটিভ কোলাইটিস (Ulcerative colitis) ইত্যাদি।

৩.২ নিরাময় (Healing)

কোনো ক্ষতিগ্রস্থ টিস্যু আঘাত প্রাপ্তির পর যে প্রক্রিয়ায় নিজেকে পুনর্গঠন করে তাকে নিরাময় বলে। নিরাময় সাধারণত দুই ভাবে হয়,

১. পুনঃস্থাপন (Repair)

২. পুনঃউতপত্তি (Regeneration)

নিরাময়ের জন্য উৎপাদকসমূহ:

স্থানীয় উৎপাদক	দেহতন্ত্রীয় উৎপাদক
অক্সিজেন লাভ্যতা	বয়স ও লিঙ্গ, হরমোন
সংক্রামণ	দেহের অংশবিশেষে রক্তস্বল্পতা
বহিরাগত বস্তুর অবস্থান	বহুমুত্র রোগ, নির্দিষ্ট ওষুধ, অপুষ্টি

পুনঃস্থাপন (Repair):

ক্ষতিগ্রস্থ কোষসমূহ নতুন কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে পুনরায় মেরামত হওয়াকে নিরাময় বা পুনঃস্থাপন (Repair) বলে। প্রদাহের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কোষগুলও অকেজো হয়ে গেলে নতুন টিস্যুর সৃষ্টি হয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। প্রতিস্থাপিত টিস্যুই পূর্বের টিস্যুর স্থান দখল করে। এই প্রক্রিয়াকে পুনঃস্থাপন বা নিরাময় বলা হয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, প্রদাহ দূরীকরণের ক্ষেত্রে ঔষধ (যেমনঃ এন্টিবায়োটিক) ছাড়াও ফিজিওথেরাপি, ইলেক্ট্রোথেরাপি, স্টেম সেল থেরাপী ও আকুপাংচার চিকিৎসাও বিশেষভাবে কার্যকর। চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিরাময় বা পুনঃস্থাপন হয়:

১) রক্ত জমাট বাধন (Coagulation): এই প্রক্রিয়ায় নতুন রক্তনালী সৃষ্টি হয়,

২) প্রদাহ (Inflammation): এই প্রক্রিয়ায় ফাইব্রোব্লাস্ট ও শ্বেত রক্ত কনিকা জড়ো হয়,

৩) কোষ সংখ্যা বৃদ্ধি (Proliferation): ফাইব্রোব্লাস্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করে নতুন ম্যাট্রিক্স সৃষ্টি হয়,

৪) পুনর্গঠন (Remodelling) : এই প্রক্রিয়া আন্তঃ ও বহিঃ আবরণী সুগঠিত হয়।

চিত্র ৩.২: পুনর্গঠন ও পুনঃউৎপত্তি

পুনঃউৎপত্তি (Regeneration)

কখনও কখনও আঘাত অথবা অস্ত্রপ্রচার জনিত কারণে দেহের অভ্যন্তরে অথবা উপরিভাগে কিছু স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে টিস্যুর পুনঃউৎপত্তির মাধ্যমে উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থান পুনরায় সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে পুনঃউৎপত্তি বা রিজেনারশন বলে। একই ধরনের নতুন কলা বা কোষ দিয়েসাধারণত ক্ষতিগ্রস্থ কলার পুণঃস্থাপন হয়েথাকে। কলা বা কোষের পুণঃস্থাপন কোষভেদে তিন প্রক্রিয়ায় হয়। যথা:

১. লেবারেল,

২. স্টেবল ও

৩. পারমানেন্ট।

লেবারেল ও স্টেবল কোষগুলো পুণরায় তৈরি হতে পারে ও পুণঃস্থাপন হতে সক্ষম।

পুনঃস্থাপন ও পুনঃউৎপত্তির মধ্যে সাম্যক পার্থক্যঃ

পুনঃস্থাপন	পুনঃউৎপত্তি
ক্ষত চিহ্ন থাকে	ক্ষত চিহ্ন থাকে না
পূর্বের কার্য সম্পাদনায় ব্যর্থ	কার্যকর টিস্যু
অগোছালো ম্যাট্রিক্স	সুসজ্জিত স্বাভাবিক টিস্যু
ক্ষতস্থান সঙ্কুচিত হয়	সঙ্কুচিত হয় না
ত্বকের স্বাভাবিক ক্ষত নিরাময় করে	যকৃতের ক্ষত নিরাময় করে

৩.৩ সংক্রমণ (Infection)

সংক্রমণের ফলে কোনো পোষক জীবদেহে রোগ সৃষ্টিকারী সংঘটকের প্রবেশ, আক্রমণ, সংখ্যাবৃদ্ধি, পোষক দেহকলার সাথে সংঘটিত বিক্রিয়া এবং এর ফলে উৎপন্ন উপসর্গের সমষ্টিকে বোঝায়। সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট রোগকে সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ বলে।

শ্রেণিবিভাগ: *উপসর্গের ভিত্তিতে সংক্রমণ দুই প্রকার।*

১) অনির্ণীত সংক্রমণ (Sub clinical infection) যা অসম্পূর্ণ রোগ লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পায়।

২) নির্ণীত সংক্রমণ (Clinical infection) যা পূর্ণ রোগ লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পায়।

জীবাণুর ভিত্তিতে সংক্রমণ

১) ব্যাক্টেরিয়া জনিত

২) ভাইরাস জনিত

৩) ছত্রাক জনিত

৪) প্রাজমোডিয়াম জনিত

সংক্রমিত অঙ্গের ভিত্তিতে রোগের সচিত্র উদাহরণ:

টনসিলাইটিস: গলার লসিকা গ্রন্থি বা (Tonsil) এর সংক্রমণ	মেনিঞ্জাইটিস মস্তিষ্কের আবরণী (Meninges) এর সংক্রমণ	অটাইটিস মিডিয়া: কানের মধ্য কোঠর (Middle ear) এর সংক্রমণ
নিউমোনিয়াঃ ফুসফুসের (Lungs) সংক্রমণ	হেপাটাইটিস: যকৃতের (Liver) সংক্রমণ	কোলেসিস্টাইটিস: পিত্ত থলির (Gallbladder) সংক্রমণ

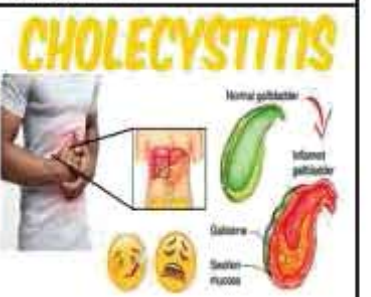

সংক্রমণ সংঘটক (Agent) যেমন- ভাইরাস, ভিরয়েড , প্রিয়ন, ব্যাকটেরিয়া, নেমাটোড (বিভিন্ন প্রকার কৃমি), পিঁপড়া, আর্থ্রোপড যেমন উকুন, মাছি এবং বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক দ্বারা সংঘটিত হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গ

১. সংক্রমণের উপসর্গ রোগের ধরনের উপর নির্ভর করে।

২. সংক্রমণের কিছু লক্ষণ সাধারণত পুরো শরীরকে প্রভাবিত করে, যেমন ক্লান্তি, ক্ষুধা হ্রাস, ওজন হ্রাস, জ্বর, রাতে ঘাম, ঠান্ডা, ব্যথা।

৩. অন্যদের চামড়ায় দাগ, কাশি ইত্যাদি হতে পারে।

ভাইরাসঘটিত এবং ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণের পার্থক্য	
ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ	ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণ
সাধারণত বহুতান্ত্রিক- শরীরের এক বা একাধিক অংশকে আক্রমণ করে। যেমন কাশি, হাঁচি, চুলকানি, ইত্যাদি।	ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণের লক্ষণগুলো হল দেহের নির্দিষ্ট জায়গা ১. লাল হয়ে যাওয়া, ২. গরম হয়ে যাওয়া, ৩. ফোলা এবং ৪. ব্যথা।
ভাইরাসগুলো শরীরের নির্দিষ্ট অংশকেও আক্রমণ করতে পারে, যেমন চোখ উঠা।	ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হল শরীরের নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যথা। উদাহরণস্বরূপ, যদি শরীরের কোথাও কেটে যায় এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়, তবে সংক্রমণের জায়গায় ব্যথা হয়।
অল্প কিছু ভাইরাসজনিত সংক্রমণ বেশ পীড়াদায়ক, যেমন বিসর্প বা হার্পিস।	ব্যাকটেরিয়াঘটিত গলা ব্যথা প্রায়ই গলার এক পাশে ব্যথা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যদি কোন কাটা অংশে পুঁজ জমে,তবে তার সম্ভাব্য কারণ ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণ।

সম্পূরক পরিভাষা:

- দূষিতকরণ (Contamination) কোনো সংক্রামক জীবাণুর উপস্থিতি, যথা- কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী, পানি বা খাদ্য বস্তু ইত্যাদি
- দূষণ (Pollution) সংক্রামক জীবাণু বা যে কোনো ক্ষতিকর বস্তু পরিবেশে উপস্থিতিকে দূষণ বলে। যেমন- বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদি।
- পরজীবী সংক্রমণ (Infestation): শরীরের ভেতরে বা বাহিরে কোন পরজীবীর উপস্তিতি, বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধিকে পরজীবী সংক্রমণ বলে। যেমন- কৃমি দ্বারা সংক্রমণ, চুলে উকুন থাকা, ম্যালেরিয়ার জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ ইত্যাদি।
- সংক্রামক রোগ (Contagious disease): সংস্পর্শজনিত কারণে জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ বা সৃষ্ট রোগকে সংক্রামক রোগ বলে। যেমন – খোচ পাচড়া (Scabies), হাম, কলেরা, বসন্ত, ফ্লু ইত্যাদি।
- গণসংক্রামক রোগ (Communicable disease): সংক্রামক জীবাণু দ্বারা সংঘটিত রোগ যা প্রত্যক্ষভাবে মানুষ থেকে মানুষে, প্রাণি থেকে প্রাণিতে বা মানুষে, পরিবেশ থেকে মানুষে বিস্তার লাভ করে তাকে গণসংক্রামক রোগ বলে।

৩.৪ রোগ প্রতিরোধ (Immunity)

দেহের বাইরের বিভিন্ন ক্ষতিকারক বস্তু এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য যে বৈশিষ্ট বা ক্ষমতা বলে এসব জীবাণুকে, চিহ্নিত, আবদ্ধ ও ধ্বংস করতে পারে তাকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) বা অনাক্রম্যতা বলা হয়।

এন্টিবডি (Antibody): এন্টিবডি হচ্ছে বহিরাগত পদার্থের প্রতি সাড়া দিয়ে প্লাজমা-কোষ থেকে উৎপন্ন প্রোটিনধর্মী পদার্থ যা এর সমধর্মী এন্টিজেনের সংগে সুনির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করে।

এন্টিজেন (Antigen): বহিরাগত বস্তুর একটি অংশ যা বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে কোষের প্লাজমা মেমব্রেনে অবস্থান নিয়ে এন্টিবডি উৎপাদনে উদ্দীপনা জোগায়, তাকে এন্টিজেন বলে। সংক্রমণ মুক্ততা বা রোগ প্রতিরোধ বা অনাক্রম্য হলো দেহের কাঠামো নিয়ে গঠিত নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা দেহে রোগব্যাধির বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে। সঠিকভাবে কাজ করতে অনাক্রম্যকে বহিরাগত ভাইরাস বা পরজীবীর বিভিন্ন এজেন্ট যাদেরকে রোগ সংক্রামক জীবাণু বা (Pathogen) বলা হয়।

রোগ সংক্রামক জীবাণুগুলো খুব দ্রুত বৃদ্ধি বা বংশবিস্তার লাভ করে অনাক্রম্যতন্ত্রকে (Immune System) ফাঁকি দিতে পারে, আবার অনেক প্রতিরক্ষা উপাদানও একইভাবে উন্নতি করে রোগ সংক্রামক জীবাণুকে সনাক্ত ও প্রশমিত করতে পারে। অনাক্রম্যতন্ত্রের কার্যপ্রণালীর মধ্যে রয়েছে শ্বেত কনিকার ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া, ডিফেনসিন নামধারী ক্ষুদ্রাণুরোধী পেপটাইডসমূহ এবং কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম। মানুষের নির্দিষ্ট রোগ সংক্রামক জীবাণুগুলোর বিরুদ্ধে আরো সুচারুরূপে পদক্ষেপ নেবার মতো অধিক উন্নত প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে।

চিত্র ৩.৩: ইনেট ইমুউনিটির অঙ্গসমূহ।

রোগ প্রতিরোধ প্রকারভেদ:

অর্জনের ভিত্তিতে:

১. ইনেট ইমুউনিটি (Innate Immunity) - যা দেহের কাঠামো, অঙ্গ, অঙ্গাণু দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং বংশগত ভাবে প্রাপ্ত

২.এ্যাকুয়ার্ড ইমুউনিটি (Acquired Immunity)– যা সংক্রমণ বা টিকা গ্রহণের পর জীবাণুর প্রতিরোধের স্মৃতি থেকে প্রাপ্ত

চিত্র ৩.৪: অনাক্রম্যতন্ত্রে কোষসমূহ

সংক্রমণের পর অনাক্রম্য স্মৃতি তৈরী করে রাখে যা একবার প্রতিরোধ করা হয়েছে এমন সংক্রামক জীবাণুর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলে।

অনাক্রম্যতন্ত্র সমস্যার ভিত্তিতে:

১. স্বয়ং অনাক্রম্য ব্যাধি (Auto immune Disease): অনাক্রম্যতন্ত্র নিজ দেহ কোষকে ঠিকভাবে সনাক্ত না করে তাকে বহিরাগত কোষ মনে করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াকে স্বয়ং (অটোইম্যুনিটি) অনাক্রম্যতা বলা হয়। অনাক্রম্যতন্ত্রে কোনো সমস্যা হলে, স্থায়ী প্রদাহী ক্ষত বা ক্যান্সার হতে পারে। যেমন- হাশিমোটোস থাইরয়ডিটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস টাইপএবং সিস্টেমিক লুপাস ১-এরিথেমাটোসাস।

২. অনাক্রম্যহীনতা (Immune deficiency): অনাক্রম্যতন্ত্র তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকলে এবং তা থেকে প্রাণঘাতী সংক্রমণ হতে পারে।

অনাক্রম্যহীনতার কারণ

১. জীবাণুর কারণে যেমন (এইডস/এইচ আই ভি)

২. অনাক্রম্যতন্ত্রকে দুর্বল করে এমন ওষুধ ব্যবহারের কারণেও হতে পারে। (যেমন স্টেরয়েড)

শারীরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মত জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যদি এই জীবাণুসমূহ শারীরিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্বারা নিষ্ক্রিয় না হয়,তবে সহজাত অনতিক্রম্যতা এর কাজ শুরু করে,যদিও এই ধরনের প্রতিরোধ অনির্দিষ্ট ধরনের। যদি তাতেও জীবাণু নিষ্ক্রিয় না হয় তাহলে, তিন একধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা,এ্যাকুয়ার্ড ইমুউনিটি সক্রিয় হয়। এই ধরনের প্রতিরোধ জীবাণু শরীরে প্রবেশের পরই তৈরি হয় এবং ক্রমশ এর কার্যকারীতা বাড়তে থাকে এবং জীবাণু ধ্বংসের পরও এর স্মৃতি শরীরে থেকে যায় এবং পুনরায় একই জীবাণুর আক্রমণে এ্যাকুয়ার্ড ইমুউনিটি একে চিনতে পেরে সক্রিয় হয় এবং জীবানুকে প্রতিরোধ করে।

অর্জিত অনাক্রম্যতা ও ইনেট ইমিউনিটির মধ্যে পার্থক্য -

এ্যাকুয়ার্ড ইমুউনিটি (Acquired Immunity)	ইনেট ইমিউনিটি (Innate Immunity)
জীবাণু নির্দিষ্ট	জীবাণু অনির্দিষ্টতা
জীবাণু প্রবেশের কিছুসময় পর কার্যকর হয়	তাৎক্ষনিকতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
স্মৃতিরক্ষক	স্মৃতিহীনতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
মেরুদন্ডীদের অন্যতম অন্যক্রম্যতা	সকল ধরনের প্রাণিতে উপস্থিত
সেলুলার ও হিউমোরাল অনাক্রম্যতা উপস্থিত	সেলুলার ও হিউমোরাল অনাক্রম্যতা উপস্থিত
নিজস্ব ও বাহ্যিক পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা আছে	নিজস্ব ও বাহ্যিক পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা আছে
মূলত এন্টিজেন এর বিপরীতে এন্টিবডির মাধ্যমে কার্যকর হয়।	বিভিন্ন যান্ত্রিক, রাসায়নিক, জৈবিক বাধা এর অন্তর্ভুক্ত।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অনাক্রম্যতার অর্জনের বিভিন্ন উপায়সমূহ

ইনেট ইমিউনিটির উৎপাদকসমূহ:

ক. যান্ত্রিক বাধা দ্বারা জীবাণু বাধাগ্রস্থ হয়-

১) ত্বক,
২) ফুসফুসের হাঁচিকাশি-মিউকাস,
৩) চোখের পানি,
৪) মূত্র,ইত্যাদি।

খ. রাসায়নিক বাধা জীবাণু ধ্বংসে অনাক্রম্য হিসেবে কাজ করে

১) ত্বক এবং শ্বসনতন্ত্রের বিটা ডিফেন্সিন এনজাইম
২) মাতৃদুগ্ধ, লালা, অশ্রুনির্গত লাইসোজাইম, ফসফোলাইপেজ এ-টু।
৩) মহিলাদের যোনিপথের অম্লধর্মী পরিবেশ এবং
৪) পুরুষের সিমেনের ডিফেন্সিন এবং জিংক

৩.৫ শারীরিক ক্ষত (Physical Wounds)

যেসব কারণে ত্বক ভেঙে যায় তখন থাকে ক্ষত (wound) বলে। যেমন, ত্বক কেটে গেলে, স্ক্র্যাপস (Scrapes), এবং স্ক্র্যাচ (Scratch) হলে। একজন ব্যক্তি রান্না করার সময়, বাগানের পরিচর্যা করার সময় এমনকি কোনো কিছু পরিষ্কার করার সময় জখমের শিকার হতে পারে। ছোট বাচ্চারা খেলাধুলা অথবা বাড়ির মধ্যে উপর থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে এই ধরনের দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেকারণেই ক্ষত তৈরি হোক না কেন, এই ক্ষতের যত্ন কিভাবে নিতে হবে তা একজন স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য জানা খুবই জরুরি। একটি যথাযথ যত্নের মাধ্যমে ক্ষত থেকে সৃষ্ট সংক্রমণ (infection) ও অন্যান্য জটিলতা (complications) থেকে রোগীকে প্রতিরোধ করা যায়।

৩.৫.১ ক্ষত স্থানের যত্ন নেয়ার নিয়ম:

নিম্নলিখিত উপায়ে জখমে আক্রান্ত একজন রোগীর যত্ন নেয়া যেতে পারে-

১। প্রথমে সাবান- পানি দিয়ে হাত ধুয়ে এবং পরে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে নিজের হাত জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।

২। পরিষ্কার কাপড় অথবা ব্যান্ডেজ দিয়ে চেপে ধরে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে।

৩। ক্ষত স্থানটিকে চলমান পানি (Running water) দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। প্রয়োজনে ক্ষতস্থানটির আশে-পাশে সাবান ব্যবহার করে পরিষ্কার করা যেতে পারে। তবে ক্ষতের মধ্যে যেন সাবান না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪। ক্ষতটি যদি ছোট আকৃতির হয় তাহলে এ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল মলম (Antibacterial Ointment) ব্যবহার করতে হবে।

৫। ক্ষত রক্ষা করার পরবর্তী পদক্ষেপটি হল ক্ষতটিকে একটি জীবাণুমুক্ত ড্রেসিং দিয়ে ঢেকে রাখা এবং একটি ব্যান্ডেজ দিয়ে সুর ক্ষত করা। এটি ক্ষতটির চারপাশের ত্বককে রক্ষা করে এবং ক্ষতটিকে আকারে বাড়তে বাধা দেয় এবং নিরাময়ের জন্য এটিতে চাপ প্রয়োগ করে।

৬। পরবর্তী ধাপটি হল দিনে অন্তত একবার ড্রেসিং পরিবর্তন করা। ড্রেসিং পরিবর্তন করার সময় হাত ধোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে ক্ষতস্থানটি সাবধানে পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ দিয়ে সুরক্ষিত করে নিতে হবে।

৭। ড্রেসিং পরিবর্তন করার সময় খেয়াল করতে হবে যে, রোগীর ক্ষতস্থানটি শুকাচ্ছে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় ক্ষতস্থান থেকে হলুদ স্রাব (yellowish discharge) অথবা স্থানটি গাঢ় লাল রঙের দেখা যায়। এমনটি হওয়ার অর্থ হল ক্ষতটি ঠিকমত শুকাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে, একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৮। রুটিন অনুযায়ী ক্ষতস্থানটির বিভিন্ন লক্ষণ পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।

জব ১: ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে প্রদাহের উপসর্গ চিহ্নিত করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস্, ইকুইপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- প্রদাহের উপর্সগসমূহ চহ্নিতি করা।
- প্রদাহের অবস্থান উল্লেখ করা।
- প্রদাহের সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Tools & Equipment)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
৫)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
৬)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৭)	নমুনা ছবি	নমুনা মোতাবেক	১টি
৮)	মডেল	নমুনা মোতাবেক	১ টি

প্রদাহের উপসর্গ চিহ্নিত করার কৌশলঃ

১. ছবিতে চিহ্নিত প্রদাহের উপসর্গগুলো সনাক্ত করা।

২. সনাক্তকৃত উপসর্গগুলোর নাম পাশে লিখা।

৩. প্রদাহের কারণ উল্লেখ করা।

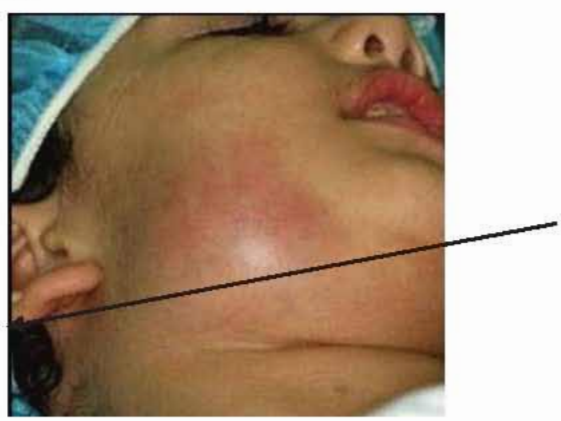

কাজের ধারা

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই পরতে হবে।

২। নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।

৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে প্রস্তুত করতে হবে।

৪। দুই হাতে ক্লিন গ্লোভস পড়ে রোগীকে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে প্রদাহের উপসর্গ চিহ্নিত করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে তার মৌখিক সম্মতি নিতে হবে।

৫। রোগীর পজিশন আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে নিতে হবে।

৬। রোগীর ক্ষতিগ্রস্থ স্থানে একের পর এক ধাপ মেনে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

৭। রোগীর ক্ষতস্থান ও আশেপাশের কোনো পরিবর্তন যেমন লালচে ভাব, ফোলা, তাপ, ব্যথা ইত্যাদি আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।

৮। চিকিৎসক কোনো রক্তের পরীক্ষা দিয়ে থাকলে তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১০। পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম, উপকরণসমূহ এবং কাজের এলাকাটি পরিষ্কার করে নির্দেশনা অনুসারে সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

কাজের সতর্কতা

- নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফলঃ

- নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।
- **ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্যঃ** বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২- কুসকুসে সংক্রমণের উপসর্গ চিহ্নিত করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শীতার মানদণ্ড:

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।

- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োাজনীয় টুলস্, ইকুইপমেন্টও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- সংক্রমণের উপর্সগসমূহ চিহ্নিত করা।
- সংক্রমণের অবস্থান উল্লেখ করা।
- সংক্রমণের সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলো সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম **(PPE):** প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Tools & Equipment)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩)	নমুনা ছবি	নমুনা মোতাবেক	১টি
৪)	মডেল	নমুনা মোতাবেক	১ টি

ফুসফুসে সংক্রমণের উপসর্গ চিহ্নিত করার কৌশলঃ

১. ছবিতে চিহ্নিত সংক্রমণের উপসর্গগুলো সনাক্ত করা।

২. সনাক্তকৃত উপসর্গগুলোর নাম পাশে লিখা।

৩. সংক্রমণের কারণ উল্লেখ করা।

কাজের ধারা

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পরতে হবে।

২। নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।

৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে প্রস্তুত করতে হবে।

৪। দুই হাতে ক্লিন গ্লোভস পড়ে রোগীকে ফুসফুসে সংক্রমণের উপসর্গ চিহ্নিত করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে তার মৌখিক সম্মতি নিতে হবে।

৫। রোগীর পজিশন আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে নিতে হবে।

৬। রোগীকে লম্বা শ্বাস নিয়ে কাশি দিতে বলতে হবে এবং লক্ষ্য করতে হবে কাশির সাথে ঘন শ্লেষ্মা বের হয় কিনা।

৭। রোগীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তার বুকের ব্যথা প্রায়শই ধারালো বা ছুরিকাঘাতের মত অনুভব করে কিনা এবং কাশি বা গভীরভাবে শ্বাস নেওয়ার সময় বুকের ব্যথা আরও বাড়ে কিনা।

৮। রোগীর জ্বর, হৃদ-স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার ইত্যাদি পরিমাপ করতে হবে।

৯। রোগীর সর্দি ও হাঁচির মত উপসর্গ আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১০। রোগীর শ্বাস কষ্টের কারণে তার ত্বক ও ঠোঁট নীল বর্ণের হয়ে যায় কি না তা দেখতে হবে।

১১। একটি স্টেথোস্কোপ বুকের উপর রেখে পরীক্ষা করে দেখতে হবে ফুসফুস থেকে কোনো কর্কশ শব্দ শোনা যায় কিনা।

১২। চিকিৎসক কোনো ল্যাবরেটরী পরীক্ষা দিয়ে থাকলে তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৪। পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম, উপকরণসমূহ এবং কাজের এলাকাটি পরিষ্কার করে নির্দেশনা অনুসারে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

কাজের সতর্কতা

- নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:

- নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।
- **ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য:** বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৩-ক্ষতস্থান চিহ্নিত ও তাঁর পরিচর্যাকরণ

পারদর্শিতার মানদন্ড:

- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম নিশ্চিত করে কাজ শুরু করা।
- কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস্, ইকুইপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ এবং নির্বাচন করা।
- ক্ষতস্থান চিহ্নিত করা।
- ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করা।
- ক্ষতস্থানের অবস্থান ও গভীরতা উল্লেখ করা।
- কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম এবং উপকরণগুলি সুশৃঙ্খলভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- কর্মক্ষেত্র পরিষ্কার করা।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Tools & Equipment)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১)	ছবিযুক্ত বই	পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক	১টি
২)	বল পয়েন্ট কলম	কালো কালির	১টি
৩)	নমুনা ছবি বা ক্ষত	নমুনা মোতাবেক	১টি
৪)	মডেল	নমুনা মোতাবেক	১ টি

ক্ষতস্থান চিহ্নিত ও তাঁর পরিচর্যা করার কৌশলঃ

১. ছবিতে চিহ্নিত সংক্রমণের উপসর্গগুলো সনাক্ত করা।

২. সনাক্তকৃত উপসর্গগুলোর নাম পাশে লিখা।

৩. সংক্রমণের কারণ উল্লেখ করা।

কাজের ধারা

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই পরতে হবে।

২। আদর্শ নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।

৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে প্রস্তুত করতে হবে।

৪। দুই হাতে ক্লিন গ্লোভস পড়ে রোগীকে ক্ষতস্থান চিহ্নিত ও তাঁর পরিচর্যাকরনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে তার মৌখিক সম্মতি নিতে হবে।

৫। রোগীর পজিশন আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে নিতে হবে।

৬। রক্তপাত বন্ধ করার জন্য ক্ষতস্থান শক্ত করে চেপে ধরতে হবে।

৭। হাত বা পা কেটে গিয়ে রক্তপাত হলে ক্ষতস্থান হৃদপিন্ডের উপরে তুলে ধরতে হবে। সেক্ষেত্রে রক্তপাত কম হবে, কারণ তরল পথার্থ কখনোই উপরের দিকে প্রবাহিত হতে পারে না।

৮। ক্ষতস্থানের উপর একটি পরিষ্কার কাপড়ের প্যাড দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হবে।

৯। এরপরেও যদি রক্তপাত না কমে সেক্ষেত্রে রক্তচাপ বিন্দু বা প্রেসার পয়েন্ট চেপে ধরতে হবে।

১০। দিনে অন্তত একবার ড্রেসিং পরিবর্তন করতে হবে। ড্রেসিং পরিবর্তন করার পূর্বে প্রতিবার হাত ধুয়ে নিতে হবে।

১১। ক্ষতস্থানটির অবস্থা যদি বেশি খারাপ হয় তাহলে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

১২। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

কাজের সতর্কতা

- নমুনা অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:

- নমুনা চিহ্নিত করে এর ব্যবহার বা কাজ উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছ।
- **ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য:** বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রদাহ বলতে কি বুঝায়?

২। প্রদাহের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

৩। সংক্রমণের বিভিন্ন অংশের নাম উল্লেখ কর।

৪। নিরাময়ের উদাহরণ দাও।

৫। সংক্রমণ কেন হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রদাহ, সংক্রমণ, নিরাময় ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়গুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

২। পুনঃস্থাপন ও পুনঃউৎপত্তির মধ্যে পার্থক্য লিখ।

৩। নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদকগুলো উল্লেখ কর।

৪। নিরাময় প্রক্রিয়ার অংকন কর।

৫। প্রদাহের যত্ন প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফুসফুসে সংক্রমণের উপসর্গ চিহ্নিত করার ধাপগুলো ক্রমানুসারে বর্ণনা কর।

২। ক্ষতস্থান চিহ্নিত ও তাঁর পরিচর্যা করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সহযোগিতা

Activities of Daily Living (ADL)

দৈনন্দিন জীবনের আর দশটি স্বাভাবিক কাজের মতই আমরা বিভিন্ন সময়ে বয়স্ক মানুষকে, কোনো কোনো সময় বাচ্চাদের অথবা আমাদের পরিবারের সদস্যদের নানারকম কাজে সহায়তা করে থাকি। যেমন, ওরাল হাইজিন, টয়লেটিং, ডায়াপার বদলানো, গ্রুমিং ও ড্রেসিং, গোসল করানো, সাধারণ গৃহস্থালীর কাজকর্মে সহায়তা এবং হালকা ব্যায়ামে সহযোগীতা ইত্যাদি। আর এভাবেই আমরা নানাবিধ সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকি অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু দৈনন্দিন কর্মকান্ড। এই অধ্যায়ে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জ্ঞান ও দক্ষতা আলোচিত হয়েছে যা কেয়ারগিভিং কর্মকান্ডে ক্যারিয়ার গড়তে তোমাদেরকে অনেক সহায়তা করবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সহযোগিতা কী তা বলতে পারবো।
- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) বিধি সম্পর্কে বলতে পারবো।
- রোগীর ওরাল হাইজিন বজার রাখার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবো।
- রোগীকে টয়লেটিং-এ সহযোগীতা করতে পারবো।
- রোগীকে ডায়াপার বদলাতে সহযোগীতা করতে পারবো।
- রোগীকে গ্রুমিং ও ড্রেসিং-এ সহযোগীতা করতে পারবো।
- রোগীকে গোসল করাতে পারবো।

৪.১. দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা -Activities of Daily Living (ADL) কি?

Activities of Daily Living (ADL) বা দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা হল সম্মিলিতভাবে বা নিজে যত্ন নেয়ার জন্য যে প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতাগুলো প্রয়োগকে বুঝায়। যেমন খাওয়ানো, গোসল করানো, চলাফেরা করানো ইত্যাদি। এটা হলো একজন ব্যক্তির নিত্যদিনকার কাজকর্ম। ADL হচ্ছে একজন রোগী কতটা কার্যকরী অবস্থায় আছেন তা পরিমাপের একটা উপায় । দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মগুলো একজন রোগী যখন করতে পারেন না তখন তাকে অন্যদের উপর অথবা যান্ত্রিক ডিভাইসের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। রোগী যখন তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপগুলো সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়েন তখন তার জন্য তৈরি হয় একটি অনিরাপদ পরিস্থিতি যা তাদের জীবন মানের অবস্থা আরো খারাপ করে দেয়। একজন রোগীর জীবনে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সক্ষমতা থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার উপরে ভিত্তি করেই উক্ত রোগীদের বিভিন্ন নার্সিং হোমে কিংবা হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। তাছাড়াও সেসব রোগীদের জন্য বিকল্প জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, অর্থের বিনিময়ে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় বহন করতে হয়। অনেক সময় রোগীর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সক্ষমতা পর্যালোচনা করে তাদের চিকিৎসা কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়।

৪.২ ওরাল হাইজিন

স্বাস্থ্যসম্মত মুখগহ্বর তথা স্বাস্থ্যবান দাঁত হল শারীরিক এবং মানসিক সুখের এক পূর্বশর্ত। জনসমক্ষে কথা বলতে, হাসতে ব্যক্তিকে প্রতিবারই দাঁত প্রদর্শন করতে হয়। অস্বাস্থ্যকর মুখগহ্বরের কারণে শারীরিক অসুবিধা তো আছেই - এছাড়া মুখের বাজে গন্ধ অথবা দাঁত-মাড়ির শোচনীয় অবস্থা আমাদের আত্মবিশ্বাসকেও নড়বড়ে করে দেয়। শক্ত সুগঠিত এবং স্বাস্থ্যকর মুখ ও দাঁতের সাহায্যে আমরা সঠিকভাবে খাদ্য চিবিয়ে খেতে পারি, কথা পরিষ্কারভাবে বলতে পারি এবং অবশ্যই মনোহর হাসি হাসতে পারি । ওরাল হাইজিন বলতে মুখ-গহ্বরের ভেতর অবস্থিত দাঁত, মাড়ি এবং জিহ্বার সম্মিলিত সঠিক এবং বিজ্ঞান সম্মত পরিচর্যাকে বুঝায় । যেসকল রোগী তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে মুখ-গহ্বরের যত্ন নিতে পারেন না তারা মুখের ভিতরে দাঁতের ক্ষয় অথবা ক্যান্ডিডিসহ বিভিন্ন সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকেন।

চিত্র ৪.১: দাঁতের ক্ষয় রোগ

চিত্র ৪.২: মুখের মাড়ির সংক্রমন

মুখগহ্বর সঠিকভাবে পরিষ্কার না করার ফলে সৃষ্ট প্রেক একসময় মাড়িতে জিঞ্জিভাইটিস নামক রোগের সৃষ্টি করে। এতে মাড়ি লাল হয়ে ফুলে যায় এবং প্রচন্ড ব্যথার সৃষ্টি করে ।

৪.২.১ মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মান সম্পন্ন মৌখিক যত্ন যে কোনো বয়সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিশেষ মৌখিক স্বাস্থ্যবিধি ও যত্নের প্রয়োজন, যেমন - বয়ঃবৃদ্ধ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু। ক্রমবর্ধমানহারে বর্তমানে পরিবারের সদস্যরা কেয়ারগিভার রাখতে আগ্রহী হচ্ছেন। তাই কেয়ারগিভারদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মদক্ষতা হলো, গ্রাহকের মৌখিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জানা। ওরাল হাইজিন সাধারণ স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার মানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেকের প্রতিদিন মুখের যত্ন নেওয়া দরকার।

একটি স্বাস্থ্যকর মুখ:

১। ভালো খাদ্যাভাস তৈরি করে: কারণ ব্যক্তি স্বাদ নিতে সক্ষম হয়।কামড়, চিবানো এবং ব্যথা বা অস্বস্তি ছাড়াই খাবার গিলে ফেলতে পারে।

২। ওরাল ইনফেকশন প্রতিরোধ করে।

৩। রোগীদের নিজের সম্পর্কে ভালো বোধ করতে সহায়তা করে।

৪। দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস প্রতিরোধ করে।

মুখ সুস্থ রাখার ফলে শরীর সুস্থ থাকে।মাইক্রো-অর্গানিজম (যেমন, ব্যাকটিরিয়া) থেকে মুখের সংক্রমণ রক্ত প্রবাহে বা শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করে এবং চলাচল করতে পারে শরীরের অন্যান্য অংশে। এই অণুজীবের কারণে অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন, হৃদরোগ, স্ট্রোক ও নিউমোনিয়ার মতো শ্বাসকষ্ট জনিত ব্যাধি এবং ফুসফুসের অন্যান্য রোগ।ডায়াবেটিস থাকলে রোগির মাড়ির সংক্রমণ জনিত রোগ আরও জটিল হতে পারে।

৪.২.২ মুখগহ্বরের স্বাস্থ্যের দুর্বলতা বোঝার উপায় ও করণীয়

সঠিক পরিচর্যার অভাবের লক্ষণ:

১। দাঁতের ফাঁকে খাবারের অংশ বিশেষ

২। দাঁতে গর্ত এবং মূল ক্ষয়

৩। ওজন হ্রাস

৪। দীর্ঘস্থায়ী দুর্গন্ধ

৫। লাল, ফোলা বা কোমল মাড়ি, যেখান থেকে ব্রাশ বা ফ্লসিং করার সময় রক্তক্ষরণ হয়

৬। কোনো আপাত কারণে দাঁত সংবেদনশীলতা

৭। দাঁত অবস্থানচ্যুত হওয়া বা নড়া

৮। মাড়ি এবং দাঁতের চারপাশে ফোলাভাব বা পুঁজ দেখা

৯। দাঁতের ডেন্চার (আর্টিফিসিয়াল দাঁত বা ব্রেস) ঢিলা হয়ে যাওয়া

করণীয়:

মাড়ির রোগ এবং দাঁত থেকে মুখের সংক্রমণ রোধে সহায়তা করার জন্য ক্ষয়, প্লাক ব্যাকটিরিয়া (সাদা, চটচটে পদার্থ) যা প্রতিদিন পরিষ্কার করা আবশ্যক। যখন প্লাকটি জমতে জমতে শক্ত হয়ে যায়, তাকে ক্যালকুলাস বা টার্টার বলা হয়। গুরুতর অবস্থা হলে রোগীকে বা রোগীর অভিভাবককে সেই বিষয়ে অবগত করে এবং ডেন্টিস্টের শরনাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত। প্রয়োজনে কেয়ারগিভার রোগীকে ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যাবে।

৪.২.৩ মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কেয়ারগিভারের নিয়মিত কাজ

১। ফ্লোরাইড টুথপেস্ট ব্যবহার করে দিনে দু'বার দাঁত ব্রাশ করাতে হবে।

২। প্রতিদিন ফ্লসের সাহায্যে দাঁতগুলোর মধ্যে পরিষ্কার করিয়ে দিতে হবে।

৩। প্রতিটি খাবারের পরে ভালোমত কুলকুচি করানো বা গ্রাহক করতে না পারলে দাঁতের ফাঁকের ময়লা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিতে হবে।

৪। যদি ব্যক্তির মুখ ঘনঘন শুকিয়ে যায়, তবে অ্যালকোহল মুক্ত মাউথওয়াশে সাহায্য করতে পারে। বারেবারে অল্প অল্প পানি খাওয়া, কিউব চুষে খাওয়া (চিবানো নয়) এবং ঘুমানোর সময় হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করা তাকে হাইড্রেটেড রাখতে সহায়তা করতে পারে।

৫। বাহিরের খাবার এবং চিনিযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাবার এবং পানীয়, যেমন-ফল, শাকসবজি, শস্য দানা ও বিশুদ্ধ পানি মুখগহ্বর এবং শরীরের জন্য ভালো।

৬। প্রয়োজনে কেয়ারগিভার রোগীকে ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যাবে।

৪.২.৪ মুখগহ্বরের যত্নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

চিত্র ৪.৩: মুখগহ্বরের যত্নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ম্যানুয়াল / ইলেক্ট্রিক টুথব্রাশ, ২। টুথপেষ্ট: ফ্লুরাইটেড টুথপেস্ট , ৩। ডেন্টাল ফ্লস, ৪। মাউথ ওয়াশ, ৫। টুথ পাউডার (প্রয়োজন হলে), ৬। পরিষ্কার পানি, ৭। টাওয়েল, ৮। টিস্যু , ৯। কুলকুচি পাত্র, ১০। আলাদা টুথব্রাশ, ১২। জিহ্বা ক্লিনার ইত্যাদি।

৪.২.৫ সঠিক পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ ও জিহ্বা পরিষ্কার

ধাপ ১- দাঁত ব্রাশের মাথাটি দাঁতের বিপরিত দিকে রাখতে হবে, তারপরে মাড়ির সারির বিপরীতে ৪৫ ডিগ্রি কোণে বিস্টলের টিপসটি রেখে ছোট ছোট বৃত্তাকার গতিতে নড়াচড়া করে ব্রাশটি প্রতিটি দাঁতের সমস্ত পৃষ্ঠের উপরে কয়েকবার করে ঘুরাতে হবে।

ধাপ ২-প্রতিটি দাঁতের বাইরের পৃষ্ঠতল ব্রাশ করে উপরের এবং নীচের অংশে ব্রাশ করে মাড়ির সাথির বিপরীতে রাখতে হবে।

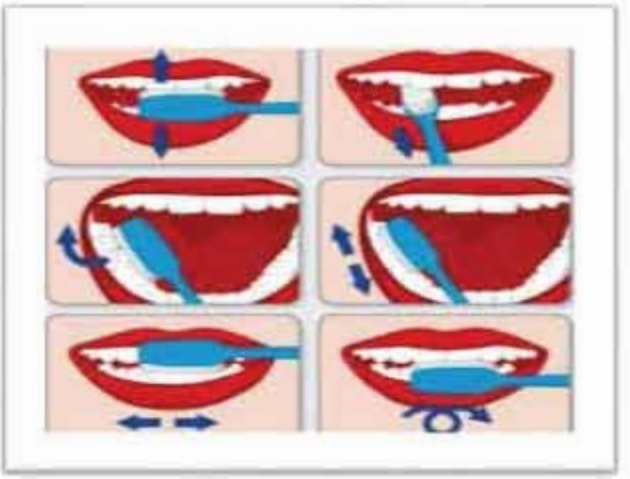

চিত্র ৪.৪: সার্বিক পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ

ধাপ ৩- সমস্ত দাঁতের অভ্যন্তরের পৃষ্ঠগুলোতে একই পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।
ধাপ ৪-দাঁতের চাবানোর পৃষ্ঠগুলো ব্রাশ করতে হবে।
ধাপ ৫-সামনের দাঁতগুলোর অভ্যন্তরের উপরিভাগ পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশটি উল্লম্ব ভাবে কাত করে এবং ব্রাশের সামনের অংশটি দিয়ে কয়েকটি ছোট বৃত্তাকার গতিতে নড়াচড়া করে ঘুরাতে হবে।
ধাপ ৬- জিহ্বা ব্রাশ করার ফলে শ্বাস সতেজ হবে এবং ব্যাকটিরিয়া অপসারণে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে টুথব্রাশ বা আলাদা জিহ্বা ক্লিনার ব্যবহার করা যেতে পারে।

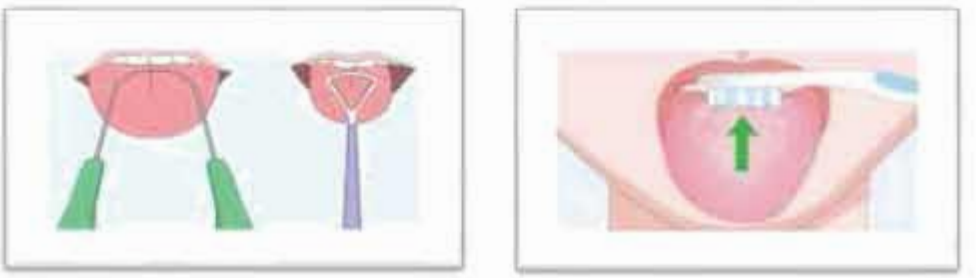

চিত্র ৪.৫: জিহ্বা পরিষ্কারে ক্লিনার ও টুথব্রাশের ব্যবহার

ধাপ ৭-এরপরে ভালোমত কুলকুচি করাতে হবে, তবে রোগী নিজ থেকে তা করতে না পারলে দাঁতের ফাঁকের ময়লা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিতে হবে।
ধাপ ৮-মুখমন্ডল উষ্ণ পানি দিয়ে ভালোমত ধুয়ে বা মুছে দিতে হবে।

৪.২.৬ ডেন্টাল ফ্লসের ব্যবহার

১। ডেন্টাল ফ্লস প্রায় ১৮ থেকে ২৪ ইঞ্চি ছিড়ে নিয়ে ফ্লসটি সঠিকভাবে ধরে রাখতে হবে, বেশির ভাগ ফ্লসের অংশটি উভয় হাতের মধ্যম আঙুলের চারদিকে পেচিয়ে রাখতে হবে। রোগীর দাঁতগুলোর জন্য প্রায় ১ থেকে ২ ইঞ্চি ফ্লস দুই আঙুলের মাঝ বরাবর রেখে দিতে হবে।

২। এর পরে, বৃদ্ধাঙুল এবং তর্জনী আঙুল দিয়ে ফ্লসটাকে ধরে রাখতে হবে।

৩। দুটি দাঁতের মাঝে ডেন্টাল ফ্লস রাখতে হবে। ধীরে ধীরে ফ্লস উপরে ও নীচে সরাতে হবে, প্রতিটি দাঁতের মধ্যে এমন করতে হবে। মাড়িতে ফ্লস লাগানো যাবে না। এটি মাড়িতে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

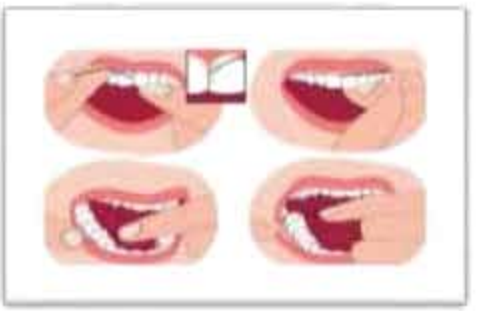

চিত্র ৪.৬: ডেন্টাল ফ্লস দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করার চিত্র

৪। ফ্লসটি মাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথে দাঁতের গোড়ায় ফ্লসটি দিয়ে একটি সি আকার বক্ররেখা তৈরি করতে হবে। এটি ফ্লসকে মাড়ি এবং দাঁতের মধ্যস্থানে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

৫। ধাপগুলো পুনরাবৃত্তি করতে হবে। প্রতিটি দাঁতে ফ্লসটির একটি নতুন, পরিষ্কার অংশ ব্যবহার করতে হবে।

৪.৩ রোগীকে টয়লেটিং-এ সহযোগীতা করা।

স্বাস্থ্যকর্মীরা সাধারণত যেসব রোগীর যত্ন নেয় সেসব রোগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের টয়লেট ব্যবহারে কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। সে কারণে কেয়ারগিভারগণ রোগীদের নিরাপদে টয়লেট ব্যবহারে সাহায্য করতে পারে এবং এর জন্য অনেক উপায়ই রয়েছে। এটি স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত সম্পন্ন করতে অন্য লোকেরও সহযোগীতা নেয়া যেতে পারে।

৪.৩.১ টয়লেটিং এর জন্য সহযোগীতার প্রয়োজন হয় কেন?

একজন রোগীর টয়লেটিং-এর জন্য সাহায্য প্রয়োজন হয় তখন-

১। যখন প্রবীণদের পায়খানা করতে সমস্যা হয়।

২। রোগীর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে।

৩। রোগী ভীষণ অসুস্থতায় থাকলে।

৪। রোগীর জ্ঞান হ্রাস পেলে।

৫। অনিয়ন্ত্রিত প্রস্রাব বা পায়খানা করার কারণে যদি তাদের পোশাক ও চারপাশের আসবাবপত্র ভিজে যায়।

৬। রোগীর বসা থেকে উঠতে অসুবিধা হলে।

৭। রোগীর হাঁটা, ভারসাম্য এবং চলাফেরায় অসুবিধা থাকলে।

৮।রোগীর ঘরে প্রস্রাব বা মলত্যাগের কারণে যদি গন্ধ বা দাগ পড়ে।

ইনকন্টিনেন্স: ইনকন্টিনেন্স সমস্যাটি প্রায়শই ঘটে। এমন একটা সমস্যা যেটি পেশী এবং স্নায়ুর সমস্যার কারণে ঘটে যা মূত্রাশয়কে প্রস্রাব ধরে রাখতে বা ছেড়ে দিতে সহায়তা করে। এ অবস্থায় কাশি বা হাঁচির সময় প্রস্রাব বের হতে পারে। অথবা রোগীর হঠাৎ প্রসাবের চাপ হতে পারে কিন্তু সময়মত বাথরুমে যেতে পারেন না। এটিই হল ইনকন্টিনেন্স।

৪.৩.২ সাহায্যকারী টয়লেটের প্রকারভেদ

১। টয়লেট / কমোড, ২। বেডপ্যান / ইউরিনাল, ৩। অপসারণযোগ্য টয়লেট সিট অথবা পোর্টেবল টয়লেট ও কমোড, ৪। হ্যান্ডাইল এ্যাডজাস্টেবল টয়লেট কমোড

চিত্র ৪.৭: বিভিন্ন ধরনের প্রসাব ও মলত্যাগ উপযোগী টয়লেট

৪.৩.৩ টয়লেট বা কমোড ব্যবহার করতে সাহায্য করা

একজন স্বাস্থ্যকর্মী যখন কারো যত্ন নেন, তখন রোগী যদি বিছানা থেকে উঠতে পারে তাহলে টয়লেট বা কমোড ব্যবহার করা হয়। তবে সেক্ষেত্রেও সেবাকর্মীর কাছ থেকে তার কিছু সহযোগীতার প্রয়োজন হতে পারে। পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

১। রোগী কীভাবে দাঁড়াতে এবং নিরাপদে হাঁটতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।

২। যদি রোগী কমোড ব্যবহার করে, তাহলে তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, তিনি এটি কোথায় রাখতে চান।

৩। যদি তিনি টয়লেট বা কমোডে বসতে চান, তাহলে তাদের রেলিং এর মতো নিরাপদ কিছু ধরে বসতে বলতে হবে।

৪। তখন তাদের কাপড় সরাতে সাহায্য করতে হতে পারে।

৫। টয়লেট বা কমোড ব্যবহার করার সময় তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

৬। প্রয়োজনবোধে তাদের থেকে দূরে সরে যেতে হবে। সাহায্যকারী যদি রুম ছেড়ে যায়, তখন তাদের প্রয়োজন হলে কাছাকাছি থাকতে হবে। টয়লেটের কাজ শেষ হলে পুনরায় সেবাদানকারীর সহযোগিতা প্রয়োজন হলে তা জানাতে বলতে হবে।

চিত্র ৪.৮: যখন একজন রোগীর টয়লেটিং এর জন্য সহযোগীতা প্রয়োজন হয়

এই সময় তাদেরকে:

১। পরিষ্কার করার জন্য টয়লেট পেপার বা ভেজা ওয়াইপস দেওয়া লাগতে পারে।

২। তাদের দাঁড়াতে সাহায্য করা লাগতে পারে।

৩। তাদের জামাকাপড়ঠিক করা বা বোতাম লাগাতে সাহায্য করা লাগতে পারে।

৪। টয়লেট পেপার বা ভেজা ওয়াইপস দিয়ে যদি নিজে পরিষ্কার হতে না পারে তাহলে পরিষ্কার কাপড় দেওয়া লাগতে পারে।

৫। তাদের হাত ধুয়ে পরিষ্কার করতে সাহায্য করা লাগতে পারে।

৬। মলদ্বার থেকে মূত্রনালীতে (শরীরের যে অংশে প্রস্রাব বের হয়) জীবাণু ছড়ানোর কারণে ইউরিন ইনফেকশন হতে পারে। জীবাণু ছড়ানো এবং সংক্রমণের কারণ রোধ করতে সামনে থেকে পিছনে মুছতে হবে।

৭। টয়লেটে ভেজা ওয়াইপস বা অন্যান্য পণ্য ফ্লাশ করা যাবে না। কাজ শেষ হয়ে গেলে এগুলোকে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখতে হবে অর্থাৎ এগুলো সরাসরি একটি নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে রাখতে হবে।

৪.৩.৪ টয়লেট ব্যবহারকে সহজ করা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো রোগীর টয়লেট ব্যবহারকে সহজ করতে পারে:

১। রোগীকে প্রচুর সময় দিতে হবে, যাতে সে তাড়াহুড়া না করে।

২। তাদের রুটিন মাফিক অথবা রুটিনের কাছাকাছি একটা সময়ে টয়লেটিং এর ব্যবস্থা করে দিলে।

৩। টয়লেটটি যদি অনেক দূরে হয় তাহলে মাঝ পথে একটি চেয়ার রাখতে হবে , যাতে রোগী সেখানে বিশ্রাম নিতে পারে।

৪। টয়লেটে আসা -যাওয়ার মেঝে পরিষ্কার ও পিচ্ছিলমুক্ত রাখতে হবে যাতে রোগী পা পিছলে পড়ে না যায়।

৫। রাতে নিরাপদে টয়লেটে পৌঁছাতে একটি আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

৬। যদি রোগী তাদের বাথরুমের প্রয়োজনের কথা বলতে না পারে তা হলে কোনো সংকেত অথবা ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

৪.৩.৫ বেডপ্যান ইউরিনাল কি?

বেডপ্যান এবং ইউরিনাল হল এমন ডিভাইস যা মানুষকে মলত্যাগ করতে বা বিছানায় থাকা অবস্থায় প্রস্রাব করতে দেওয়া হয়। সাধারণত ব্যক্তি মলত্যাগের জন্য একটি বেডপ্যান ব্যবহার করেন কিন্তু প্রস্রাব করার সময় একটি ইউরিনাল ব্যবহার করেন। মহিলারা সাধারণত মলত্যাগ এবং প্রস্রাবের জন্য বিছানার প্যান/ বেড প্যান ব্যবহার করে থাকেন।

চিত্র ৪.৯: বাচ্চা, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একটি সার্বজনীন পোর্টেবল ইউরিনাল

চিত্র ৪.১০: রোগীকে একটি বেডপ্যান প্রেসমেন্ট

৪.৩.৬ একজন ব্যক্তিকে বেডপ্যান ব্যবহার করতে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুতি

যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে:

১। বেসিনে উষ্ণ গরম পানি
২। ডিস্পজেবল গ্লাভস
৩। টয়লেট পেপার
৪। তোয়ালে
৫। পরিষ্কার কাপড় বা ভিজা ওয়াইপস

প্রস্তুতি:

১। বেডপ্যানের উপর গরম পানি ঢেলে এটি শুকিয়ে নিতে হবে। একটি ধাতব বেডপ্যান তাপ ধরে রাখে, তাই এটি ব্যক্তিকে দেওয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে, এটি খুব গরম নয়।
২। বেডপ্যানের উপরের প্রান্তে বেবি পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে, যাতে ব্যক্তির নীচে সহজে স্লাইড করা যায়।

৪.৩.৭ রোগীকে ডায়াপার বদলাতে সহযোগীতা করা

ডায়াপার হচ্ছে একটি শোষণকারী উপাদান যা দু'টি পায়ের মধ্যে টেনে কোমরের চারপাশে বেঁধে দেওয়া হয়। ডায়াপার শব্দটি সাধারণত শিশুদের জন্য প্রযোজ্য যারা এখনও টয়লেট প্রশিক্ষণ পায়নি। তবে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ডায়াপার তৈরি করা হচ্ছে বেশ কিছু টয়লেটিং সমস্যা সমাধানের জন্য। যেটিকে মেডিকেলের ভাষায় ডায়াপারের পরিবর্তে এডাল্ট ন্যাপি বলা হয়। বয়স্কদের ডায়াপার বা এডাল্ট ন্যাপি সাধারণত শিশুদের সাইজের চেয়ে বড় আকারে তৈরি হয়। বয়স্কদের বিভিন্ন সমস্যার জন্য ডায়াপার ব্যবহার করা হয়। যেমন: ইনকন্টিনেন্স, চলাচলে অক্ষম ব্যক্তি,ভারী ডায়েরিয়া আক্রান্ত, ডিমেনশিয়া ইত্যাদি।

৪.৩.৮ প্রাপ্ত বয়স্কদের ডায়াপারের প্রকারভেদ

সমস্যাভেদে বয়স্কদের ডায়াপারের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন:

১। লাইট ব্লাডার লিকেজ প্যাডস (Light Bladder Leakage Pads)

২। এ্যাডাল্ট ব্রিফস (Adult Briefs)

৩। এ্যাডাল্ট পুল-আপস/ প্রটেক্টিভ আন্ডার ওয়্যার (Adult Pull-ups/ Protective Underwear)

৪। ডিস্পোজেবল এ্যাডাল্ট ডায়াপারস (Disposable Adult Diapers)

৫। রিইউজেবল এ্যাডাল্ট ডায়াপারস (Reusable Adult Diapers)

৬। সুইম ডায়াপারস (Swim Diapers)

৭। ইনকন্টিন্যান্স ডায়াপারস ফর মেন (Incontinence Daipers for Men)

৮। ফিকাল ইনকন্টিন্যান্স ডায়াপারস (Fecal Incontinence Daipers)

ক) লাইট ব্লাডার লিকেজ প্যাডস

খ) এ্যাডাল্ট ব্রিফস

গ) এ্যাডাল্ট পুল-আপস

ঘ) ডিস্পোজেবল এ্যাডাল্ট ডায়াপারস

ঙ) রিইউজেবল এ্যাডাল্ট ডায়াপারস

চ) ইনকন্টিন্যান্স ডায়াপারস

চিত্র ৪.১১: বিভিন্ন প্রকার এ্যাডাল্ট ডায়াপারের চিত্র

৪.৩.৯ বাচ্চাদের ডায়াপারের প্রকারভেদ

শিশুদের উপযোগী তিন প্রকারের ডায়াপার রয়েছে। পরিবেশ অনুযায়ি এই ডায়াপারগুলো নির্বাচন করা হয়ে থাকে। সেগুলো হলো:

১। ডিসপোজেবল ডায়াপারস, ২। কাপড়ের ডায়াপার এবং ৩। ক্লাশেবল ডায়াপার।

ক) ডিসপোজেবল ডায়াপার

খ) কাপড়ের ডায়াপার

গ) ক্লাশেবল ডায়াপার।

চিত্র ৪.১২: বাচ্চাদের বিভিন্ন প্রকারের ডায়াপার

৪.৩.১০ বাচ্চাকে ডায়াপার পড়ানো এবং তাকে পরিচ্ছন্ন রাখা

বাচ্চাদের ডায়াপার পরানো খুবই সচরাচর আর সাধারণ একটি ব্যাপার। এটি কর্মজীবী মায়ের সময় যেমন বাচায় তেমনই বাড়িঘর বা কাপড় নোংরা করা থেকেও মুক্তি দেয়। কিন্তু প্রায়ই বাচ্চাদের যে সমস্যাটা দেখা দেয় সেটা হচ্ছে ডায়াপার র‍্যাশ। এই র‍্যাশ বাচ্চার জন্য অস্বস্তিকর ও কষ্টদায়ক। প্রথমদিকে ডায়াপার পরানো বা পরিবর্তন করা একটু কঠিন লাগতে পারে কিন্তু ধীরে ধীরে একেবারে সহজ হয়ে যায়। ডায়াপার পরাতে কিছু বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হয়। অথবা বাচ্চাদের যারা দেখা শোনা করে তাদের এই ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ভালো মানের ডায়াপার পছন্দ করা। সস্তা এবং নিম্ন মানের ডায়াপার বাচ্চার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। ডায়াপার বেছে নেবার সময় তার শোষণক্ষমতা, আরামদায়ক কিনা, এবং লিকপ্রুফ কিনা তা দেখে নিতে হয়।

র‍্যাশ

৪.৩.১১ ডায়াপার পড়ানোর সময় করণীয়

১। ডায়াপার বেশি আঁটসাঁট করে পড়ানো যাবে না, তাহলে শিশুরা খুব অস্বস্তিতে থাকবে।

২। ৬ ঘন্টার মধ্যেই পরিবর্তন করে দিতে হবে (যদি পায়খানা করে তাহলে সাথে সাথেই পরিবর্তন করতে হবে)।

৩। বাচ্চার মল যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার করতে হবে।

৪। ডায়াপার পরিবর্তন করার সময় যদি কোন র‍্যাশ দেখা যায় তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে এন্টিসেপ্টিক বা ডায়াপার ক্রিম ব্যবহার করতে হবে এবং কিছু সময় ডায়াপার না পড়িয়ে রাখতে হবে।

৪.৩.১২ শিশুকে পরিচ্ছন্ন করার উপায়

১। ডায়াপার বদলানোর সময় শিশুকে খুব যত্ন করে পরিষ্কার করতে হবে। এর জন্য ভেজা কাপড়, তুলার তৈরীর বল অথবা বেবি ওয়াইপস ব্যবহার করা যেতে পারে যা দিয়ে শিশুর নিম্নদেশ পরিষ্কার করা যায়।

২। শিশুকে সবসময় সামনে থেকে পেছনদিকে মোছাতে হয় (কখনই পেছন থেকে সামনের দিকে মোছানো যাবে না বিশেষ করে কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে, অন্যথায় ব্যকটেরিয়া সংক্রমন হতে পারে যা ইউরিনারি ইনফেকশন ঘটাতে পারে)

৩। শিশুর পায়ের গোড়ালি ধরে উপরে দিকটি ভালো করে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৪। তার হাটু এবং নিতম্বের ভাঁজ গুলোও পরিষ্কার করতে হবে।

৫। শিশুকে মোছানো শেষ হলে তার শরীর পরিষ্কার কাপড় দিয়ে শুকিয়ে ডায়াপার অয়েন্টমেন্ট অথবা ময়েশ্চারাইজিং বেবি লোশন ব্যবহার করতে হবে।

৪.৩.১৩ ডায়াপার পড়ানোর সময় অবশ্যই করণীয়

১। ময়লা ডায়পার শুধু দুর্গন্ধযুক্তই নয় বরক অনেক ধরনের জীবাণুরও সংক্রমণ ঘটাতে পারে। তাই ময়লা ডায়পার নিয়মিত ফেলে দিতে হবে অন্তত দিনে একবার।

২। শক্ত ডায়াপার পড়ালে অনেক সময় শিশুর পায়ের ও কোমরের আশেপাশে দাগ হয়ে যেতে পারে তাই ঢিলেঢালা ডায়পার পড়ালে শিশুরা আরাম পায়।

৩। শিশুর ডায়াপার পরানোর জায়গায় পায়ে ও কোমরে যদি ফুসকুড়ি দেখা যায় তাহলে কিছুদিন ডায়াপার ব্যবহার করা বন্ধ রাখতে হবে।

৪। শিশুর নাভির নাড়ীটি যদি এখনও পরে না গিয়ে থাকে তাহলে সেই স্থানটি শুকনো রাখতে ডায়াপারের কোমরের কাছের অংশটি ভাঁজ করে নিতে হবে।

চিত্র ৪.১৩: মা তার শিশুকে ডায়াপার পরিয়ে দিচ্ছেন

৫। ছেলে শিশুকে ডায়াপার পরানোর সময় ডায়াপারটি আটকাবার আগে শিশুর লিঙ্গটি নিচের দিক করে বসাতে হবে। এটি তরলজাতীয় কিছু পড়িয়ে কোমরের উপরিভাগের দিকে আসতে বাধা দেবে।

৬। জীবাণু যাতে ছড়াতে না পারে সেজন্য শিশুর ডায়পার বদলাবার পর ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

চিত্র ৪.১৪: শিশুদের ডায়াপার বদলানোর ধারাবাহিক চিত্র

৪.৪ রোগীকে সাজসজ্জা ও পোষাক পরিধান (গ্রুমিং ও ড্রেসিং) করতে সহযোগীতা করা।

একজন অসুস্থ্য বৃদ্ধ রোগী তার দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজই নিজ থেকে করতে পারেন না যেমন, নখ কাটা, সেভ করা, জুতা পড়া, চুল আচরানো ইত্যাদি। নিজ থেকে পোষাক পরিধান ও সঠিক ড্রেস চয়নেও তারা অনেক সমস্যায় পড়ে থাকেন। তখন এসব কাজগুলো সঠিকভাবে করার জন্য নিবিড় সহযোগীতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই অধ্যায়ে আমরা এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

৪.৪.১ পোশাক নির্বাচন

১। পছন্দ সহজীকরণ করতে হবে। আলমারী অতিরিক্ত পোশাক মুক্ত রাখতে হবে কারণ অতিরিক্ত পোশাক থেকে পছন্দ করার সময় ব্যক্তি অনেকসময় উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত হতে পারে।

২। আরামদায়ক (সুতি বা লিনেন) এবং সাধারণ পোশাক চয়ন করতে হবে। পুলওভার টপসের চেয়ে সামনে থাকা বোতামসহ কার্ডিগানস, শার্ট এবং ব্লাউজ পরানো সহজ। বোতাম, র‍্যাপ বা জিপার্সের জন্য ভেলক্রো বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩। নিশ্চিত করতে হবে, যে পোশাকগুলো ঢিলা-ঢালা ও আরামদায়ক, বিশেষত কোমর ও পশ্চাৎদেশে। কোমল এবং প্রসারিত হয় এমন কাপড়গুলো চয়ন করতে হবে।

৪। আরামদায়ক জুতা চয়ন করতে হবে । নিশ্চিত করতে হবে যে, ব্যক্তির ঐ জুতা পড়ে যেন পিছলে না যায়। বাহিরে যাওয়ার জন্য লোফার বা ভেলক্রোসহ জুতা চয়ন করা নিরাপদ।

৫। নমনীয় হয়ে বুঝতে হবে, যদি ব্যক্তি একই পোশাক বারবার পরতে চান, তবে অনুরূপ পোশাক কয়েকটি কিনে চিহ্নিত করে রাখতে হবে যেন পরিষ্কার করার সময় বিভ্রান্ত হতে না হয়।

চিত্র ৪.১৫: পোষাক নির্বাচনের একটি ছবি

৪.৪.২ পোশাক পরিধান করিয়ে দিতে করণীয়

১। প্রতিটি পোশাকের ধরন অনুযায়ী আলাদা করতে হবে। যেমন অন্তর্বাস প্রথমে, পরে প্যান্ট, পরে একটি শার্ট এবং তারপরে একটি সোয়েটার।

২।যদি সম্ভব হয়, তবে ব্যক্তিকে পছন্দসই পোশাক বা রঙ নির্বাচন করার সুযোগ দিতে হবে, তবে ব্যাপারটি সহজতর করার জন্য দুটি বিকল্প পছন্দ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৩। সরল ও সরাসরি নির্দেশনা দিতে হবে। সম্ভব হলে নিজে নিজের পোশাক পরতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একটি একটি করে পোশাক এগিয়ে দিয়ে তার নির্দেশনা স্পষ্ট করে বলতে হবে।

৪। আবহাওয়া অনুযায়ী যথাযথ পোশাক পরিধানে ব্যক্তিকে উৎসাহিত করতে হবে।

৫। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।

পরিধানরত পোশাক অপসারণের কৌশল

১। রোগীর যদি বাহু বা কাঁধে আঘাতপ্রাপ্ত হন, তবে আঘাতহীন দিক থেকে জামা খুলতে শুরু করতে হবে।

২। জামা খুলতে, বোতম/জিপার/ভেলক্রো খুলে জামাটি পিছন দিকে নীচে থেকে উপরের দিকে নিয়ে আসতে হবে। কাঁধটি সামান্য উঁচু করে ধরে হাতা খুলে ফেলতে হবে। অপর পাশের হাতা তারপর এক টান দিয়ে খোলা যাবে।

৩। প্যান্ট খুলার জন্য, কোমরের কাছে আলগা করে বোতাম বা চেইন থাকলে খুলে ফেলতে হবে। প্যান্টটি কোমরের অংশটি ধরে নীচের দিকে টেনে খুলে দিতে হবে।

পোশাক পরানোর কৌশল

১। রোগী যদি বাহু বা কাঁধে আঘাতপ্রাপ্ত হন, তবে আঘাতপ্রাপ্ত দিক থেকে জামা পরাতে শুরু করতে হবে। সেবাদানকারীর হাতটি জামার হাতার মধ্য দিয়ে নিয়ে তার হাতটি ধরে ভেতরে ঢুকাতে সাহায্য করতে হবে।অপর হাতটি ধরে সহজেই পরিয়ে দেওয়া যাবে।

২। প্যান্ট পরানোর জন্য, সেবাদানকারীর হাতটি প্যান্টের পায়ের অংশের ভেতর দিয়ে কোমর পর্যন্ত নিয়ে রোগীর পা ধরে ভেতর দিকে নিয়ে আস্তে হবে। তার প্যান্টটি কোমর পর্যন্ত টেনে তুলে বোতাম/জিপার/ভেলক্রো/ ফিতা লাগিয়ে দিতে হবে।

৪.৪.৩ প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা (গ্রুমিং)-এর প্রথমিক পরিকল্পনা

শারীরিক বা মানসিক ভাবে অসুস্থ বা বয়সজনিত কারণে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ হারানো কোনো ব্যক্তির চুল কীভাবে আঁচড়াতে হয়, নখ কাটতে হয় বা শেভ করতে হয় তা ভুলে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে কিছু প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। যেমন:

১। সাজসজ্জার রুটিনগুলো গ্রাহকের পরিবারের সাথে কথা বলে বা সম্ভব হলে গ্রাহকের সাথে কথা বলে জেনে নিতে হবে।

২। পরিবারের সাথে কথা বলে বা সম্ভব হলে গ্রাহকের সাথে কথা বলে তার প্রিয় প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যাপারেও জেনে নিতে হবে এবং সেগুলোই ব্যবহার করতে হবে।

৩। ব্যক্তির পাশাপাশি সেবাদানকারী তার নিজের সাজসজ্জার কাজগুলো সম্পাদন করে নিতে পারে। যেমন- নিজের চুল আঁচড়ানো।

৪। বিপদমুক্ত ও সহজতর সাজসজ্জার সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। যেমন- বৈদ্যুতিক শেভার, রেজারের চেয়ে কম ঝুঁকিযুক্ত হতে পারে।

৪.৪.৪ মুখমন্ডলের যত্ন

মুখমন্ডল ধৌতকরণ

১। একটি অ্যালকোহলমুক্ত মৃদু ক্লিনজার/ফেসওয়াশ ব্যবহার করতে হবে।

২। মুখমন্ডল হালকা গরম পানিতে ভিজিয়ে ক্লিনজার/ফেসওয়াশ প্রয়োগ করতে আঙ্গুল ব্যবহার করতে হবে।

৩। ক্লিনজার/ফেসওয়াশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অবলম্বন করতে হবে:

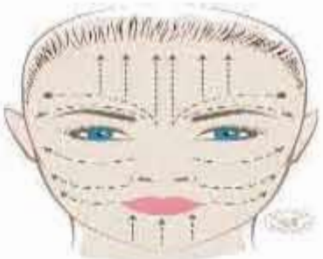

চিত্র ৪.১৬: ক্লিনজার/ফেসওয়াশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুখমন্ডল ম্যাসাজের দিক নির্দেশনা

ক। ত্বক স্ক্রাব করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ স্ক্রাবিং ত্বককে অতিরিক্ত শুষ্ক করে।

খ। হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে স্পঞ্জ করে মুছে একটি নরম তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে শুকনো করে মুছে ফেলতে হবে।

গ। ত্বক শুষ্ক বা ত্বকে চুলকানি হলে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে দিতে হবে।

ঘ।দিনে দুইবার (সকালে একবার এবং রাতে একবার) এবং অতিরিক্ত ঘামের পরে মুখমন্ডল ধৌতকরণ সীমাবদ্ধ করতে হবে। বিশেষত যখন টুপি বা হেলমেট পরার ফলে ত্বক জ্বালা করে। অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্বক ধুয়ে দিতে হবে।

৪.৪.৫ পুরুষদের ক্ষেত্রে মুখমন্ডলে শেভিং

প্রস্তুতি:

১। রোগী বাসায় শেভিং করতে ইচ্ছুক না হলে, সেলুনে করতে ইচ্ছুক কিনা তা জেনে নিতে হবে।

২। প্রথমে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে আলো আছে যাতে দু'জনকেই ভালোভাবে দেখতে পারা যায়। ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুসারে চেয়ারে বসতে বা বিছানায় বসতে সাহায্য করত হবে। তবে রোগী যদি শয্যাশায়ী হন, তবে শুয়ে থাকা অবস্থায় শেভিং করতে হবে।

৩। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে। যেমন- একটি আয়না, একটি রেজার বা বৈদ্যুতিক শেভার, শেভিং ক্রিম, একটি পরিষ্কার তোয়ালে এবং গরম পানির একটি পাত্র।

শেভিং প্রক্রিয়া:

১। শুরু করার আগে, ব্যক্তির চিবুকের নীচে একটি তোয়ালে রেখে পানির ফোঁটাগুলো আটকাতে হবে। দাঁড়ি নরম করতে হালকা গরম পানিতে তোয়ালে বা স্পঞ্জ ভিজিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে।

২। শেভিং ক্রিম প্রয়োগ করতে হবে।

৩। একটি ভালো রেজার ব্যবহার করতে হবে, যেন রেজার দ্বারা কেটে যাওয়ার পুরুতর ঝুঁকি এড়ানো যায়।

৪। দাঁড়ির বৃদ্ধি যেদিকে সেদিক বরাবর শেভ করতে হবে।

৫। প্রবীণদের ত্বক পাতলা এবং খুব সংবেদনশীল। তাই সংক্ষিপ্ত এবং ধীর গতির স্ট্রোক ব্যবহার করতে হবে। সর্বদা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, "আপনার কেমন লাগছে?" বা "আপনার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?" ।

৬। অ্যাডামস্ আপেল, মুখ, নাক এবং চিবুকের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

৭। ২-৩ টি স্ট্রোকের পরে প্রতিবার রেজারের ফলকটি ধুয়ে ফেলতে হবে।

৮। অবশিষ্ট শেভিং ক্রিম সরানোর জন্য একটি উষ্ণ ভেজা কাপড় ব্যবহার করতে হবে। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ত্বক শুকিয়ে নিতে হবে।

৯। যদি তিনি আফটার শেভ লোশন ব্যবহারে অভ্যস্ত হন, তবে প্রাকৃতিক আফটার শেভ লোশন ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।

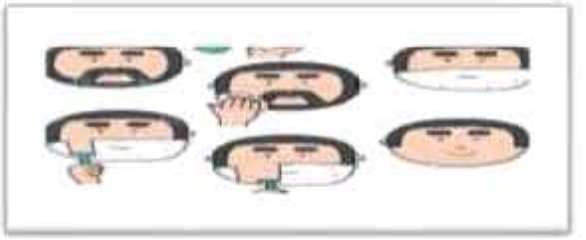

চিত্র ৪.১৭: একটি শেভিং পদ্ধতি

৪.৪.৬ চুলের যত্ন

১। রোগী চুল বাসায় কাটাতে ইচ্ছুক না সেলুনে, তা জেনে নিতে হবে। বাসায় কাটাতে ইচ্ছুক হলে চুল কাটে এমন ব্যক্তিকে বাসায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। চুল ছোট এবং একটি সহজ স্টাইলে রাখতে হবে। গ্রাহকের ব্যক্তিগত পছন্দের সম্মান দিতে হবে।

৩। বাথটাব বা ঝরণায় খুব অসুবিধা হলে, রান্নাঘরের সিঙ্কে বা বাথরুমের বেসিনে চুল ধুয়ে দিতে হবে।

৪। চুল ধোয়া অসম্ভব হলে ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়, এমন একটি শুকনো শ্যাম্পু ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫। যদি ব্যক্তি শয্যাশায়ী হন, তবে চুল অবশ্যই বিছানায় ধুতে হবে। একটি বড় প্লাস্টিকের শিট বালিশের উপর রেখে ব্যক্তিকে শুইয়ে ব্যক্তির ঘাড়ের নিচে একটি তোয়ালে ভাঁজ করে স্থাপন করতে হবে। প্লাস্টিকের শিটের অপর প্রান্ত একটি বালতিতে রাখতে হবে।

৬। ব্যক্তির ব্যক্তিগত চিরুনি ব্যবহার করতে হবে। চিরুনি নিয়মিত ছোট ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।ধারালো দাঁতযুক্ত চিরুনি ত্বকে আঘাত করতে পারে। একটি হালকা স্পর্শের চিরুনি ব্যবহার করে ব্যক্তিকে নিজেরচুল নিজে আঁচড়াতে উৎসাহিত করতে হবে।

৪.৪.৭ চোখের যত্ন

১। পরিষ্কার হালকা গরম পানিতে পাতলা ছোট রুমাল ভিজিয়ে চোখের পরিধি (চোখের চারপাশের বৃত্তাকার অঞ্চল) ভালোভাবে মুছে দিতে হবে।

২। জ্বালাপোড়া এড়ানোর উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে সাবান ব্যবহার না করাই ভালো। চোখের ভিতরের কোণা থেকে বাইরের কোণার দিকে হাতের রুমালটি পরিচালিত করতে হবে।

৩। পরিষ্কার করার সময় প্রতিটি চোখের ক্ষেত্রে রুমালের ভিন্ন অংশ ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি সংক্রমণের বিস্তার রোধ করতে সহায়তা করে।

৪। চোখের মার্জিনের সাঁতসেঁতে ময়লা আলগা করতে তুলার বল ব্যবহার করতে হবে।

৫। চোখের বলের উপরে কখনও সরাসরি চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। চোখ থেকে ময়লা সাবধানে অপসারণ করা উচিত এবং যতবার প্রয়োজন চোখ পরিষ্কার করা উচিত।

৬। অনেক রোগী চশমা পরেন। চশমাগুলো বিছানার পাশে ড্রয়ারে রাখা উচিত। ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই চশমা কোথায় রেখেছেন ভুলে যান, তাই সর্বদা তাদের চশমা একই জায়গায় রাখতে হবে।

৭। চশমা পরিষ্কার করার সময় যত্নবান হতে হবে যেন চশমা ভেঙ্গে না যায়। উষ্ণ পানি এবং একটি নরম শুকনো কাপড় দিয়ে চশমা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

চিত্র ৪.১৮: চোখের ভিতরের কোণা থেকে বাইরের কোণার দিকে হাতের রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করানো

৪.৪.৮ কানের যত্ন

১। কানের মধ্যে পরিষ্কার করার জন্য একটি রুমালের পরিষ্কার কোণ ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে ঘুড়াতে হবে। এছাড়াও, কান পরিষ্কার করার জন্য একটি কটন-বাটও দরকারী।

২। যদি রোগী শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন, তা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। ব্যাটারির যত্ন এবং সঠিক সন্নিবেশ কৌশল এই যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

৩। শ্রবণশক্তি হ্রাস হল বয়স্কদের একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা। পরিবেশে সঠিকভাবে যোগাযোগ এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে রোগী সক্ষম কিনা সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪.৪.৯ পায়ের যত্ন

নখ কাটায় সহায়তা করার জন্য নিয়মিত রুটিন ঠিক করতে হবে। নখের ধার কমানোর জন্য নেইল ফাইলার ব্যবহার করতে হবে। কোথাও কোনো ফোলা দাগ বা ডিসকোলেশন আছে কিনা তা খেয়াল করতে হবে।

৪.৫ -রোগীকে গোসল করাতে সহযোগীতা করা

বয়স্ক কিংবা বাচ্চারা নিজে নিজে গোসল করতে পারেনা। নিয়মিত গোসলের অভাবে রোগীর ত্বকে বিভিন্ন রকমের চর্মরোগ দেখা দেয়। শরীরে দুর্গন্ধের তৈরি হয়। মেজাজ খিটখিটে লাগে। এমনকি খাবারেও অরুচির তৈরি হয়। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। যার ফলে ক্লান্তি ও অবসাদ বেড়ে বসে। তাই রোগীকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গোসল করানো একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিচে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

৪.৫.১ বয়স ও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রাহকের গোসলের পদ্ধতি

ব্যক্তির কতটা সহায়তা ও তদারকি প্রয়োজন, তার গোসলের রুটিন, তার জন্য পছন্দনীয় বা উপযুক্ত গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে, ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে এবং তার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যের ফাইল দেখে জেনে নিয়ে কাজ করতে হবে ।

৪.৫.২ শাওয়ার বাথ/টাব বাথ (সম্পূর্ণ গোসল)

গোসলের পূর্ব প্রস্তুতি:

১। পুরুষ রোগীকে পুরুষ কেয়ারগিভারদের দ্বারা গোসল করিয়ে দেওয়া উচিত।

২। মহিলা রোগীকে মহিলা কেয়ারগিভারদের দ্বারা গোসল করিয়ে দেওয়া উচিত।

৩। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।

৪। দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলতে, স্থান বদলানোর সময় একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হতে পারে।
৫। যদি প্রয়োজন হয়, তবে টাবের পাশেই একটি চেয়ারে রেখে টাবের ভিতরে যাওয়া ও টাব থেকে উঠে আসার জন্য সহায়তা করতে হবে।
৬। শাওয়ারে গোসলের ক্ষেত্রে, একটি শাওয়ার চেয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।
৭। ব্যক্তি হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী হলে, ব্যক্তিকে টাবে বা শাওয়ার চেয়ারে নেয়ার পর হুইলচেয়ারটি সরিয়ে ফেলতে হবে।
৮। ঘরটি উষ্ণ এবং আবর্জনামুক্ত হওয়া উচিত।
৯। প্রয়োজনে ব্যবহারের আগে টাব পরিষ্কার করে নিতে হবে।
১০। পানি দিয়ে টাব অর্ধেক ভরাট করে নিতে হবে।
১১। ব্যক্তিকে টাব বা ঝরণাতে দেওয়ার আগে পানির তাপমাত্রা কনুই দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে। পানির তাপমাত্রা খুব বেশি হলে পুড়ে যেতে পারে।
১২। কম ফেনা হয় বা সহজে ধুয়ে যায় এমন সাবান নির্বাচন করতে হবে। মেডিকেটেড সাবান হলে উত্তম।
১৩। ব্যক্তির আগে গোসলের জায়গায় সমস্ত সরঞ্জাম আছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে।

প্রক্রিয়া:

১। যতটা সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রেখে, প্রয়োজন মতো পোশাক অপসারণ করতে ব্যক্তিটিকে সহায়তা করে সাথে সাথেই ত্বক পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং ত্বকের কোনো সমস্যা লক্ষ্য করলে তা ফাইলে রেকর্ড করতে হবে।
২। হাত ধুয়ে শুকিয়ে গ্লাভস পরতে হবে।
৩। পানির তাপমাত্রা পরীক্ষা করার পরে ব্যক্তিকে টাবে বা শাওয়ারেও যেতে সহায়তা করতে হবে।
৪। যদি সম্পূর্ণ সহায়তার প্রয়োজন হয়, তবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে:

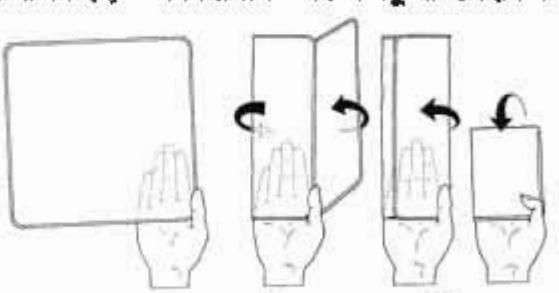

চিত্র ৪.১৬: হাতের চারপাশে একটি ওয়াশ ক্লথ পেঁচিয়ে নেয়ার পদ্ধতি

১। হাতের চারপাশে একটি ওয়াশ ক্লথ পেঁচিয়ে নাও অথবা নরম স্ক্রাব স্পোঞ্জ বা স্পঞ্জ হাতে নিতে হবে।
২। চোখের অঞ্চল থেকে পরিষ্কার করা শুরু করে ওয়াশ ক্লথ বা নরম স্ক্রাব স্পোঞ্জ বা স্পঞ্জে সাবান লাগিয়ে নিতে হবে।
৩। পূর্বের নির্দেশনা অনুযায়ী মুখমণ্ডল, চোখ, হাত, পা, বগল পরিষ্কার করতে হবে।
৪। গোপনাঙ্গ ধোয়া শেষ করতে হবে।
৫। ত্বকের দুটি পৃষ্ঠতল যেখানে মিলবে সেখানে ভালোভাবে পরিষ্কারের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে (যেমন- স্তনের নীচে, পায়ের আঙুলের মধ্যে, উরুর মাঝে) ।
৬। প্রয়োজনে চুলে শ্যাম্পু করে চুল ভালো করেও ধুয়ে ফেলতে হবে।
৭। টাব বা ঝরণা থেকে ব্যক্তিটিকে পিচ্ছিল রোধক পাপোষের উপরে আনতে সাহায্য করতে হবে।
৮। টাব বা শাওয়ারের পাশে রাখা চেয়ারে তাকে বসতে সহায়ত করতে হবে।

১০। চুলসহ সম্পূর্ণ শরীর শুকাতে সহায়তা করতে হবে।প্রয়োজনে হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।
২। পোশাক পরিচ্ছদের নিয়মাবলি অনুসরণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করতে হবে।
১২। ব্যক্তিকে তার কক্ষে নিয়ে সাথে যেতে হবে।

৪.৫.৩ বেডবাথ/স্পঞ্জবাথ (আংশিক গোসল)

গোসলের পূর্ব প্রস্তুতি:

১। কখনও কখনও সম্পূর্ণ বাথ একটি রোগীর জন্য খুব ক্লান্তিকর হয়। তাই, মুখ, হাত, বগল, যৌনাঙ্গ, পিঠ এবং নিতম্বকে অন্তর্ভুক্ত করে আংশিক গোসল বা বেডবাথ বা স্পঞ্জবাথ দেওয়া যেতে পারে।
২। গোসলের সময় রোগীর অবস্থান তার শারীরিক অবস্থা এবং তার চলাফেরার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।
৩। শরীরে কোনো ব্যান্ডেজ থাকলে, ঐ স্থানের ত্বক পরিষ্কারের জন্য ব্যান্ডেজ অপসারণ করা যাবে কিনা এবং সেগুলো পুনরায় লাগিয়ে দিতে হবে কিনা তা আগে থেকেই চিকিৎসার ফাইল থেকে জেনে নিতে হবে।
৪। দু'টি বড় বোলে গরম পানি ভরে নিতে হবে। একটি পরিষ্কার করে ধোয়ার জন্য এবং অন্যটি মুছার জন্য ব্যবহৃত হয়। পানির তাপমাত্রা ৯০-১০৫০ F হতে হয়। পানির তাপমাত্রা কনুই দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৫। ঘরটি উষ্ণ এবং আবর্জনামুক্ত হওয়া উচিত।
৬। কম ফেনা হয় বা সহজে ধুয়ে দেওয়া যায় এমন সাবান ও শ্যাম্পু নির্বাচন করতে হবে। মেডিকেটেড সাবানও শ্যাম্পু হলে উত্তমশ্যাম্পু করার সময় বিছানাটি ভিজে যাওয়ার হাত থেকে বাচাতে রোগীর মাথার নিচে একটি অতিরিক্ত গামছা রেখে দিতে হবে।
৭। ব্যক্তিকে আনার আগে গোসলের জায়গায় সমস্ত সরঞ্জাম আছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে।
৮। তিনটি পরিষ্কার তোয়ালে এবং দুইটি ওয়াশ ক্লথ প্রস্তুত রাখতে হবে।
৯। তোয়ালে, ওয়াশক্লথ, পানির বোল এবং সাবান কোনো পর্টেবল ট্রলিতে হাতের কাছে রাখা যেতে পারে।
১০। রোগীর পিঠের নীচে দুটি তোয়ালে রেখে বিছানা ভিজে যাওয়া রোধ করতে হবে এবং প্রক্রিয়া চলাকালীন রোগীকে আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে।
১১। রোগীকে একটি পরিষ্কার শিট বা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

চিত্র ৪.২০: যখন যেই অংশ পরিষ্কার করা হবে সেই অংশ শিটের নিচ থেকে বের করে নিতে হবে

১২। রোগীর পোশাক অপসারণ করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে এই ধাপটি কিন্তু রোগীর জন্য বিব্রতকর হতে পারে, তাই দ্রুত এবং উদ্দেশ্যমূলক মনোভাবের সাথে কাজ করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রক্রিয়া:

১। যতটা সম্ভব গোপনীয়তা বজায় রেখে প্রয়োজন মতো পোশাক অপসারণ করতে ব্যক্তিটিকে সহায়তা করতে হবে। সাথে ত্বক পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে এবং ত্বকের কোনো সমস্যা লক্ষ্য করলে তা ফাইলে রেকর্ড করতে হবে।

২। হাত ধুয়ে শুকিয়ে গ্লাভস পরতে হবে।

৩। সম্ভব হলে নিরাপদ উচ্চতায় বিছানা উঠিয়ে নিতে হবে। সম্ভব না হলে, মাথার নিচে বেশি বালিশ দিয়ে নিরাপদ উচ্চতায় রোগীকে উঠিয়ে নেয়া যেতে পারে।

৪। তোয়ালে এবং / অথবা ডিসপোজেবল প্যাড দিয়ে বিছানাপত্র সংরক্ষণ করতে হবে। যেখানে কাজ করা হবে সেই জায়গার নীচে একটি তোয়ালে রাখতে হবে।

৫। গোসলের আগে রোগীকে বিছানায় ইউরিনাল সরবরাহ করে তাতে মূত্রত্যাগ করতে বলতে হবে।

৬। রোগীকে একটি পরিষ্কার শিট বা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। যে অংশটি পরিষ্কার করা হবে কেবল সেখানকার শিট বা তোয়ালে এবং পোশাক সরিয়ে ফেলতে হবে।

৭। বিছানায় গোসলের সময় বোলের পানি পরিবর্তন করার প্রয়োাজন হতে পারে। প্রতিবার যখন বোলের পানি পরিবর্তন করা হবে, তখন সর্বদা পানির তাপমাত্রা পুনরায় পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৮। হাতের চারপাশে একটি ওয়াশ ক্লথ পেঁচিয়ে নিয়ে অথবা নরম স্ক্রাব ফোম বা স্পঞ্জ হাতে নিয়ে নিতে হবে। প্রথমে চোখ থেকে শুরু করতে হবে। পরিষ্কার হালকা গরম পানিতে পাতলা ছোট রুমাল ভিজিয়ে চোখের পরিধি (চোখের চারপাশের বৃত্তাকার অঞ্চল) ভালোভাবে মুছে দিতে হবে। জ্বালাপোড়া এড়ানোর উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে সাবান ব্যবহার না করাই ভালো। চোখের ভিতরের কোণা থেকে বাইরের কোণার দিকে হাতের রুমালটি পরিচালিত করতে হবে।

৯। পুরো শরীরের জন্য একই পরিষ্কারকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। প্রথমে রোগীর ত্বকে সাবান বা সাবান পানি প্রয়োগ করতে হবে। ময়লা এবং ব্যাকটিরিয়া অপসারণ করতে ১ম ওয়াশ ক্লথ দিয়ে আলতো করে স্ক্রাব করে একটি পানির বোলে ওয়াশ ক্লথ রাখতে হবে। অপর পানির বোলে দ্বিতীয় ওয়াশক্লথ ভিজিয়ে ভালোমত চিপে নিয়ে শরীরের সাবান মুছে ফেলতে হবে। তোয়ালে দিয়ে ভেজা জায়গাগুলো শুকনো করে নিতে হবে। ওয়াশ ক্লথগুলো যদি বেশি ময়লা হয়ে যায় তবে পরিষ্কার করে বদলিয়ে নাওতে হবে।

১০। ধীরে ধীরে সাবান পানি দিয়ে রোগীর মুখ, কান এবং ঘাড় ধুয়ে ফেলতে হবে। আলাদা ওয়াশ ক্লথ দিয়ে সাবান মুছে ফেলে তোয়ালে দিয়ে ভেজা জায়গাগুলো শুকনো করতে হবে।

২। রোগীর বাম হাত এবং কাঁধ ধুয়ে নিতে হবে- শরীরের বামদিকে শীটটি নীচে পশ্চাদ দেশ পর্যন্ত ভাঁজ করে উন্মুক্ত বাহর নীচে একটি তোয়ালে রাখতে হবে। রোগীর কাঁধ, বগল, বাহু এবং হাত ধুয়ে মুছে ফেলে তোয়ালে দিয়ে ভেজা জায়গা গুলো শুকনো করতে হবে। রোগীকে উষ্ণ রাখতে শীটটি নিয়ে পুনরায় ঢেকে দিতে হবে।

চিত্র ৪.২১: রোগীর বাম হাত এবং কাঁধ ধুয়ে নাও

১২। রোগীর ডানহাত এবং কাঁধ ধুয়ে নিতে হবে- শরীরের ডানদিকে শীটটি নীচের পশ্চাদেশ পর্যন্ত ভাঁজ করে উন্মুক্ত বাহুর নীচে একটি তোয়ালে রাখতে হবে। রোগীর কাঁধ, বগল, বাহু এবং হাত ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। তোয়ালে দিয়ে ভেজা জায়গাগুলো শুকনো করে রোগীকে উষ্ণ রাখতে শীটটি দিয়ে পুনরায় ঢেকে দিতে হবে।

১৩। রোগীর ধড় ধুয়ে ফেলতে হবে- শীটটি কোমরের নিচে ভাঁজ করে ধীরে ধীরে বুক, পেট এবং পাশগুলো ধুয়ে ফেলতে হবে। রোগীর ত্বকের যে কোনো ভাঁজগুলোর মধ্যে যেহেতু ব্যাকটিরিয়া আটকা পড়ে, তাই সেখানে সাবধানে ধুয়ে ফেলতে ভুলা যাবেনা। তোয়ালে দিয়ে ভেজা জায়গাগুলো শুকনো করতে হবে। রোগীকে উষ্ণ রাখতে শীটটি দিয়ে পুনরায় ঢেকে দিন।

১৪। রোগীর পা ধুয়ে ফেলতে হবে- রোগীর ডান পায়ের কোমর পর্যন্ত উন্মুক্ত করে পা ধুয়ে মুছে শুকিয়ে নিতে হবে। ডান পা শীটটি দিয়ে পুনরায় ঢেকে দিয়ে বাম পা উন্মুক্ত করে ধুয়ে মুছে শুকিয়ে নিতে হবে। বাম পা শীটটি দিয়ে পুনরায় ঢেকে দিতে হবে।

১৫। পিঠ ও নিতম্ব পরিষ্কার করতে হবে- পানির বোল গুলো খালি করে পরিষ্কার পানি দিয়ে পুনরায় ভরে নিতে হবে। সম্ভব হলে তাদেরকে এক পাশে ফিরিয়ে রোগীর পিঠ এবং নিতম্ব ধুয়ে দিতে হবে। রোগীর পুরো পোষ্টনের অংশটি উন্মুক্ত করতে শীটটি ভাঁজ করে রোগীর পিঠ, নিতম্ব এবং পা গুলো ধুয়ে মুছে শুকিয়ে ফেলতে হবে।

১৬। গোপনাঙ্গ ধুয়ে ফেলতে হবে।

১৭। রোগীর চুল ধুয়ে-মুছে শুকিয়ে ফেলতে হবে।

১৮। কাজ শেষ হয়ে গেলে, রোগীকে পরিষ্কার কাপড় পরাতে হবে। প্রবীণদের ত্বক শুকিয়ে যাওয়ার ঝোঁক থাকে, তাই কাপড় পরানোর আগে হাত এবং পায়ে লোশন লাগিয়ে দিতে হবে।

১৯। ব্যক্তির চুল আঁচড়িয়ে প্রসাধনী এবং শরীরে অন্যান্য ব্যবহার্য পণ্যগুলো রোগীর পছন্দ অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে।

৪.৫.৪ শ্যাম্পু করা

১। রোগীকে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে হবে।

২। হাত ধুয়ে শুকিয়ে গ্লাবস পরতে হবে।

৩।রোগীদের পছন্দনীয় পণ্যগুলো কি, তা জেনে নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে যে, রোগীর কোন পণ্যগুলোতে অ্যালার্জি নেই।

৪। রোগীকে সোজা করে শোয়াতে হবে। রোগীর মাথা এবং কাঁধের নীচে একটি পানিরোধক প্যাড বা তোয়ালে রেখে এই অঞ্চলটি শুকনো এবং উষ্ণ রাখার জন্য কাঁধ এবং বুকের আয়গার উপরে একটি তোয়ালে রাখতে হবে। রোগীর বাকী অংশটি কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৫। রোগীর চোখ, কান এবং মুখ ভিজে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। মগ ব্যবহার করে পরিষ্কার, উষ্ণ পানির মাধ্যমে চুলগুলো ভালোমত ভিজিয়ে নিতে হবে।

৬। হাতে শ্যাম্পু নিয়ে দুইহাতে ঘষতে হবে। রোগীর মাথার সামনের দিক থেকে চুলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শ্যাম্পু ম্যাসাজ করত হবে। আঙুলের মাথা দিয়ে বৃত্তাকার গতি ব্যবহার করে রোগীর মাথার ত্বকে শ্যাম্পু ম্যাসেজ করতে হবে। নখ দিয়ে ম্যাসাজ করলে মাথার ত্বক ক্ষত হতে পারে।

৭। পানি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত চুল ধুতে থাকতে হবে। রোগীর চোখের ও কানের সুরক্ষার জন্য রোগীর কপালে মাথার ত্বক সোজাসুজি ধুয়ে ফেলতে হবে।

৮। কন্ডিশনার ব্যবহার করা হলে, পূর্বের তিনটি পদক্ষেপ পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৯। শুকনো তোয়ালে ব্যবহার করে রোগীর মুখ, মাথা এবং ঘাড় থেকে পানি মুছতে হবে । প্রয়োজনে নিরাপদ দূরত্ব থেকে হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০। ব্রাশ ব্যবহার করে চুল আঁচড়ে দিতে হবে।

চিত্র ৪.২২: শ্যাম্পু করার পদ্ধতি

৪.৫.৫ গোপনাঙ্গের যত্ন

পুরুষদের গোপনাঙ্গের যত্ন

১। রোগীকে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে হবে।

২। শরীরের অন্যান্য অংশ যেই গ্লাবস দিয়ে পরিষ্কার করা হয় সেটা খুলে হাত ধুয়ে শুকিয়ে নতুন গ্লাবস পরতে হবে।

৩। রোগীদের পছন্দনীয় পণ্যগুলো কি তা জেনে নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে যে, রোগীর কোনো পণ্যগুলোতে অ্যালার্জি নেই।

৪। সুন্নতে খাৎনা না হয়ে থাকলে পুরুষাঙ্গের ফোরস্কিন আলতো করে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে হবে। সম্পূর্ণ অঙ্গ ধুয়ে নিতে হবে। প্রতিটি স্ট্রোকের জন্য ওয়াশক্লথের একটি পরিষ্কার অংশ ব্যবহার

করতে হবে। ফোরস্কিনটি আলতো করে আবার তার স্বাভাবিক অবস্থানে ঠেলে দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে ভুলে যাওয়া যাবে না।

মহিলাদের গোপনাঙ্গের যত্ন:

১। রোগীকে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে হবে।

২। শরীরের অন্যান্য অংশ যেই গ্লাবস দিয়ে পরিষ্কার করা হয় সেটা খুলে হাত ধুয়ে শুকিয়ে নতুন গ্লাবস পরতে হবে।

৩। রোগীদের পছন্দনীয় পণ্যগুলো কি তা জেনে নিয়ে নিশ্চিত করতে হবে যে, রোগীর কোন পণ্যগুলোতে অ্যালার্জি নেই।

৪। একক স্ট্রোক দিয়ে পেরিনিয়াম অঞ্চলটি সামনে থেকে পিছনে ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রতিটি স্ট্রোকের জন্য ওয়াশক্লথের একটি পরিষ্কার অংশ ব্যবহার করতে হবে। একপাশে ল্যাবিয়া মাজোরা মুছে তারপরে অন্য ল্যাবিয়া মাজোরা মুছতে হবে। ল্যাবিয়া আলাদা করে ছড়িয়ে দিয়ে প্রতিটি স্ট্রোকের জন্য ওয়াশক্লথের একটি পরিষ্কার অংশ ব্যবহার করতে হবে। একটি পরিষ্কার অংশ ব্যবহার করে প্রতিটি পাশের অংশ পিছনের দিকে মুছতে হবে। যোনিটির প্রারম্ভ পর্যন্ত মধ্য থেকে নীচপর্যন্ত মুছতে হবে। যোনি এবং মলদ্বারের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি পরিষ্কার করে সামনে থেকে পিছনে ধৌত করতে হবে।

৪.৬ রোগীকে সাধারণ গৃহস্থালীর কাজকর্মে সহায়তা করা।

একটি বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হচ্ছে সাধারণ গৃহস্থালির কাজের অংশ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাড়িকে সংক্রমণ এবং কীটপতঙ্গ মুক্ত রাখে এবং রোগীকে শারীরিক, মানসিক প্রশান্তিতে রাখতে সাহায্য করে। এই চ্যাপ্টারে আমরা রোগীর বাড়িতে কিভাবে সাধারণ গৃহস্থালির কাজ-কর্মে সহযোগীতা করতে পারা সেই ব্যাপারে আলোচনা করবো।

৪.৬.১ একজন পরিচর্যাকারী গৃহস্থালির কি কি করেন?

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিচর্যাকারী, গৃহকর্মী, এবং বেবিসিটারদের প্রায় একই রকম কাজ রয়েছে। তাদের সাধারণ কাজগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো সহযোগীতাগুলো অন্তর্ভুক্ত:

১। রান্নাঘরের কাজ, ২। খাবার কেনাকাটা, ৩। খাবার রান্না করা ৪, খাবার পরিবেশন করা ৫। ঘর পরিষ্কার করা, ৬। থালা-বাসন ধোয়া। ৭। কাপর চোপড় লন্ড্রি করা। ৮। শিশু যত্ন, যার মধ্যে ডায়াপার পরিবর্তন, স্নান এবং তত্ত্বাবধান করা। ৯। প্রবীণদের যত্ন, যার মধ্যে স্নান, সাহচর্য এবং ডাক্তারের সাথে দেখা করার মত কাজ।

৪.৭ খাওয়ানোর জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ও অবস্থান

সাধারণ পদ্ধতি

যদি গ্রাহক নড়াচড়া করতে পারে এবং গুরুতর অসুস্থ না হয়, তাহলে-

১। নিশ্চিত করতে হবে যে, অচলাবস্থায় গ্রাহক যেন মাথা, পিঠ ও ঘাড় সোজা করেও বসতে পারে। দরকার হলে পিছনে বালিশ দিয়ে পিছনের দিকে হেলান দিয়ে বসতে সাহায্য করতে হবে।

২। মাথা সামনের দিকে নিয়ে চিবুক সামান্য নিচু করতে বলতে হবে।

৩। প্যারালাইসিস ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে খাবার গলধঃকরণ করতে অসুবিধা হতে পারে। কারো কারো একপাশ বা উভয় পার্শ্বই দুর্বল হতে পারে। যেপাশ বেশি দুর্বল সেই পাশে সাপোর্ট দিতে হবে।

৪। খাওয়ানোর সময় ব্যক্তির চোখের লেভেল বরাবর বা তার নীচে বসিয়ে নিতে হবে।

৫। খাওয়ানোর সময় ব্যক্তিকে ফিডিং গাউন পরিয়ে নিতে হবে।

৬। ব্যক্তির মুখে স্নায়ুজনিত কোনো দুর্বলতা থাকলে, অপেক্ষাকৃত সবল পাশে বসে খাওয়াতে হবে। ব্যক্তির মুখের অপেক্ষাকৃত সবল অংশে খাবার রাখতে হবে।

৭। ব্যক্তি নিজের হাতে খেতে পছন্দ করলে তার চোখের ভিজ্যুয়াল ফিল্ড সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। এমনভাবে তার সামনে খাবার রাখতে হবে যেন তিনি খাবারের স্থান বুঝতে পারেন।

৮। শয্যাশায়ী ব্যক্তিদের বিছানায় খাবার পরিবেশন করতে ট্রলি ব্যবহার করতে হবে।

চিত্রঃ ৪.২৩: রোগীকে খাওয়ানোর সাধারণ পদ্ধতি

ব্যক্তির ডিজফ্যাজিয়া বা খাবার গলধঃকরণে সমস্যা বা মুখে স্নায়ুজনিত কোনো দুর্বলতা থাকলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো খেয়াল করতে হবে:

১। কাশি / দমবন্ধ, ২। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, ৩। খাবারের জন্য দীর্ঘ সময় নেওয়া / ঘুমিয়ে পড়া, ৪। খাওয়া বা পান করার সময় অসুবিধা, ৫। খেতে অনীহা, ৬। খাবার মুখে আটকে যাওয়া, ৭। গালে খাবার চেপে রাখা ,৮। খাবার / পানীয় মুখ থেকে পড়া

৪.৮ নাজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং

১। গ্রাহককে পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করতে হবে।

২। একজন সহকারী পাশে রাখতে হবে।

৩। হাত ধুয়ে নিতে হবে।

৪। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরে সহকারীকে গ্লাভস পড়তে বলতে হবে।

৫। খাওয়ানোর সময় রোগীকে ফিডিং গাউন পরিয়ে নিতে হবে।

৬। খাওয়ানোর সময় রোগীকে ৩০ ডিগ্রী কোণে বসিয়ে নিতে হবে।

৭। হাতের কাছে পরিষ্কার ট্রলির উপরে খাওয়ানোর সরঞ্জামগুলো রাখতে হবে।

৮। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে প্রস্তাবিত খাদ্যের উপাদান, পরিমাণ ও সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে।

চিত্র ৪.২৪: ন্যাজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং পদ্ধতি

৪.৯ কাপড় ধৌত করা

পরনের বস্ত্র যদি শরীরের ঘাম বা সম্ভাব্য সংক্রামক উপকরণ দিয়ে নোংরা হয়, তবে এটিকে দূষিত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। ডিসপোজেবল গ্লাভস পরে ডিটারজেন্ট এবং ব্লিচ দ্রবণ পানিতে মিশিয়ে আইটেমগুলো ধুয়ে ফেলতে হবে।

৪.১০ থালা-বাসন ধৌতকরণ

১। গরম পানি এবং সাবান দিয়ে থালা বাসন ধুয়ে ফেলতে হবে।

২। চূড়ান্তভাবে কাপর ধোয়ার আগে পানিতে জীবাণুনাশক হিসেবে প্রয়োজনমত ক্লোরিন বিচ যোগ করে এই দ্রবণে থালা-বাসন, কাচের পাত্র এবং অন্যান্য পাত্রগুলো অন্তত এক মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে।

৩। থালা-বাসনগুলো আবার গরম পানিতে ধুয়ে ফেলে বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে।

৪.১০.১ রান্নাঘর পরিষ্কার করা

১। রান্নাঘর , রান্নাঘড়েরের সারফেস , কাউন্টার টপস, রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার পরিষ্কার করার পর স্যানিটাইজ করার জন্য ব্লিচিং দ্রবন ব্যবহার করতে হবে।

২। দীর্ঘ সময় অথবা বার বার স্যানিটাইজ সল্যুশন ব্যবহার করা লাগলে হাতে গ্লোভস পরে নিতে হবে।

৩। ব্লিচিং দ্রবন ব্যবহারের পূর্বে নির্দেশাবলি এবং সতর্কতাগুলো ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে।

৪.১১ রোগীকে হালকা ব্যায়াম করানো

বাড়িতে শারীরিক অনুশীলনের গুরত্ব

১। শারীরিক ও মানসিক প্রফুল্লতা লাভ করে।

২। পেশী শক্তি এবং হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে পরে যাওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়ক হতে পারে কারণ এটি ভারসাম্যও উন্নত করতে পারে। অস্টিওপরোসিস এবং ফ্র্যাকচারের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করে।

৩। নিয়মিত কার্ডিওভাসকুলার ব্যায়াম স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি হ্রাস করে।

৪। ডিমেনেশিয়া হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৫।রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৬। অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি রোধ করে।

প্রস্তুতি:

১। চিকিৎসক বা ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী অনুশীলনের ধরণ নির্বাচন করতে হবে।

২। ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা ও পছন্দ বিবেচনায় রাখৎ হবে।

৩। অনুশীলনের ধরণ ও পদ্ধতি ব্যক্তিকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে হবে।

৪। সম্ভব হলে ব্যায়ামের পোশাক পরতে উৎসাহিত করতে হবে।

৫। এই অনুশীলন করানোর জন্য ব্যয়বহুল সরঞ্জাম বা জিমে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

৬। প্রয়োজনে ফিজিওথেরাপিস্টের সাহায্য নিতে হবে।

৪.১১.১ কোর কি ?

কোর বলতে পেটের পেশী, পিছনের পেশী এবং নিতম্ব শ্রোণির পেশী নিয়ে গঠিত অংশকে বুঝায়। কোর দেহের স্ট্যাবিলাইজার হিসাবে কাজ করে, মেরুদন্ডকে সুরক্ষা দেয় এবং প্রায় প্রতিটি শারীরিক কাজের সময় কাজে লাগে।

৪.১১.২ বয়স্ক ও অসুস্থ রোগীদের জন্য সেরা কোর অনুশীলন :

১। সাইড বেন্ড

ক। একটি চেয়ারে গ্রাহককে বসিয়ে তার এক হাত মাথার পিছনে রাখতে হবে। অন্য হাত প্রসারিত করতে হবে।
খ। পাশের দিকে এমনভাবে ব্যক্তিকে ধরে বাকাতে হবে বা তিনি নিজে পারলে তাকে বাকতে নির্দেশনা দিতে হবে, যেন তিনি তার প্রসারিত হাত দিয়ে মেঝেটি স্পর্শ করার চেষ্টা করতে পারেন।

চিত্র ৪.২৫: সাইড বেন্ড

গ। তারপরে প্রারম্ভিক অবস্থানে ফিরে আসতে হবে।
ঘ। দুইপাশে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

২। পা উত্তোলন

১। মেঝেতে একটি কার্পেটে বা ইয়োগা ম্যাট বিছিয়ে ব্যক্তিকে শুয়ে পড়তে সাহায্য করতে হবে।

চিত্র ৪.২৬: পা উত্তোলন

২। মেঝে থেকে একটি পা পাঁচ ইঞ্চি উপরে উঠিয়ে প্রায় তিন সেকেন্ডের জন্য এই ভঙ্গি রাখতে হবে।
৩। অন্য পায়েও এটা পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৩। উড চপিং পোজ

উড চপিং পোজ নামকরণ করা হয়েছে কারণ অনুশীলনটি সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে দেখে মনে হয় যে তিনি কাঠ কাটছেন।

চিত্র ৪.২৭: উড চপিং পোজ পদ্ধতি

১। একটি চেয়ারে গ্রাহককে বসাতে হবে।

২। ব্যক্তি দুই হাত দিয়ে ধরে রাখতে পারবে এমন একটি কল বা হালকা বস্তু হাতে দিয়ে তাকে তার মাথার বাম দিকে দুই বাহু উপরে উঠাতে বলতে হবে।

৩। তির্যকভাবে ব্যক্তির শরীরে আড়াআড়িভাবে দুই বাহু একসাথে ডান দিকে নিচে নামাতে সাহায্য করতে হবে।

৪। প্রারম্ভিক অবস্থানে ফিরে গিয়ে বিপরীত পাশে প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৫। প্রতি পাশে প্রক্রিয়াটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করুন হবে।

৪.১১.৩ বয়স্ক ও অসুস্থ রোগীদের পায়ের অনুশীলন

১। গোড়ালি ঘুড়ানো:

১। ব্যক্তির পায়ের গোড়ালী চিত্রের ন্যায় ঘুড়াতে সাহায্য করতে হবে।

চিত্র ৪.২৮: গোড়ালি ঘুড়ানো

চিত্র ৪.২৯: হাঁটু এক্সটেনশন

২। হাঁটু এক্সটেনশন:

১। একটি চেয়ারে গ্রাহককে বসাতে হবে।

২। হাঁটু আস্তে আস্তে সামনের দিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করতে হবে।

৩। এতে ব্যক্তির কাফ মাসলেরও ভালো অনুশীলন হবে।

৩। হাঁটু ফ্লেক্সন ও নিতম্ব এক্সটেনশন:

১। সম্ভব হলে ব্যক্তিকে দাড় করিয়ে নিতে হবে।

২। কোমরে দুই হাত রাখতে বলতে হবে।

৩। পা সামনের দিকে নিয়ে হাঁটু বাকা করতে সাহায্য করতে হবে।

চিত্র ৪.৩০: হাঁটু ফ্লেক্সন

চিত্র ৪.৩১: উঠা-বসা

৪। উঠা-বসা:

১। একটি চেয়ারে গ্রাহককে বসাতে হবে।

২। সামনের দিকে কাঁধ ও হাত সোজা করে রাখতে বলতে হবে, যেন পিঠ সোজা থাকে।

৩। স্বাভাবিক নিয়মে বসা থেকে উঠতে ও দাড়ানো থেকে বসতে বলতে হবে।

৪। প্রক্রিয়াটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

৫। হিল স্লাইড:

১। একটি চেয়ারে গ্রাহককে বসাতে হবে।

২। শরীরের সামনে দিকে এক পা প্রসারিত করাতে হবে, যেন পায়ের আঙ্গুলগুলো সামনের দিকে নির্দেশিত থাকে।

৩। প্রসারিত পায়ের পাদদেশকে সমতল রাখতে হবে, মেঝের উপড়ে চাপ দিয়ে পা'টি ধীরে ধীরে শরীরের দিকে টেনে আনতে হবে যতক্ষণ না এটি আগের অবস্থানে পৌঁছায়।

৪। পা আগের অবস্থানে ফিরে গেলে অপর পায়ে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

৫। এভাবে প্রক্রিয়াটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

চিত্র ৪.৩২: হিল স্লাইড

৪.১৫.৪ -ইয়োগা/যোগ ব্যায়াম:

উপকারিতা:

১। হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

২। শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখে।

৩। বাত, ব্যথা এবং প্রদাহ হ্রাস করে।

৪। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৫। আইবিএসের মতো হজমজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৬। ঘুমের মান উন্নত করে।

৭। শোক শিতিল করার একটি উপায়।

৮। হতাশা এবং উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

প্রস্তুতি:

১। ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন করতে হবে যে, তিনি যোগ ব্যায়ামের জন্য উপযুক্ত কিনা। প্রয়োজনে চিকিৎসক ও যোগ ব্যায়ামের প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করতে হবে।

২। যোগব্যায়ামের জন্য আরামদায়ক, প্রসারিত পোশাক নির্বাচন করতে হবে।

৩। যোগব্যায়ামের জন্য আরামদায়ক ঢিলেঢালা পোশাক লাগবে।

৪। একজন যোগ্য প্রশিক্ষকের সন্ধান করতে হবে।

৫। অল্প অল্প করে শুরু করতে পরামর্শ দিতে হবে।

৬। প্রশিক্ষক ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা বুঝে যোগাসন নির্বাচন করতে হবে।

জব ১: রোগীকে ওরাল হাইজিন বজায় রাখতে সহযোগীতা করা

পারদর্শীতার মানদন্ড:

১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে নিতে হবে।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী মুখগহবরের যত্ন নেয়ার জন্য একটি জায়গা উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

৩। জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়্যাল বাছাই এবং সংগ্রহ করতে হবে।

৪। কাজে সহায়তা করার জণ্য রোগীকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

৫। ওরাল হাইজিং দেওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থানটি পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

৬। ব্যবহৃত জিনিসসমূহ নির্ধারিত বিনে/বর্জ্য পাত্রে ফেলে দিতে হবে।

৭। কাজ শেষে রেকর্ড শীটে নথিভুক্ত ক্রতে হবে।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট

একটি পরিষ্কার ট্রেতে যে জিনিসগুলো থাকবে:

১। ম্যাকিংটোস এবং টাওয়েল (Mackintosh and Towel), ২। টুথব্রাশ এবং পেস্ট (Toothbrush and paste), ৩। মাউথ ওয়াশ সলিউশন (Mouth wash solution), ৪। এক কাপ পানি (A cup of water), ৫। ফেইস টাওয়েল (Face Towel), ৬। স্পঞ্জ ক্লোথ (Sponge Cloth), ৭। টাং ডিপ্রেসর (Tongue

depressor), ৮। গজ পিছ (Gauze piece), ৯। কিডনি ট্রে (Kidney Tray), ১০। এক বোল পরিষ্কার পানি (A bowl of clean water)

কাজের ধারা:

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পরতে হবে।
২। নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।
৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে এবং প্রস্তুত করতে হবে।
৪। দুই হাতে ক্লিন গ্লোভস পড়ে রোগীকে ওরাল হাইজিং দেওয়ার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে এবং মৌখিক সম্মতি নিতে হবে।
৫। রোগীর পজিশন আরামদায়ক অবস্থায় নিয়ে নিতে হবে।
৬। রোগীর মুখগহবর, দাঁত এবং গলার ভিতর পরীক্ষা করে একের পর এক ধাপ মেনে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।
৭। রোগীর বুকের উপর এবং থুতনীর নীচে ম্যাকিংটোস/ রাবার ক্লথবিছিয়ে নিতে হবে।
৮। রোগীকে বিছানা থেকে ৪৫ ডিগ্রী কোণে পজিশনিং করে মুখের বিপরীতে একটি কিডনি ট্রে ধরে রাখতে হবে।
৯। রোগী অচেতন থাকলে টাং ডিপ্রেসর দিয়ে মুখের চোয়াল হাঁ করে নিতে হবে।
১০। কাপের মধ্যে রাখা সলিউশন -এর মধ্যে জীবানুমুক্ত একপিছ গজ ভিজিয়ে নিংড়িয়ে নিয়ে রোগীর মাড়ি ও মুখের ভিতর উপর -নীচ করে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
২। সচেতন রোগীর ক্ষেত্রে টুথব্রাশে পেষ্ট লাগিয়ে ছবিতে নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।
১২। রোগীকে গ্লাসে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি দিয়ে কুলকুচি করে উক্ত পানি বেসিনে ফেলে দিতে বলতে হবে।
১৩। রোগীর মুখমন্ডল ফেইস টাওয়েল দিয়ে মুছে দিতে হবে।
১৪। ব্যবহৃত হয়েছে এমন জিনিসগুলো নির্ধারিত বিনে/বর্জ্য পাত্রে রাখতে হবে।
১৫। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
১৬। পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম, উপকরণসমূহ এবং কাজের এলাকাটি পরিষ্কার করে নির্দেশনা অনুসারে সরঞ্জাম ও উপকরণসমূহ নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

কাজের সতর্কতাঃ

১। কাজের সময় পিপিই ব্যবহার করতে হবে।
২। রোগীর সহযোগীতা পেতে পুরো পদ্ধতিটি বর্ণনা ও শেয়ার করতে হবে।
৩। ওরাল হাইজিং দেওয়ার পূর্বে রোগীকে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য পরিহার করার বিষয়টি অবহিত করতে হবে।
৪। রোগীর মুখে কোন আর্টিফিসিয়াল দাঁত কিংবা ডেঞ্চার আছে কিনা তা অবশ্যই পরীক্ষা করে নিতে হবে।
৫। কাজ শুরু করার পূর্বে রোগীকে আরামদায়ক অবস্থানে পজিশনিং করে নিতে হবে।
৬। কাজটি সম্পন্ন করতে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি ওরাল হাইজিং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে ।

জব ২: বেডপ্যানের মাধ্যমে রোগীকে টয়লেটিং এ সহযোগীতা করা

পারদর্শীতার মানদন্ড:

১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হবে।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী বেডপ্যানের মাধ্যমে টয়লেটিং এর জন্য রোগীর বিছানাকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

৩। জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়্যাল বাছাই এবং সংগ্রহ করতে হবে।

৪। কাজে সহায়তা করার জন্য রোগীকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

৫। টয়লেটিং-এর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থানটি পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

৬। ব্যবহৃত জিনিসসমূহ নির্ধারিত ময়লার বিনে /বর্জ্য ধারকে ফেলে দিতে হবে।

৭। কাজ শেষে রেকর্ড শীটে জবের আউটপুট নথিভুক্ত করতে হবে।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট/ ম্যাটেরিয়্যালস:

১। এক বেসিন ক্ক গরম পানি (A basin with warm water)

২। ডিস্পজেবল গ্লাভস (Disposable gloves)

৩। টয়লেট পেপার (Toilet paper)

৪। তোয়ালে (Towels)

৫। পরিষ্কার কাপড় বা ভিজা ওয়াইপস (Wash cloths or wet wipes)

১। ডিস্পজেবল গ্লাভ; ২। টয়লেট পেপার; ৩। টাওয়েল; ৪। ভিজা ওয়াইপস

কাজের ধারা:

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পরতে হবে।

২। নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।

৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে তা প্রস্তুত করতে হবে।

৪। বেডপ্যানটিকে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে বেডপ্যান খালি করে নিতে হবে।

৫। বেডপ্যানের উপরিভাগে ট্যাল্কম পাউডার ব্যবহার করতে হবে যাতে রোগীর ত্বকের সাথে এটি এটে না যায়।

৬। বেডপ্যানের টয়লেট টিস্যু / পানি অথবা ভেজিটেবল অয়েল স্প্রে করতে হবে যাতে পরবর্তীতে বেডপ্যানটি সহজে পরিষ্কার করা যায়।

৭। রোগী যদি সক্ষম হয় তাহলে তাকে উক্ত কাজে সহযোগীতা করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

৮। ব্যক্তির গাউনটি উপরে তুলে ব্যক্তিকে তার বাটকের নীচে বেডপ্যানটি রাখতে বলতে হবে।

৯। যদি রোগী তার হিপ উপরে জাগাতে না পারে তাহলে তাকে পাশে ঘুরিয়ে তারপর বেডপ্যানের উপরে ফিরিয়ে দিতে হবে।

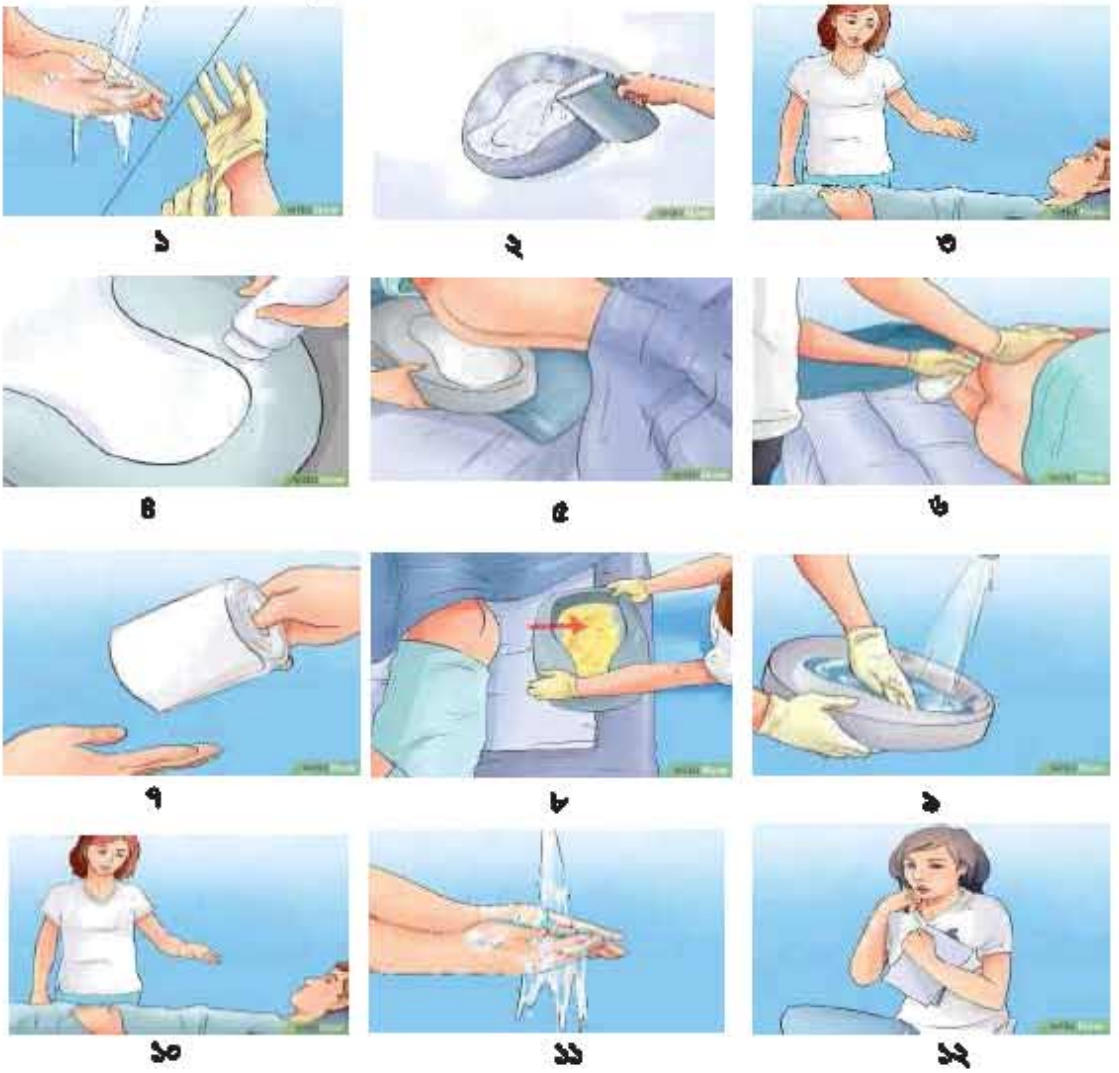

চিত্র ৪.৩৩ : বেডপ্যান দিয়ে টয়লেটিং এ সহযোগীতা করার ধারাবাহিক চিত্র

১০। যদি ব্যক্তি তার মলদ্বারের এলাকা পরিষ্কার করতে না পারে, তাহলে জায়গাটি পরিষ্কার করার জন্য একটি ভেজা টিস্যু ব্যবহার করতে হবে।

১১। যদি কোনো মহিলার প্রস্রাব হয় তবে সেই জায়গায় এক কাপ গরম পানি ঢেলে শুকিয়ে নিতে হবে।

১২। বেডপ্যানটি সরিয়ে পরিষ্কার করে খালি করে জমাকৃত বর্জ্য টয়লেটে ফেলতে হবে।

১৩। হাতের গ্লোভস ও ব্যবহৃত হয়েছে এমন জিনিসগুলো নির্ধারিত ময়লার বিনে/ বর্জ্য ধারকে রাখতে হবে।

১৪। ব্যক্তির হাত ধুয়ে নিজের হাত আবার ধৌত করতে হবে।

১৫। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৬। কাজের এলাকাটি পরিষ্কার করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য সরঞ্জাম, উপকরণসমূহ নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

কাজের সতর্কতা:

১। কাজের সময় পিপিই ব্যবহার করতে হবে।

২। রোগীর সহযোগীতা প্রত্যাশা করতে পুরো পদ্ধতিটি অবহিত করতে হবে।

৩। যখন রোগীকে সরাতে সাহায্য করা লাগবে তখন নিজের নিরাপদ থাকার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিতে হবে।

৪। রোগীকে সাহায্য করার আগে, ঐ বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত নির্দেশাবলি ভালোভাবে রপ্ত করে নিতে হবে।

৫। কাজ শুরু করার পূর্বে রোগীকে আরামদায়ক অবস্থানে পজিশনিং করে নিতে হবে।

৬। কাজটি সম্পন্ন করতে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি বেডপ্যানের মাধ্যমে রোগীকে টয়লেটিং করানোর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে ।

জব ৩: প্রাপ্ত বয়স্কদের ডায়াপার খোলা ও পরানো

পারদর্শীতার মানদন্ড:

১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হবে।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী বেডপ্যানের মাধ্যমে টয়লেটিং এর জন্য রোগীর বিছানাকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

৩। জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়্যাল বাছাই এবং সংগ্রহ কর।

৪। তোমার কাজে সহায়তা করার জন্য রোগীকে প্রস্তুত রাখ।

৫। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থানটি পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

৬। ব্যবহৃত জিনিসসমূহ নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে ফেলে দিতে হবে।

৭। কাজ শেষে রেকর্ড শীটে জবের আউটপুট নথিভুক্ত কর।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট

১। স্ক্রীন, ২।টিস্যু পেপার, ৩। ডায়াপার , ৪। সাবান, ৫। তোয়ালে, ৬। বালতি, ৭। পাউডার, ৮। রাবার শীট, ৯। এন্টি র‍্যাশ ক্রীম, ১০। পরিষ্কার কাপড় বা ভিজা ওয়াইপস

কাজের ধারা:

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পরতে হবে।

২। নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।

৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরবরাহকৃত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে তা প্রস্তুত করতে হবে।

৪। রোগীর সম্মতি গ্রহণ করুতে হবে।

৫। গোপনীয়তার সাথে রোগীর শরীর থেকে পুরনো/ ব্যবহৃত ডায়াপার খুলতে সহায়তা করতে হবে।

৬। ব্যবহৃত ডায়াপার সঠিক নিয়মে নির্ধারিত ময়লা রাখার বিন/ ঝুড়ি/ বর্জ্য ধারকে রাখতে হবে।

৭। রোগীকে পরিষ্কার করতে হবে।

৮। এ্যান্টির‍্যাশ ক্রীম ব্যবহার করতে হবে।

৯। গোপনীয়তার সাথে রোগীকে নতুন ডায়াপার পরতে সহায়তা করতে হবে।

১০। রোগীকে পূর্বের অবস্থানে স্থানা রিত করতে হবে।

১১। কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম ও উপকরণগুলো সুশৃংখলভাবে পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

১২। হাতের গ্লাভস ও ব্যবহৃত হয়েছে এমন জিনিসগুলো নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে ফেলতে হবে।

১৩। প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড চার্টে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৪। কর্মক্ষেত্রটি পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

কাজের সতর্কতা:

১। কাজের সময় পিপিই ব্যবহার করতে হবে।

২। রোগীর সহযোগীতা প্রত্যাশা করতে পুরো পদ্ধতিটি বর্ণনা ও শেয়ার কর।

৩। রোগীকে সরাতে সাহায্য করার সময় নিজের নিরাপদ থাকার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিতে হবে।

৪। ডায়াপার খোলার পড়ে রোগীর বাটোকেকোন র‍্যাশ কিংবা কোনো লালচে ভাব আছে কিনা, তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৫। ৬ ঘন্টা পর পর ডায়াপার বদলিয়ে দিতে হবে। তবে এ সময়ের আগে মাঝে মাঝে চেক করতে হবে কোনো প্রসাব অথবা পায়খানা জমে আছে কিনা।

৬। রোগীকে সাহায্য করার আগে, ঐ বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত নির্দেশাবলি ভালোভাবে রপ্ত করে নিতে হবে।

৭। কাজ শুরু করার পূর্বে রোগিকে আরামদায়ক অবস্থানে পজিশনিং করে নিতে হবে।

৮। কাজটি সম্পন্ন করতে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি রোগীর ডায়াপার খোলা ও পড়ানোর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে ।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে পুরনো ডায়াপার খোলার ধাপ সমূহ দেওয়া হলো:

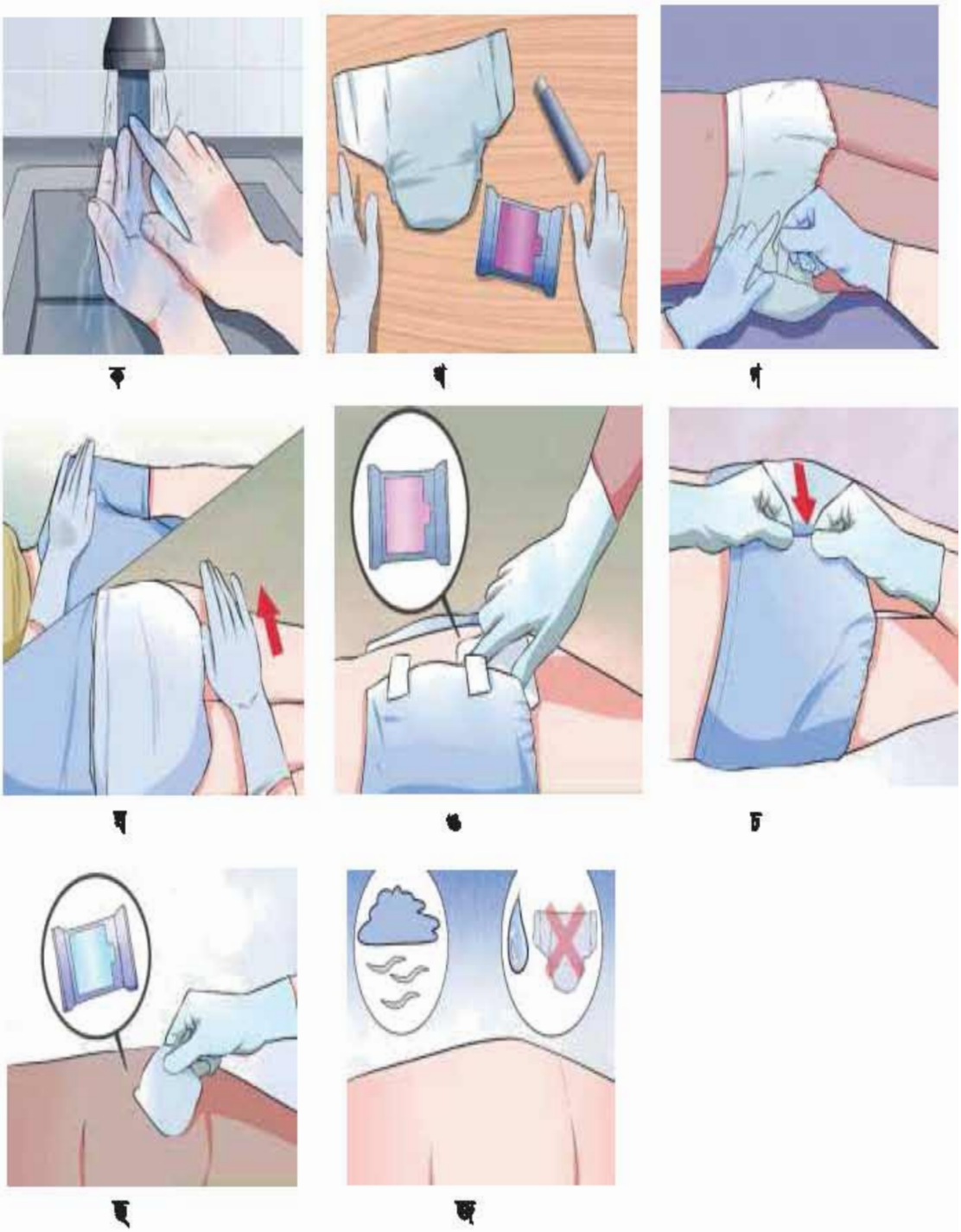

চিত্র ৪.৩৪ : পুরনো ডায়াপার খোলার ধাপসমূহ

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে নতুন ডায়াপার পড়ানোর ধাপসমূহ দেওয়া হলো:

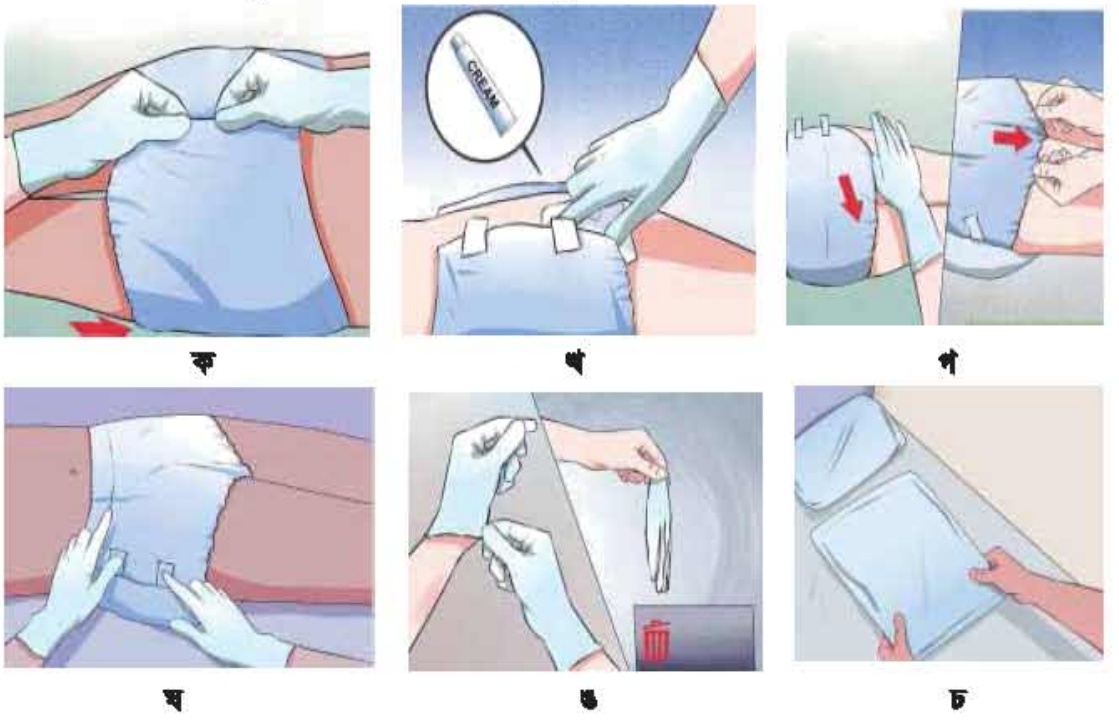

চিত্র ৪.৩৫: নতুন ডায়াপার পড়ানোর ধাপসমূহ

জব ৪: রোগীকে পায়ের যত্নে সহায়তা করা

পারদর্শীতার মানদন্ড:

১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) ও নির্ধারিত পোশাক পরিধান করতে হবে।

২। প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীর পা ধোয়ার জন্য আরামদায়ক জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

৩। জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়্যাল বাছাই এবং সংগ্রহ করতে হবে।

৪। কাজে সহায়তা করার জণ্য রোগীকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

৫। পায়ের যত্নের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থানটি পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

৬। ব্যবহৃত জিনিসসমূহ নির্ধারিত বর্জ্য ধারকে ফেলে দিতে হবে।

৭। কাজ শেষে রেকর্ড শীটে জবের আউটপুট নথিভুক্ত করতে হবে।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট

১। ফুট ফাইলস (Foot Files), ২। কলাস রিমুভার (Callous Removers), ৩। কিউটিকল নিপারস (Cuticle Nippers), ৪। ফুট স্ক্রাব (Foot Scrubs), ৫। লোশন (Lotion), ৬। সুতির টাওয়েল (Cotton Towels), ৭। পামলা, ৮। স্পঞ্জ, ৯। সাবান

কাজের ধারা:

১। কাজের জন্য উপযুক্ত পিপিই (PPE) পরতে হবে।

২। আদর্শ নির্দেশিকা অনুযায়ী হাত ধৌত করতে হবে।

৩। সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরঞ্জাম সংগ্রহ করে তা প্রস্তুত করতে হবে।

৪। রোগীর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

৫। গোপনীয়তার সাথে রোগীর শরীর থেকে পুরনো/ ব্যবহৃত ডায়াপার খুলতে সহায়তা করতে হবে।

৬। একটি যথার্থ আকারের গামলায় হালকা গরম পানি নিয়ে নিতে হবে।

৭। রোগীকে ২-৩ মিনিট এই পানিতে পা ডুবিয়ে রাখতে বলতে হবে।

৮। নখে যদি কোনো ময়লা থাকে তা কলাস রিমুভার দিয়ে উঠিয়ে ফেলতে হবে।

৯। স্পঞ্জের সাহায্যে সাবান দিয়ে গ্রাহকের পা আলতোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

১০। পরিষ্কার পানি দিয়ে পা ধুয়ে দিতে হবে।

২। শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভালোমতো পা মুছে দিতে হবে।

১২। পায়ে পর্যাপ্ত লোশন (ময়েশ্চারাইজার) লাগিয়ে দিতে হবে।

১৩। রোগীকে পূর্বের অবস্থানে স্থানান্তরিত করতে হবে।

১৪। কর্মক্ষেত্রের নিয়ম অনুসারে সরঞ্জাম ও উপকরণগুলো সুশৃংখলভাবে পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

কাজের সতর্কতা:

১। কাজের সময় পিপিই ব্যবহার করতে হবে।

২। রোগীর সহযোগীতে প্রত্যাশা করতে পুরো পদ্ধতিটি বর্ণনা ও শেয়ার নিতে হবে।

৩। সেবাদানকারী যখন রোগীকে সরাতে সাহায্য করবে, তখন নিজের নিরাপদ থাকার ব্যাপারেও গুরুত্ব দিতে হবে।

৪। পায়ে কোনো ইনফেকশন, ক্ষত অথবা ডিসলোকেশন আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৫। রোগীকে সাহায্য করার আগে, ঐ বিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত নির্দেশাবলি ভালোভাবে রপ্ত করে নিতে হবে।

৬।কাজ শুরু করার পূর্বে রোগিকে আরামদায়ক অবস্থানে পজিশনিং করে নিতে হবে।

৭।কাজটি সম্পন্ন করতে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি পায়ের যত্ন নেয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে ।

চিত্র ৪.৩৬: পা ধুয়ে দেওয়ার পদ্ধতি

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। এডিএল কি?
২। মুখ-গহবরের যত্ন নিলে মুখ ও দাঁতের দু'টি সমস্যা উল্লেখ কর।
৩। একটি স্বাস্থ্যকর মুখের জন্য কি কি অভ্যাস থাকা জরুরি?
৪। ডেন্টাল ফ্লসের ব্যবহার কি?
৫। ইনকন্টিনেন্স বলতে কি বোঝায়?
৬। প্রাপ্ত বয়স্কদের ডায়াপারের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
৭। বাচ্চাদের ডায়াপারের প্রকারভেদ তিনটি কি কি?
৮। বয়স্করোগীদের পোশাক পড়ানোর কৌশল লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মুখগহ্বরের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কেয়ারগিভারের কয়েকটি নিয়মিত কাজ উল্লেখ কর?
২। মুখগহ্বরের যত্নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো কি কি?
৩। রোগীকে ওরাল হাইজিন বজায় রাখতে সহযোগীতা করার সময় কি উপকরন ও সামগ্রীর প্রয়োজন হয়?
৪। রোগীর টয়লেটিং এর জন্য সহযোগীতার প্রয়োজন হয় কেন?
৫। সাহায্যকারী টয়লেটের প্রকারভেদ গুলো কি?
৬। টয়লেট ব্যবহারকে কিভাবে সহজ করা যায়?
৭। একজন ব্যক্তিকে বেডপ্যান ব্যবহার করতে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুতি সম্পর্কে লিখ।
৮। বাচ্চাদের ডায়াপার পড়ানোর সময় করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ কর।
৯। পোশাক পরিধান করিয়ে দিতে করণীয় বিষয়গুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। একজন কেয়ারগিভারের জন্য এডিএল-এর ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।
২। কেয়ারগিভারের জন্য এ ডি এল কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
৩। ওরাল হাইজিং সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর?
৪। মুখগহ্বরের স্বাস্থ্যের দুর্বলতা বোঝার উপায় ও করণীয় কি?
৫। সঠিক পদ্ধতিতে দাঁত ব্রাশ ও জিহ্বা পরিষ্কার করার ধাপগুলো ক্রমানুসারে উল্লেখ কর।
৬। রোগীর ওরাল হাইজিন বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় কাজের ধারাগুলো বর্ণনা কর।
৭। টয়লেট বা কমোড ব্যবহার করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
৮। শিশুদের ডায়াপার পড়ানোর সময় অবশ্যই করণীয় ধাপগুলো বর্ণনা কর।
৯। প্রাপ্ত বয়স্কদের ডায়াপার খোলা ও পড়ানোর সতর্কতা বর্ণনা কর।

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-২

Patient Care Technique-2

দ্বিতীয় পত্র

দশম শ্রেণি

২০২৩

২০২৩

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা

Basic First Aid

দুর্ঘটনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি স্বাভাবিক বিষয়। দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের শারীরিক দুর্ঘটনার শিকার হই যার জন্য প্রয়োজন দ্রুত গতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা এবং উন্নত চিকিৎসার আশু ব্যবস্থা। প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা পেশেন্ট কেয়ার টেকনিশিয়ান বা কেয়ারগিভারের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় দক্ষতা। এই অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা সংক্রান্ত মৌলিক কিছু ধারণা ও কর্মদক্ষতা অর্জন করব যাতে করে এ ধরনের পরিস্থিতে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা কী তা বলতে পারব
- ফার্স্ট এইডের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব
- বিভিন্ন ধরনের জরুরি পরিস্থিতি ও প্রাথমিক সহায়তার কৌশল চিহ্নিত করতে পারব
- ফার্স্ট এইড বক্স ও এর অন্তর্ভুক্ত সরঞ্জামাদি চিহ্নিত করতে পারব
- বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যার লক্ষন সনাক্ত করতে পারব
- ফার্স্ট এইডের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারব

উল্লেখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা দুই আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই দুই আইটেম জবের মাধ্যমে আমরা সিপিআর শুরুর আগে প্রারম্ভিকভাবে করণীয় ধাপ ও অজ্ঞান ব্যক্তিকে ধাপানুসারে সিপিআর দেওয়ার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারব।

১.১ প্রাথমিক চিকিৎসার মৌলিক ধারণা (Basic Concepts of First Aid)

১.১.১ প্রাথমিক চিকিৎসা কি?

কোনো দুর্ঘটনায় হঠাৎ আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে ডাক্তার বা হাসপাতালে পাঠানোর আগে তাৎক্ষণিকভাবে যে সেবা দেওয়া হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বা First Aid বলা হয়। যিনি প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন তিনি একজন প্রাথমিক চিকিৎসক বা ফার্স্ট এইডার (First Aider).

প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য: প্রাথমিক চিকিৎসার মূলনীতি ৩টি। যথা:

১। আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির জীবন বাচাতে সাহায্য করা।

২। অবস্থার অবনতি রোধ করা।

৩। অবস্থার উন্নতি করা এবং উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

প্রাথমিক চিকিৎসার কার্যস্তর

১। রোগ নির্ণয় (উপসর্গ, লক্ষণ ও ঘটনার বিবরণ থেকে) ।

২। শুশ্রূষা বা সেবা প্রদান।

৩। হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থানান্তর।

প্রাথমিক চিকিৎসার নীতি

১। মাথা ঠান্ডা রেখে দ্রুত কাজ করা।

২। প্রাথমিক চিকিৎসক ডাক্তার নন।

১.১.২ প্রাথমিক চিকিৎসকের গুণাবলি ও দায়িত্ব

একজন প্রাথমিক চিকিৎসক যেকোনো ব্যক্তিই হতে পারেন। তবে প্রাথমিক চিকিৎসক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যথা-

১। ঠান্ডা মাথায় দ্রুত পরিস্থিতি যাচাই করা ।

২। নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন থাকা ।

৩। সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকা ।

৪। আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা যাচাই করা ।

৫। দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা ।

৬। হাসপাতাল, চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা।

৭। নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকা ।

৮। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আস্থা যাচাই করা।

৯। প্রতিবেদন তৈরি করা।

১.১.৩ আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা যাচাই করা

দুই স্তরের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একজন আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা যাচাই করা হয়ে থাকে। যথা-

১। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ: জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ বিষয়সমূহ উপস্থিত আছে কিনা; যেমন: শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আছে কিনা।

২। পরবর্তী পর্যবেক্ষণ: মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালো করে দেখা। সর্বোপরি লক্ষণ থেকে সমস্যা নির্ণয় করা।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য আমাদের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ দুটি তন্ত্র (System) হচ্ছে শ্বাসতন্ত্র এবং রক্ত সঞ্চালন। তাই ব্যক্তির অবস্থার উপর নির্ভর করে কখনো কখনো প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ হিসেবে শ্বাস চলাচল ও রক্ত সঞ্চালন পরীক্ষা করা এবং যদি তন্ত্রগুলোর একটি বা উভয়ই কার্যকর না থাকে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। বিষয়গুলো সহজে মনে রাখার জন্য ইংরেজি ABCDE তিনটি আদ্যাক্ষর ব্যবহার করা যায়।

A- Airway (শ্বাসনালি খুলে দেওয়া):
শ্বাসনালি খুলে দিতে হবে। এক হাত কপালে ও অন্য হাতের আঙ্গুল থুতনিতে রেখে আহত/অসুস্থ ব্যক্তির মাথা আলতো করে পেছনে হেলিয়ে এবং হা করিয়ে দেখতে হবে যে মুখে কিছু আটকে আছে কিনা, থাকলে তা বের করে ফেলতে হবে।

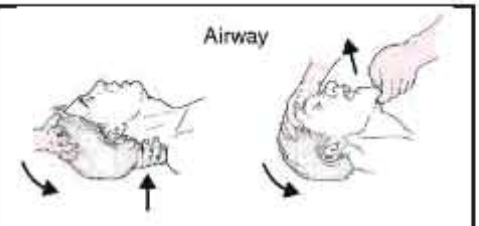

B- Breathing (শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করা)
শ্বাসনালি খোলা রেখে দেখা, শোনা ও অনুভবের মাধ্যমে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করা যায়। এটি সহজে মনে রাখার জন্য দেখা, শোনা, অনুভব করা (Look, Listen, Feel/Palpate) শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে:

- Look (দেখা)- বুক ওঠানামা করছে কিনা
- Listen (শোনা)- শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হচ্ছে কিনা
- Feel/Palpate (অনুভব)- নাক থেকে গরম বাতাস বের হচ্ছে কিনা।

C- Circulation (রক্ত সঞ্চালন)
ভালো করে খেয়াল করতে হবে শরীরের কোথাও প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিনা। রক্তক্ষরণ হলে তা দ্রুত বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় আহত ব্যক্তির জীবননাশের হুমকি স্বরূপ রক্ত সঞ্চালন ব্যাহতগ্রস্ত হয়ে শক এ আক্রান্ত হতে পারে।

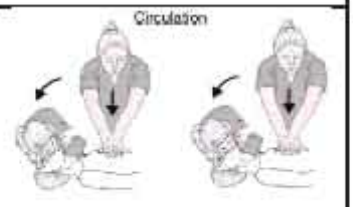

D- Disablity (পঙ্গুত্ব বা অঙ্গহানি) এক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনায় কোনো অঙ্গহানী হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং যদি হাত-পা ভেঙ্গে গিয়ে থাকে তাহলে সেটাকে যথাসম্ভব সোজা অবস্থায় বেঁধে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া।	

E- Exposure (রক্ত সঞ্চালন) এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি অজ্ঞান হয় তাহলে তার প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য শরীরের কাপড় অপসারণ করে খুটে খুটে পর্যবেক্ষণ করা যে শরীরে আর কোথায় কোনো বড় ধরনের আঘাত বা ক্ষত আছে কিনা।	

পরবর্তী পর্যবেক্ষণ

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করার পর ব্যক্তির সার্বিক অবস্থা যাচাই করার লক্ষ্যে মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই অবস্থা যাচাই করার জন্য ঘটনার বিবরণ, ব্যক্তির উপসর্গ এবং লক্ষণসমূহ পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসক বিষয়সমূহ নোট করবেন যা ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করলে মূল্যবান তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করবে।

বিবরণ সংগ্রহ

আহত বা অসুস্থ ব্যক্তি বা উপস্থিত লোকজনের কাছ থেকে প্রধানত দুটি বিষয়ে জানা প্রয়োজন; ঘটনার বিবরণ এবং যদি কোন রোগ থেকে থাকে তাহলে রোগের বিবরণ। বিবরণ সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সহজে মনে রাখার জন্য ইংরেজী AMPLE ব্যবহার করা হয়।

- A (Allergy): ব্যক্তির কোনো কিছুতে এলার্জি আছে কি?
- M (Medical Problems & Medications): ব্যক্তি বর্তমানে কোনো ঔষধ গ্রহণ করছেন কি?
- P (Previous Medical History): উল্লেখ করার মতো অতীতে কোনো রোগ হয়েছিল কি?
- L (Last Event): সব শেষবার খাবার খেয়েছেন কখন?
- E (Event History): ঘটনাটা কি ঘটেছিল? কোনো রোগ সংক্রান্ত, নাকি দুর্ঘটনা?

১.১.৪ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ পরিবীক্ষণ (Monitor) করা

একজন আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের পর তাঁর অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা হাসপাতালে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত তাকে পরিবীক্ষণে রাখা প্রয়োজন। যথাযথ পরিবীক্ষণের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির অবস্থা উন্নতি করা ও অবনতি রোধ করা সম্ভব হয়। নিচে পরিবীক্ষণের তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক) সাড়া দেওয়ার পর্যায় (Level of Response)

পর্যায়গুলো সহজে মনে রাখার জন্য AVPU আদ্যাক্ষরসমূহ ব্যবহার করা হয়।

- A (Alert to Shake): নড়াচড়া করায় সাড়া দেয় কিনা
- V (Response to Voice): শব্দ করলে/ডাকাডাকি করলে সাড়া দেয় কিনা
- P (Response to Pain): চিমটি/হালকা ব্যথা দিলে সাড়া দেয় কিনা
- U (Unresponsive): কোনো কিছুতেই সাড়া না দেওয়া

খ. নাড়ির গতি ও শক্তি)

নাড়ি গতি ও শক্তি মনিটর করা। এটা নিয়মিত কিনা, স্বাভাবিক বা দুর্বল কিনা, স্বাভাবিক গতির তুলনায় দ্রুত বা ধীর কিনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বিশ্রাম অবস্থায় নাড়ির স্বাভাবিক গতিও পরিমাপ করতে হবে।

চিত্র ১.১ : নাড়ির গতি পর্যবেক্ষণ

গ. শ্বাস-প্রশ্বাস (গতি, গভীরতা)

শ্বাস-প্রশ্বাস (Breathing) নিয়মিত কিনা, শ্বাস-প্রশ্বাসে শব্দ হচ্ছে কিনা, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কিনা এসব বিষয় নিবিড়ভাবে মনিটর করা ও নোট নেয়া। বয়সভেদে বিশ্রাম অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি:

বয়স	শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি (প্রতি মিনিট)	পালস বা নাড়ির গতি (প্রতি মিনিট)
০-১২ মাস	৩০-৪০	১০০-১৪০
১-১২ বছর	২০-৩০	৮০-১০০
১২ বছরের উর্ধ্বে	১২-২০	৬০-৯০ বা ১০০

সংক্রমণ প্রতিরোধ

সংক্রমণ প্রতিরোধের বিষয়টি আহত বা অসুস্থ ব্যক্তি এবং প্রাথমিক চিকিৎসকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। উভয়েই পরিবেশ থেকে সংক্রমিত হতে পারেন। যেমন, আহত ব্যক্তির ক্ষত মাটি থেকে টিটেনাস জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানকালীন প্রাথমিক চিকিৎসক নিজেও আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারেন এবং তিনিও টিটেনাস জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারেন। আবার উভয়ে একে অপরের কাছ থেকে সংক্রমিত হতে পারেন যাকে ক্রস ইনফেকশন (Cross Infection) বলা হয়ে থাকে। যেমন রক্ত বা দেহ রসের মাধ্যমে এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাস ছড়াতে পারে। তাই একজন প্রাথমিক চিকিৎসককে সংক্রমণ প্রতিরোধের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে প্রয়োগ করতে হবে।

১.১.৫ প্রাথমিক চিকিৎসা উপকরণ তালিকা

সাধারণত তিন ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাগ বা বক্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে যথা: ব্যক্তি, পরিবার ও স্কুল বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে। নিচে অত্যাবশকীয় কিছু উপাদানসমূহের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হলো।

ক. জীবাণুমুক্ত গজ পিস : ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করে ও জীবাণু সংক্রমণ কমায়। ওটা ক্ষতস্থানকে নিরাপদে রাখে, তাতে ময়লা হতে দেয় না এবং ক্ষত থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ শুষে নেয়।

খ. রোলার ব্যান্ডেজ : ড্রেসিংকে তার জায়গায় ভালোভাবে আটকে রাখার জন্য বা অতিরিক্ত রক্তপাত হলে, ব্যান্ডেজের ওপর চাপ দিয়ে পেঁচিয়ে রক্ত বন্ধ করতে, রোলার ব্যান্ডেজ ব্যবহৃত হয়। হাতে প্লাস্টার করা হলে তা জায়গামতো রাখতে, স্লিং বানাতে রোলার ব্যান্ডেজ প্রয়োজন হয়।

গ. কাঁচি : ক্ষতের পাশে প্রয়োজনে পরনের কাপড় কাটা, গজ, ব্যান্ডেজ, মাথার চুল ইত্যাদি কাটার জন্য কাঁচি দরকার।

ঘ. সিটকোগ্লাস্ট : ব্যান্ডেজ ক্ষতের ওপর আটকানোর জন্য দরকার।

ঙ. অ্যান্টিসেপটিক লোশন বা ক্রিম : ক্ষত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে দরকার হয়। যেমন- স্যাভলন, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, পভিসেভ ইত্যাদি।

চ. ট্যুইজারস বা টিমটি : শরীর থেকে কাঁটা, কোনো ক্ষুদ্র বস্তু বা স্প্লিনটার, পোকামাকড়ের শূল ইত্যাদি সরাতে বেশ ফলদায়ক। তা ধাতু বা প্লাস্টিকের তৈরি ও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

ছ. ক্রেপ ব্যান্ডেজ : হাড় কেটে গেলে বা কোথাও মচকে গেলে ক্রেপ ব্যান্ডেজ ব্যবহারে ব্যথা কমে, ফোলাও ক্রমশ হ্রাস পায়।

জ. সেফটিপিন : কাঁটা বা ক্ষত থেকে কোনো স্প্লিনটার সরাতে, ব্যান্ডেজ আটকাতে ও স্লিং জায়গামতো ধরে রাখার জন্য সেফটিপিন একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। এটি হালকা, শক্ত ও নিরাপদ।

ঝ. অ্যান্টিহিস্টামিন : যেমন হিস্টাসিন, ফেক্সোফেনাডিন ইত্যাদি। এগুলো সর্দি, হাঁচি, কাশি, চুলকানি ও পোকার কামড়ের চিকিৎসায় সহায়ক।

ঞ. ব্যথার ওষুধ : যেমন প্যারাসিটামল, আইবুপ্রোফেন ইত্যাদি।

ট. বার্ন ক্রিম : পোড়া জায়গার ব্যথা কমাতে ও ঘা শুকাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন— বার্নল বা সিলভারজিন ক্রিম। অ্যালোভেরা জেল পোড়া, চুলকানি ও চামড়ায় ঘাঁশ হলে বেশ কার্যকর। ক্যালেন্ডুলা ও আরটিকা ইউরেল বার্ন ক্রিম দ্রুত ব্যথা কমায়।

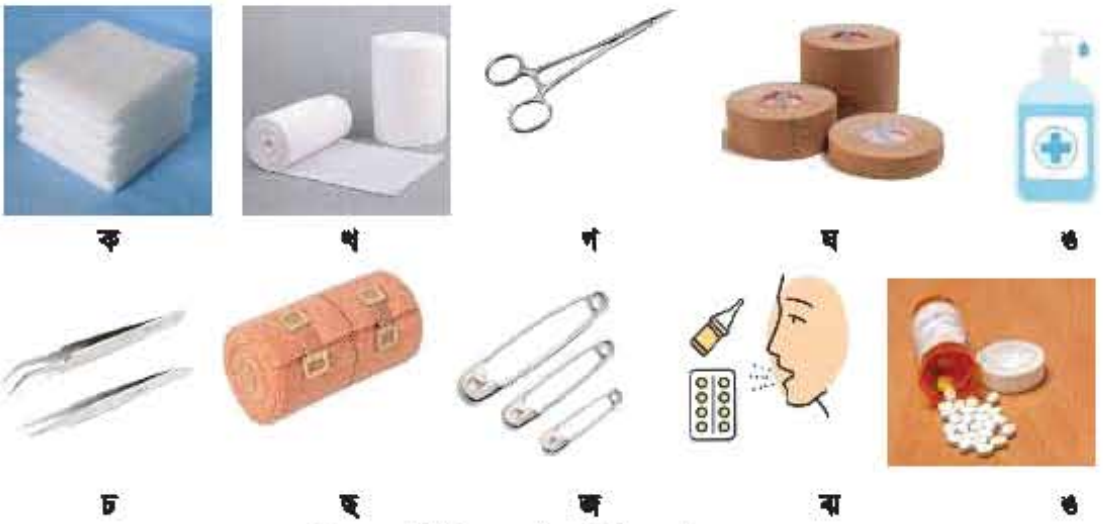

চিত্র ১.২: বিভিন্ন প্রাথমিক চিকিৎসা উপকরণ

১.১.৬ শারীরিক ঝুঁকি বা ফিজিক্যাল হ্যাজার্ড (Physical Hazard)

শারীরিক ঝুকি বা বিপত্তি হল একধরনের এজেন্ট, ফ্যাক্টর বা পরিস্থিতি যেটি কোনো ব্যক্তি শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এটাকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ওয়ার্কপ্লেস হ্যাজার্ড বা কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি

খুব সহজ ভাষায় বললে, কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকিগুলো হ'ল কাজের যে কোনো দিক যা স্বাস্থ্যের এবং সুরক্ষার ঝুঁকি নিয়ে আসে এবং ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।কয়েকটি উদাহরন নিচে দেওয়া হলো:

• **জৈবিক:** জৈবিক বিপদের মধ্যে ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, পোকামাকড়, প্রাণী ইত্যাদির শ্লেষ্মা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, হাঁচ, রক্ত এবং অন্যান্য শারীরিক তরল, ক্ষতিকারক উদ্ভিদ, নিকাশী, ধূলিকণা এবং ভার্মিন।	
• **রাসায়নিক:** রাসায়নিক বিপদ কর্মস্থলে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা হতে পারে। এই বিপদগুলোর ফলে ত্বকের দহন, শ্বাসযন্ত্রের জ্বালা, অজ্ঞান, ক্ষয় এবং বিস্ফোরণের মতো স্বাস্থ্য এবং শারীরিক প্রভাব উভয়ই হতে পারে।	
• **সুরক্ষার অভাব জনিত:** এগুলো এমন ঝুঁকি যা অনিরাপদ কাজের পরিস্থিতি তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক তার বা ক্ষতিগ্রস্থ কার্পেটের ফলে ট্রিপিং বিপত্তি হতে পারে। এগুলো কখনও কখনও শারীরিক বিপদের কারণ হয়ে থাকে।	
• **এরগনোমিক:** অ্যারগোনমিক বিপত্তি শারীরিক অবস্থানের সমস্যার ফলে মাস্কুলোস্কেলিটাল সিস্টেমের সমস্যা। উদাহরণস্বরূপ, অফিসে একটি দুর্বল ওয়ার্কস্টেশন সেটআপ, দুর্বল ভঙ্গি এবং ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং।	

এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড বা পরিবেশগত ঝুঁকি

পরিবেশগত ঝুঁকি এমন একটি বিপর্যয় যেটি সাধারণত ক্ষতিকারক কোনো পদার্থ, অবস্থা বা ঘটনা যা আশেপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে হুমকির সম্ভাবনা তৈরী করে প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

পরিবেশে বিষাক্ত রাসায়নিক, জৈবিক বা শারীরিক এজেন্টের যে কোনো একক বা সংমিশ্রণ, মানুষের ক্রিয়াকলাপ বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোর ফলস্বরূপ, ভারী ধাতু, কীটনাশক, জৈবিক দূষক, বিষাক্ত বর্জ্য, শিল্পের মতো দূষণকারীগুলো ঝুঁকিগ্রস্ত স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে ।

এছাড়াও, কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে কিংবা কোন দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুনও অনেক সময় শারীরিক বিপত্তি বা ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে।

ফার্স্ট এইড ম্যানেজমেন্ট বা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা:

ফার্স্ট এইড ম্যানেজমেন্ট বলতে মূলত বাসা-বাড়ি কিংবা কর্মস্থলে কোনো ব্যক্তির শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে উন্নত চিকিৎসা না পাওয়া পর্যন্ত প্রদায়িত প্রাথমিক চিকিৎসার ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থলের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বেশি অর্থবহ। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায়:

- ওয়ার্কপ্লেস পলিসি এন্ড প্রোসিডিউরস অথবা কর্মক্ষেত্রেরনীতি এবং পদ্ধতি
- ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক রেগুলেশনস এন্ড কোড্স অথবা, ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক প্রনীত নিয়মাবলি
- অকুপেশনাল হ্যালথ এন্ড সেফটি অথবা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
- রাষ্ট্রীয় দিকে নির্দেশনা

১.২ ফার্স্ট এইডের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা

এক্সিডেন্ট ও ইমার্জেন্সি অবস্থা নিয়ে আমরা আগের অনুচ্ছেদে জেনেছি। এখন আমরা বিভিন্ন জরুরি অবস্থায় ফার্স্ট এইডের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা অনুশীলন করব।

১.২.১ শ্বাস প্রশ্বাসে বাধা/ চোকিং (Airway Obstruction/Chocking)

যখন কোনো খাদ্যকণা বা তরল জাতীয় কিছু গলায় আটকে যায় এবং কখনো কখনো শ্বাসনালির মুখ বন্ধ করে দেয়সে অবস্থাকে চোকিং বলে।

চোকিং এর লক্ষণ

হালকা বাধা - ব্যক্তি কথা বলতে পারবে, কাশি দিতে পারবে।

মারাত্মক বাধা
- ব্যক্তি কথা বলতে পারবেনা
- শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হতে পারে
- ঠোট, কানের লতি, হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ নীলচে দেখাবে
- মুখের বর্ণ লালচে হয়ে উঠতে পারে
- ব্যক্তি দু'হাত দিয়ে গলা চেপে ধরবে
- কাশি দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে ।

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

একজন প্রাথমিক চিকিৎসক হিসেবে তোমার লক্ষ্য হবে

- শ্বাসনালির বাধা অপসারণ করা
- স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করা।
- অবস্থার অবনতি হলে ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা

চোকিং এর প্রাথমিক চিকিৎসা

প্রাপ্ত বয়স্ক সজ্ঞান ব্যক্তির জন্য।

আহত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আপনার গলায়কি কিছু আটকিয়েছে? হালকা বাধা হলে তিনি কথা বলতে পারবেন, কাশি দিতে পারবেন এবং তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চলবে। মারাত্মক বাধায় ঐ ব্যক্তি কথা বলতে পারবেন না, কাশি দিতে পারবেন না এবং অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন।

ধাপ - ১

যদি শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেন, তাহলে তাকে কাশি দিতে উৎসাহিত করতে হবে। বস্তুটি বেরিয়ে আসতে পারে। যদি না আসে ধাপ ২ অনুসরণ কর।

ধাপ - ২

আহত ব্যক্তির পেছনে দাঁড়িয়ে এক হাতে তার পেটের নাভি বরাবর ধরে তাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে, শক্ত হাতের হিল দিয়ে পিঠের উপরের অংশের মাঝ বরাবর ৫টি চাপড় দিতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটি চাপড় যেন ঐ ব্যক্তির পিঠের মাঝ বরাবর এবং ঊর্ধ্বমুখী থাকে।

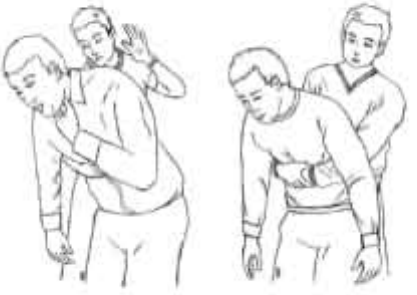

ধাপ - ৩

পিঠে চাপড় দেওয়ার পরও যদি আটকে থাকা বস্তুটি বেরিয়ে না আসে, তবে একইভাবে ঐ ব্যক্তির পেছনে দাঁড়িয়ে দুই পাশ দিয়ে দুই হাত তার বুকের কড়ি ও নাভির মাঝখানে স্থাপন করতে হবে। দুর্বল হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শক্ত হাত দিয়ে মুষ্টিটিকে আঁকড়ে ধরতে হবে। ভেতর ও উপরের দিকে ৫টি টান দিতে হবে। এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তিকে সামনের দিকে। নুইয়ে নিতে হবে।

ধাপ - ৪

মুখের ভেতর পরীক্ষা কর। যদি আটকে থাকা বস্তুটি বেরিয়ে না আসে তাহলে পর্যায়ক্রমে ধাপ ২ ও ধাপ ৩ প্রয়োগ করতে থাক। প্রতিটি ধাপ সম্পাদের পর মুখের ভিতর পরীক্ষা কর।

ধাপ - ৫

আটকে থাকা বস্তুটি যদি এরপরও বেরিয়ে না আসে তাহলে ধাপ ২ ও ধাপ ৩ পর্যায়ক্রমে করতে করতে হাসপাতালে প্রেরণ কর।

সাবধানতা

যে কোনো পর্যায়ে আহত/অসুস্থ ব্যক্তি যদি অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে তার শ্বাসনালি খুলে দিয়ে শ্বাস চলাচল পরীক্ষা করতে হবে। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ থাকলে সিপিআর দিতে হবে।

১.২.২ হৃৎপিন্ড ও ফুসফুস পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতি (সিপিআর)/ Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

সিপিআর কি?

হঠাৎ কোনো কারণে যদি একজন মানুষের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তখন বাইরে থেকে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস ও হৃৎপিন্ড চালু করার পদ্ধতিকে সিপিআর বলে।

শ্বাস বন্ধ হওয়ার কারণ

- যদি নাক ও মুখ কোনো কিছু দ্বারা বন্ধ থাকে
- যদি কোনো ব্যক্তি পানিতে ডুবে যায়
- যদি কোনো ব্যক্তি ধোঁয়াপূর্ণ ঘরে আটকে পড়ে
- যদি কোনো ব্যক্তির শ্বাস নেওয়ার মত পর্যাপ্ত শক্তি না থাকে
- যদি কোনো ব্যক্তির বুকে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব হয়
- কোনো স্থানে অক্সিজেনের স্বল্পতা/শূন্যতা দেখা দিলে
- কোনো ব্যক্তির জিভ উল্টে শ্বাসনালি বন্ধ হলে।

শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখার গুরুত্ব

যদি কারো স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে জরুরিভিত্তিতে কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাস চালু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় দেহে অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি হবে। অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি হলে কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যক্তি সম্প,র্ণভাবে জ্ঞান হারাবে এবং হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিন্ড বন্ধ হওয়া অবস্থায় ৪-৫ মিনিট অতিক্রম হলে, তার মস্তিষ্ক পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারাবে। যার ফলে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকতে পারে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে বাচিয়ে রাখার জন্য কৃত্রিমভাবে তার ফুসফুস ও হৃৎপিন্ড চালু রাখা খুবই জরুরি।

শ্বাসনালি খুলে দেওয়া

একজন আহত বা অসুস্থ ব্যক্তি, বিশেষ করে তিনি যদি অজ্ঞান অবস্থায় থাকেন তাহলে তার মাংসপেশির নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে আসে। ফলে মুখের ভেতরে জিভ পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ে। শ্বাসনালির পথ আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। এ অবস্থায় ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এবং শব্দ হতে থাকে। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধও হয়ে যেতে পারে। তখন ঐ ব্যক্তির মাথা (ছবির ন্যায়) পেছন দিকে টেনে, থুতনি উপরের দিকে তুলে ধরলে জিভ দ্বারা বন্ধ হওয়া শ্বাসনালি খুলে যায়।

শ্বাসনালি খুলে দেওয়া কৃত্রিম শ্বাস দেওয়ার ৩টি পদ্ধতি

কৃত্রিম শ্বাস দেওয়ার মৌলিক বিষয়টি হলো একজন প্রাথমিক চিকিৎসক শ্বাস গ্রহণ করার পর নির্গত শ্বাস আহত/অসুস্থ ব্যক্তির ফুসফুসে ঢুকিয়ে দেওয়া। আমরা যখন বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ করি তাতে প্রায় ২১% অক্সিজেন থাকে। যখন শ্বাস নির্গত করি তাতে ১৬% অক্সিজেন থাকে, যা একজন আহত/অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলার জন্য যথেষ্ট। তিনটি পদ্ধতিতে কৃত্রিম শ্বাস দেওয়া হয়ে থাকে।

-মুখ থেকে মুখে (Mouth to Mouth) -মুখ থেকে নাকে (Mouth to Nose)
-মুখ থেকে নাকে ও মুখে একসাথে (Mouth to Nose and Mouth) ০-১২ মাসের শিশুদের জন্য

হৃৎপিন্ড ও শ্বাস চালু করার পদ্ধতি

- অজ্ঞান কিনা তা নিশ্চিত হওয়া: প্রাথমিক জ্ঞান প্রয়োগ করে কোনো ব্যক্তির অজ্ঞান অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। যখনই নিশ্চিত হওয়া যাবে যে ঐ ব্যক্তি অজ্ঞান, সাথে সাথে শ্বাস প্রয়োগ করতে হবে এবং তার শ্বাসনালি খুলে দিতে হবে ও কিছু আটকে থাকলে তা বের করে আনার চেষ্টা করতে হবে।
- শ্বাসনালি ভালো রাখার প্রয়োজনীয়তা: একজন অজ্ঞান ব্যক্তির শ্বাসনালি সবসময়ই বিপদাপন্ন। শব্দ যুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস হতে পারে, এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধও হয়ে যেতে পারে। তখন থুতনি উঁচু করে, মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে দিলে শ্বাসনালি থেকে জিভ সরে এসে শ্বাসনালিকে উন্মুক্ত করে দেয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সহজতর হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা: শ্বাসনালি খোলা রেখে ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করতে হবে অর্থাৎ দেখতে হবে ঐ ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কিনা। দেখা শোনা ও অনুভবের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করতে হবে। ১০ সেকেন্ড ধরে এই শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে।

শ্বাস পরীক্ষা পদ্ধতি: সহজে মনে রাখার জন্য নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

- **Look** (দেখা)- বুক ওঠানামা করছে কিনা
- **Listen** (শোনা)- নাক থেকে আসা বাতাসের শব্দ শোনা যায় কিনা ।
- **Feel** (অনুভব করা)- নাক থেকে আসা কিছুটা উষ্ণ বাতাস গাল দিয়ে অনুভব করা যায় কিনা। যদি ব্যক্তির শ্বাস চালু থাকে তাহলে তাকে রিকভারি পজিশনে শুইয়ে দিতে হবে এবং ব্যক্তিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তার অন্য কোনো বড় ধরনের আঘাত আছে কিনা। আর যদি ব্যক্তির শ্বাস বন্ধ থাকে তাহলে তার রক্ত সঞ্চালনও বন্ধ হয়ে যায়, এমতাবস্থায় দ্রুত বুকে চাপ দিতে হবে অর্থাৎ সিপিআর শুরু করতে হবে। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে ফুসফুসের ধারণ ক্ষমতা কম বিধায় শিশুদের শ্বাস বন্ধ থাকলে প্রথমে ৫টি ফুঁ দিয়ে বুকে চাপ শুরু করতে হবে।

সিপিআর প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রাপ্ত বয়স্ক (১২ বছরের উর্ধ্বে) ব্যক্তির ক্ষেত্রে:

ব্যক্তির সাড়া দেওয়া অবস্থা পরীক্ষা কর।
ব্যক্তির সাথে কথা বল ও কাঁধে হালকা ঝাকুনি দাও। সাড়া দিচ্ছে কি? (না হলে)
শ্বাসনালি খুলে দাও, শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা কর

শাসপ্রশ্বাস রক্তসঞ্চালন চালু থাকলে রোগীকে

- মাথা পেছন দিকে টেনে থুতনি উপরের দিকে তুলে ধর।
- শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা কর। ব্যক্তিটির শ্বাস-প্রশ্বাস চালু আছে কি? (না হলে)

আরামদায়ক অবস্থায় শুইয়ে রাখতে হবে এবং হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

সিপিআর প্রয়োগ কর।

- ৩০টি বক্ষ চাপ।
- জীবন রক্ষাকারী ২ টি ফুঁ

পর্যায়ক্রমে ৩০ চাপ ও ২ ফুঁ যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি নিজে নিজে শ্বাস নিতে শুরু করে অথবা হাসপাতালে পৌঁছায়।

চিত্র ১.৩ : শ্বাসনালী পরীক্ষা করার পদ্ধতি

- ব্যক্তির পাশে এসে বুক বরাবর বসতে হবে
- এক হাতের তালুর হিল বুকের মাঝ বরাবর বসাতে হবে
- তার উপর সবল হাত বসিয়ে আঙুলের মাধ্যমে আটকে দিতে হবে
- হাত সোজা রাখতে হবে এবং চাপ হবে কাধ থেকে
- নিচের দিকে খাড়াভাবে চাপ দিয়ে বুকের পাঁজর ২-২.৫ ইঞ্চি নিচে নামাতে হবে যাতে হৃদপিণ্ডের উপর চাপ পড়ে
- মিনিটে ১০০ - ১২০ গতিতে এভাবে ৩০ বার চাপ দিতে হবে
- ২টি জীবন রক্ষাকারী ফুঁ দিতে হবে
- হাসপাতালে পৌঁছানো পর্যন্ত এভাবে ৩০ বার চাপ ও ২ বার ফুঁ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্বাস চালু হওয়ার অথবা জ্ঞান ফেরত আসার লক্ষণ পাওয়া যায় যেমন কাশি দেওয়ার অথবা স্বাভাবিক শ্বাস নিতে শুরু করা।

১-১২ বছর বয়সের শিশুদের জন্য

শিশুর সাড়া দেওয়া পরীক্ষা কর

- শিশুর সাথে কথা বল, কাঁধে ও পায়ের পাতায় সামান্য চাপড় দাও। শিশু সাড়া দিচ্ছে কি? (না হলে)

শ্বাসনালি খুলে দাও, শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা কর

- মাথা পেছন দিকে টেনে থুতনি উপরের দিকে তুলে ধর
- শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা কর। শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস চালু আছে কি? (না হলে)

জীবন রক্ষাকারী ফুঁ

- মুখের ভেতরে কোনো কিছু থাকলে পরিষ্কার কর
- জীবন রক্ষাকারী প্রাথমিক ৫ টি ফুঁ দাও। শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস চালু আছে কি?

সিপিআর প্রয়োগ কর

- ৩০টি বক্ষ চাপ জীবন রক্ষাকারী ২ টি ফুঁ পর্যায়ক্রমে ৩০ বার চাপ ও ২ বার ফুঁ-যতক্ষণ পর্যন্ত শিশু নিজে নিজে শ্বাস নিতে শুরু করে অথবা হাসপাতালে পৌঁছায়।

ধাপ ৩ এরপর ২ বার জীবন রক্ষাকারী ফুঁ দিয়ে ৩০ বার চাপ দিতে হবে। এভাবে ৩০ বার চাপ এবং ২ বার ফুঁ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না হাসপাতালে পৌঁছানো যায় অথবা শ্বাস চালু হবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বয়স ভেদে সিপিআর ছক

বয়স	জীবন রক্ষাকারী ফুঁ	চাপ ও ফুঁ (প্রতি মিনিটে)	বক্ষ চাপ দেওয়ার পদ্ধতি	বক্ষ চাপের গভীরতা	বক্ষ চাপের গতি (প্রতি মিনিটে)
প্রাপ্ত বয়স্ক			২ হাতে	১.৫-২.৫ ইঞ্চি	
১-১২ বছরের শিশু	৫ ফুঁ	৩০ বার চাও ও ২ বার ফুঁ	১ হাতে (সবল হাত)	১-১.৫ ইঞ্চি	১০০-১২০
০-১২ মাস বয়সী শিশু			২ আঙ্গুলে	০.৫-১ ইঞ্চি	

রিকভারি পজিশন (Recovery Position)

প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পন্নের পর একজন আহত বা অসুস্থ ব্যক্তি পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত তাকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে শুইয়ে রাখা হয়। এই বিশেষ ভঙ্গিকে রিকভারি পজিশন বলা হয়। নিচে রিকভারি পজিশনের বিভিন্ন ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলো:

ধাপ ১: তুমি ব্যক্তির যে কোনো একপাশে হাঁটু গেড়ে বস। ঐ ব্যক্তির পকেট থেকে ভারি সামগ্রী যেমন-মোবাইল, চাবি, কলম সরিয়ে দাও।

ধাপ ২: ঐ ব্যক্তি চিৎ অবস্থায় থাকলে তার পা দু'টি সোজা করে দাও। ব্যক্তির যে হাতটি তোমার কাছাকাছি তা শরীর থেকে লম্ব অবস্থানে রাখ, হাতের তালু উপরের দিকে রাখ।

ধাপ ৩: ব্যক্তির যে হাতটি তোমার কাছ থেকে দূরে তা ধরে ব্যক্তির বুকের উপর দিয়ে আন এবং হাতের তালুর উল্টোদিক ব্যক্তির গালের নিচে রাখ। তোমার অপর হাত দিয়ে ব্যক্তির দূরের পায়ের হাঁটুর উপরে ধরুন এবং হাঁটু ভাজ করে পা-টি টেনে আন যতক্ষণ না পায়ের পাতা মাটির সমান্তরালে আসে।

ধাপ ৪: এবার ব্যক্তির হাত গালের নিচে রাখা অবস্থায় তুমি পায়ের যে স্থানে ধরেছ তা টেনে ব্যক্তির শরীরটি তোমার দিকে কাত করে দাও।

ধাপ ৫: যে পা-টি ধরে ব্যক্তিকে কাত করেছ এবার সে পা-টিকে কোমর ও হাঁটু থেকে লম্ব অবস্থানে রাখ।

ধাপ ৬: ব্যক্তির কপাল ও থুতনি ধরে মাথা পেছন দিকে কাত করে দাও। শ্বাসনালি খোলা অবস্থায় থাকবে।

ধাপ ৭: ব্যক্তিকে ১/২ ঘন্টা পর্যন্ত এ অবস্থায় রাখার পর পুনরায় একইভাবে অন্য পাশে রিকভারি পজিশনে রাখতে হবে।

ধাপ ৮: ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস, পাস এবং সাড়া দেওয়ার পর্যায় পরীক্ষা কর এবং প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা নাও।

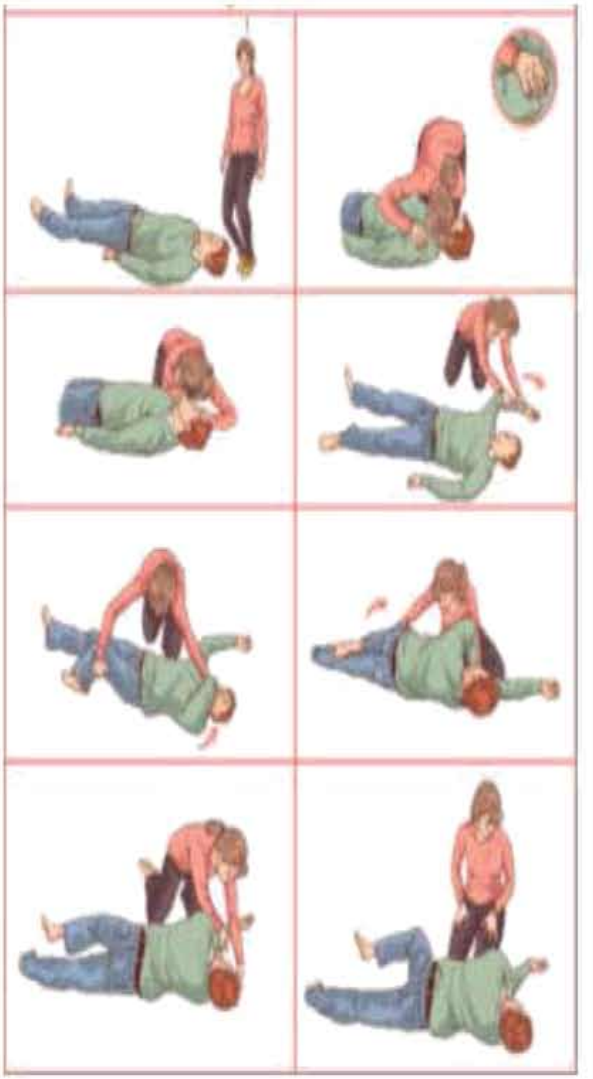

সাবধানতা

রিকভারি পজিশনে রাখার পূর্বে ব্যক্তির শরীরের আঘাত বা ক্ষত বিবেচনায় আনতে হবে। মেরুদন্ডের হাড়ে ব্যথা বা ভেঙ্গে যাওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে একাধিক সাহায্যকারীর সহায়তায় রিকভারি পজিশনে রাখতে হবে। এ বিষয়ে হাড় ভাঙ্গা অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১.২.৩ শক (Shock)

কোন কারণে শরীরে রক্ত সঞ্চালন বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে মস্তিষ্ক ও শরীরে প্রধান অঙ্গসমূহ অক্সিজেনের ঘাটতি হলে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা-ই শক (Shock) |

শকের কারণ

- মস্তিষ্ক রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া
- প্রচুর রক্তক্ষরণ
- শরীরে জলীয় পর্দার্থের ঘাটতি (যেমন- রক্তক্ষরণ, ডায়রিয়া, প্রচুর ঘাম, অত্যাধিক পুড়ে যাওয়া, প্রচুর বমি)।
- দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।
- মারাত্মক এলার্জি। এ ধরনের শককে এনাফাইলেকটিক শক বলে।
- মানসিক কারণ (ভয়, দুঃসংবাদ বা সুসংবাদ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি)।
- অতিরিক্ত বা ভুল ওষুধ সেবন।

শকের লক্ষণ

প্রাথমিক পর্যায়ে

- শারীরিক দুর্বলতা, প্রচুর ঘাম, দ্রুত ও দুর্বল পাল্স, শরীর ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে হওয়া।

শকে আক্রান্ত হবার পর

- ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া
- শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও দুর্বল
- শরীর ধূসর- নীল বর্ণ ধারণ
- বমি বমি ভাব অথবা বমি
- তৃষ্ণা বোধ করা
- চোখে ঝাপসা দেখা
- অস্থির হয়ে উঠা
- অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।
- শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদপিন্ড বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- শকের কারণ চিহ্নিত করে তার প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া।
- মস্তিষ্কসহ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহে রক্ত সরবরাহের উন্নয়ন ঘটানো। এতে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হবে।
- ব্যক্তি যাতে পুনরায় শকে না যায় সে দিকে খেয়াল রাখা।
- হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

চিত্র ১.৪: শক আক্রান্ত রোগীর পজিশনিং

প্রাথমিক চিকিৎসা

১) শকের কারণ সনাক্ত করে (যেমন- রক্তপাত বা পোড়া) সে অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসা দাও।

২) ব্যক্তিকে কম্বল, কাঁথা বা তোষকের উপর সমান্তরালভাবে শুইয়ে পা দু'টি উঁচু করে দিতে হবে। এতে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহের উন্নতি ঘটবে।

৩) প্রয়োজনে ব্যক্তিকে উষ্ণ রাখার জন্য কম্বল বা গরম কাপড় গায়ে দিতে হবে।

৪) ব্যক্তিকে নিরবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ি (পালস), সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি।

৫) পরিধেয় আঁটসাট কাপড় চোপড় ঢিলা করে দিতে হবে, যেমন- বেল্ট, জুতা, মোজা, কোট, টাই, শার্ট, ব্লাউজ ইত্যাদি। এতে রক্ত সঞ্চালনে সুবিধা হবে।

৬) খোলামেলা ও মুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) ব্যক্তির অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি হলে রিকভারি পজিশনে (আরামদায়ক অবস্থা) শুইয়ে দিতে হবে।

সাবধানতা

- ব্যক্তিকে একা রেখে কোথাও যাওয়া যাবে না।
- ব্যক্তিকে উষ্ণ রাখার জন্য সরাসরি তাপ প্রয়োগ করা যাবে না, যেমন গরম পানির বোতল ব্যবহার করা যাবে না।

- ব্যক্তিকে মুখে কোনো খাবার বা পানি দেওয়া যাবে না। কারণ চোকিং অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া পরবর্তীতে হাসপাতালে তাঁকে অজ্ঞান করে অস্ত্রোপাচারের প্রয়োজন হতে পারে। তবে যদি তিনি পানি পান করতে চান তাহলে কেবল ঠোঁট ভিজিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাঁর অবস্থা যদি পানি পান করার মত স্বাভাবিক থাকে তাহলে অল্প অল্প করে পানি দেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির মাথা একটু উঁচুতে রাখতে হবে।
- ব্যক্তি যদি পূর্ণ সময়ের গর্ভবতী হন তাহলে তাঁকে বা দিকে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে, তাতে তাঁর জরায়ু ও হৃদপিন্ডে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকতে সহায়ক হবে।
- যদি ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে শ্বাসনালি খুলে দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। প্রয়োজনে সিপিআর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১.২.৪ রক্তক্ষরণ (Bleeding)

একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শরীরে ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে। রক্তের বিবিধ কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে শরীরের সর্বত্র অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া। কোন কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মস্তিষ্ক অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হবে, ব্যক্তি শক অবস্থা থেকে অবশেষে মারা যেতে পারে। তাই প্রাথমিক চিকিৎসায় রক্তক্ষরণের ব্যবস্থাপনা একটি জরুরি বিষয়।

রক্তক্ষরণের প্রকারভেদ

১. বাহ্যিক রক্তক্ষরণ

২. অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ

দৃশ্যমানঃ চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ, নাক-কান-মুখ থেকে রক্তক্ষরণ, মল-মূত্র বমির সাথে রক্তক্ষরণ, যোনীপথ দিয়ে রক্তক্ষরণ ইত্যাদি।

অদৃশ্যমানঃ মস্তিষ্কের ভিতর রক্তপাত, প্যাল্পিক আলসার থেকে রক্তক্ষরণ ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
- শকের আশঙ্কা প্রতিরোধ করা
- সংক্রমণ প্রতিরোধ করা
- দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

চিত্র ১.৫: রক্তক্ষরণ বন্ধ করার পদ্ধতি

বাহ্যিক রক্তক্ষণের প্রাথমিক চিকিৎসা

১। প্রয়োজনে পরিহিত কাপড় কেটে সরিয়ে ফেলে ক্ষতস্থানটি ভালোভাবে দৃষ্টির মধ্যে আনুন।

২। ব্যক্তিকে একটি কম্বল বা তোষকের উপর শোয়াতে হবে, তাতে করে ব্যক্তির শরীরে মেঝের ঠান্ডা প্রতিরোধ করা যাবে। শক প্রতিরোধের জন্য ব্যক্তির পা মাথার তুলনায় উঁচুতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত কর।

৪। রক্তক্ষরণের স্থানটিকে উপরের দিকে রাখার জন্য প্রয়োজনে স্লিং ব্যবহার কর। পরবর্তীতে ব্যান্ডেজের স্থানে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক আছে কিনা তা প্রতি ১০ মিনিট পরপর পরীক্ষা কর। (এ ক্ষেত্রে ব্যান্ডেজের স্থানে নাড়ি বা পাল্স পরীক্ষা করতে হবে) ব্যান্ডেজটি সামান্য ঢিলা করে দাও। রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকবে।

৫। রক্তক্ষরণের স্থানটি সরাসরি চেপে ধর। রক্তক্ষরণের স্থানটির উপর একটি জীবাণুমুক্ত গজ বা প্যাড ব্যবহার করে আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধর। যদি জীবাণুমুক্ত গজ বা প্যাড পাওয়া যায় তাহলে ব্যক্তিকেই বল নিজের রক্তক্ষরণের স্থানটি চেপে ধরতে। রক্তক্ষরণের স্থানে যদি কোনো কিছু ঢুকে গিয়ে থাকে তাহলে বস্তুটিকে যথাস্থানে রেখে তার উভয় পাশে চাপ দিতে হবে।

৬। কাটা স্থানটি হৃদপিন্ডের তুলনায় উপরে উত্তোলন (হাত ও পায়ের ক্ষেত্রে) করতে হবে।

৭। রক্তক্ষরণ বন্ধ না হলে, প্রথম ব্যান্ডেজের উপর দ্বিতীয় আর একটি চাপ ব্যান্ডেজ প্রয়োগ কর। প্রয়োজনে তারপরও যদি রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয় তাহলে পূর্বের ব্যান্ডেজ না সরিয়ে পুনরায় চাপ ব্যান্ডেজ প্রয়োগ কর। লক্ষ্য রাখবে রক্তক্ষরণের সঠিক স্থানে যেন ব্যান্ডেজটি করা হয়।

৮। উপরোক্ত ব্যবস্থার পরও যদি রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয় তাহলে চাপ বিন্দুতে (Pressure point) চাপ প্রয়োগ করতে হবে (হাত ও পায়ের ক্ষেত্রে)।

প্রেসার পয়েন্ট বা চাপ বিন্দুতে চেপে ধরে হাত ও পায়ের রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যেতে পারে। রক্তক্ষরণের প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও যদি রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয় তখন চাপ বিন্দুতে চেপে ধরা যায়। হাতের চাপ বিন্দু হাতের উপরের অংশের ভেতর দিকের মাঝামাঝি। এখানে ব্রেকিয়াল আর্টারি বলে একটি ধমনি আছে পায়ের চাপ বিন্দু কুঁচকিতে। এখানে ফিমোরাল আর্টারি বলে একটি ধমনি আছে। মনে রাখতে হবে, চাপ বিন্দুতে অধিক সময় চাপ দিয়ে রাখা যাবে না। কারণ তাতে হাত বা পায়ের নিম্নাংশে রক্ত তথা অক্সিজেনের অভাব দেখা দিবে।

অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ: কখনো কখনো বাহ্যিক কোনো ক্ষত ছাড়াই হাড় ভাঙ্গা বা আঘাতের কারণে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো রোগে যেমন পাকস্থলির বা আলসার থেকে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হতে পারে। যদি ব্যক্তি বাহ্যিক কোনো আঘাত ছাড়াই শকে গিয়ে থাকে তাহলে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ সন্দেহ করা যেত পারে। সে ক্ষেতে ব্যক্তির মুখ, নাক, কান, প্রস্রাবের রাস্তা, যোনিপথ ও পায়ুপথে করতে হবে।

রক্তক্ষরণের স্থান	রক্তক্ষরণের প্রকৃতি	রক্তক্ষরণের মূল কারণ
মুখ	• উজ্জল লাল, ফেনাযুক্ত, কাশির সাথে রক্তক্ষরণ	ফুসফুস থেকে রক্তক্ষরণ

	• গাঢ় লাল, বমির সাথে রক্তক্ষরণ	পরিপাক তন্ত্রের রক্তক্ষরণ
কান	• তাজা, উজ্জল লাল রক্তক্ষরণ	কানের পর্দার ভেতর বা বাহির থেকে রক্তক্ষরণ
	• পানির ন্যায় পাতলা রক্তক্ষরণ	মাথায় আঘাতের কারণে মস্তিষ্ক থেকে রক্তক্ষরণ
নাক	• তাজা, উজ্জল, লাল, রক্তক্ষরণ	নাকের ভেতর থেকে রক্তক্ষরণ
	• পানির ন্যায় পাতলা রক্তক্ষরণ	মাথায় আঘাতের কারণে মস্তিষ্ক থেকে রক্তক্ষরণ
পায়ু পথ	• তাজা, উজ্জল লাল রক্তক্ষরণ	পাইলস (অর্শ), পায়ুপথে বা নিকটস্থ অন্ত্রে আঘাতের কারণে রক্তক্ষরণ
	• আলকাতরার ন্যায় কালো ও দুর্গন্ধযুক্ত রক্তক্ষরণ	পেপটিক আলসার বা অন্ত্রের কোনো রোগে বা আঘাত
প্রস্রাবের রাস্তা	• প্রস্রাবের সাথে রক্তক্ষরণ ও কখনো কখনো জমাট বাধা রক্ত যাওয়া	প্রস্রাবের থলি, নালি বা কিডনি থেকে রক্তক্ষরণ
যোনিপথ	• তাজা ও গাঢ় রক্তক্ষরণ	মাসিক বা গর্ভপাত বা গর্ভাবস্থা বা প্রসবোত্তর অবস্থা বা জোরপূর্বক যৌন ক্রিয়ার কারণে রক্তক্ষরণ

১.২.৫ ক্ষত (Wounds)

শরীরের চামড়া বা ত্বক এমনকি টিস্যু কেটে বা ছিঁড়ে গিয়ে জায়গাটির যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা'ই ক্ষত। কোনো কারণে আমাদের দেহে কোনো ক্ষত সৃষ্টি হলে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত কোষ এবং রক্তের একটি বিশেষ কণিকা, অনুচক্রিকা (Platelet) সম্মিলিতভাবে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জালিকা তৈরী করে। এই জালিকা রক্ত জমাট বাধতে সহায়তা করে। জমাট রক্তের মধ্য থেকে 'সিরাম' (Serum) নামক বিশেষ পদার্থ বেরিয়ে আসে। সিরামে জীবাণুনাশক গুণাবলি থাকার কারণে তা ক্ষত শুকাতে সাহায্য করে। অবশেষে ক্ষতের উপর একটি প্রতিরক্ষাকারী আবরণ (Scab) সৃষ্টি হয় যা ক্ষতটি সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

ক্ষতের প্রকারভেদ

ক্ষত প্রধানত দুই প্রকার- বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। ক্ষতের ধরনের উপর টিস্যু ক্ষতির পরিমাণ ও সংক্রমণের সম্ভাবনা নির্ভর করে।

প্রাথমিক চিকিৎসার লক্ষ্য

- রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
- ক্ষতকে জীবাণুমুক্ত করা
- পুনরায় আঘাত থেকে রক্ষা করা।

প্রাথমিক চিকিৎসা

ক্ষতকে পরিষ্কার করা, জীবাণুমুক্ত করা এবং অবস্থার আর যাতে অবনতি না হয় এমন ব্যবস্থাপনাকেই ক্ষতের পরিচর্যা বলে। ক্ষতের পরিচর্যার ধাপ দু'টি-ড্রেসিং ও ব্যান্ডেজ।

ড্রেসিং (Dressing)

ড্রেসিং হলো ক্ষতের উপরে সরাসরি ব্যবহৃত একটি আবরণ যা ক্ষতকে ঢেকে রাখে। ড্রেসিং জীবাণুমুক্ত, ক্ষতের চেয়ে বড়, নরম, পুরু এবং আরামদায়ক হতে হবে। ড্রেসিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষতকে জীবাণুমুক্ত রাখা।

ব্যান্ডেজ

ব্যান্ডেজ হলো ড্রেসিং এর সুরক্ষা। খেয়াল রাখতে হবে এমনভাবে ব্যান্ডেজ করতে হবে যাতে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে।

ড্রেসিং ও ব্যান্ডেজের উপরকরণ

- তুলা (Cotton ball)
- গজ (Gauge)
- পানি
- এন্টিসেপটিক সল্যুশন (Antiseptic Solution) যেমন- স্যাভলন (Savlon), ডেটল (Dettol)
- কিডনি ট্রে (Kidney tray)
- ফরসেপ (Forcep)
- হ্যান্ড গ্লাভ্স (Hand Gloves)
- রোলার ব্যান্ডেজ (Roller Bandage) সুতি, ক্রেপ
- ত্রিকোণাকার ব্যান্ডেজ (Triangular Bandage)
- লিউকোপ্লাস্ট বা এডহেসিভ ব্যান্ডেজ (Adhesive Bandage)
- গজ কাপড় (Gauze)
- কাঁচি (Scissor)
- সেফটি পিন (Safety pin)

চিত্র ১.৬ : ব্যান্ডেজ করার পদ্ধতি

ড্রেসিং এর সাধারণ নিয়মাবলি

ড্রেসিং ক্ষতের সংক্রমণ প্রতিরোধের পাশাপাশি রক্তক্ষরণ প্রতিরোধেও সহায়তা করে। একজন প্রাথমিক চিকিৎসক সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে জীবাণুমুক্ত ড্রেসিং ব্যবহার করবেন। বিকল্প হিসেবে পরিচ্ছন্ন কাপড় যা ক্ষতের সাথে আটকে যাবে না এমন কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। নিচে ড্রেসিংয়ের কিছু সাধারণ নিয়মাবলি উল্লেখ করা হলো-

- সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ক্ষতের পরিচর্যার জন্য ডিসপজেবল গ্লাভ্স পরিধান কর।
- ড্রেসিংয়ের আকার যেন ক্ষতস্থানের তুলনায় বড় হয়, যাতে করে ক্ষতস্থানটি পুরোপুরি ঢাকা পড়ার পরেও কিছুটা বাড়তি থাকে।
- সাবধানতার সাথে ড্রেসিং দিয়ে ক্ষতস্থানটি ঢেকে দিন যাতে তোমার হাত ক্ষতস্থানটি স্পর্শ না করে।
- ড্রেসিংটি সরাসরি ক্ষতস্থানের উপর স্থাপন কর এবং এক পাশ থেকে গড়িয়ে আনবে না।
- কোন ড্রেসিং ক্ষতস্থান থেকে সরে গেলে তা পরিবর্তন করে নতুন ড্রেসিং ব্যবহার কর।
- তোমার কাছে যদি শুধুমাত্র একটি জীবাণুমুক্ত ড্রেসিং থাকে তাহলে তা দিয়ে ক্ষতস্থানটি ঢেকে প্রয়োজনে তার উপর পরিচ্ছন্ন কাপড় ব্যবহার কর।
- একটি ড্রেসিং করার পর যদি তা রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে না পারে তাহলে তার উপর আরেকটি ড্রেসিং দাও। দু'টি ড্রেসিংয়ের পরও যদি রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয় তাহলে পুরোটাই সরিয়ে নিয়ে নতুন করে ড্রেসিং দিন। প্রয়োজনে প্রেসার পয়েন্ট চাপ দাও।
- ড্রেসিং সম্পন্নের পর সকল ক্লিনিক বর্জ নির্দিষ্ট ব্যাগে বা পাত্রে নিষ্কাশনের জন্য রাখ।

১.২.৬ পোড়া (Burn)

মানুষের শরীরের ত্বক যখন কোনো দাহ্য পদার্থ অর্থাৎ আগুন, যে কোনো উত্তপ্ত পদার্থ, যেমন উত্তপ্ত কোনো বস্তু, উত্তপ্ত কোনো তরল পদার্থ বা উত্তপ্ত বাষ্প, এসিডসহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে কোনো ক্ষতের সৃষ্টি করে তাকেই পুড়ে যাওয়া বা পোড়া বলে। পোড়ার প্রকৃতি ও গুরুত্ব নিরূপণ করা, পোড়ার কারণ, শরীরের কোন কোন জায়গা পুড়েছে, পোড়ার গভীরতা কতটুকু, ঘাসনালি পুড়েছে কিনা, আশেপাশের

কোনো সামগ্রী পোড়ার ফলে নির্গত কার্বন-মনো-অক্সাইড বা অন্য কোনো বিষাক্ত গ্যাস ব্যক্তি শ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছে কিনা ইত্যাদি বিষয় নিরূপণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির শরীরের বেশ খানিকটা জায়গা যদি পুড়ে থাকে তাহলে শরীর থেকে জলীয় পদার্থ বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক এবং এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি শকে যেতে পারে। হাতে ও পায়ে পোড়ার কারণে জলীয় পদার্থ জমে ফুলে উঠার সম্ভাবনা থাকে। প্রায় সকল ধরনের পোড়ার ক্ষেত্রেই যেহেতু সুরক্ষা ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই সংক্রমণের সম্ভাবনাও থাকে খুব বেশি।

পোড়ার মাত্রা সনাক্তকরণ

পোড়ার কারণে ত্বকের স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার উপর নির্ভর করে মাত্রা নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

প্রথম মাত্রার পোড়া (Superficial Burn) ত্বকের উপরের স্তর ইপিডারমিস পুড়ে থাকলে তাকে প্রথম মাত্রার পোড়া বলা হয়ে থাকে। লক্ষণ ও চিহ্ন • চামড়া ফুলে যাবে • চামড়া নরম হয়ে যাবে • চামড়ার উপরিভাগ লাল হয়ে যাবে। • প্রথম মাত্রার পোড়া প্রাথমিক চিকিৎসায় দ্রুত সেরে ওঠে।	
দ্বিতীয় মাত্রার পোড়া (Partial thickness burn) ইপিডারমিসহ ডারমিসের উপরিভাগ পোড়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে তার দ্বিতীয় মাত্রার পোড়া বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের পোড়ায় ব্যক্তি খুব ব্যথা অনুভব করে। শরীরের ১০-২০% দ্বিতীয় মাত্রার পোড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। লক্ষণ ও চিহ্ন • চামড়া নরম হয়ে যাবে • চামড়ার উপর ফোসকা পড়ে যাবে • দু-একটা ফোসকা ফেটেও যেতে পারে	
তৃতীয় মাত্রার পোড়া (Full thickness burn) পোড়ার কারণে ত্বকের ইপিডারমিস ও ডারমিস উভয় স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে তৃতীয় মাত্রার পোড়া বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় মাত্রার পোড়ায় ত্বকের গভীরে চর্বি, মাংসপেশি, রক্তনালি, স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। লক্ষণ ও চিহ্ন • গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হবে • চামড়া খুসর বর্ণের হবে • মাংসপেশি গলে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে	

প্রাথমিক চিকিৎসা

১। পোড়া স্থানে প্রচুর ঠান্ডা পানি ঢালুন। ব্যক্তি যে অবস্থায় আরাম পায় সে অবস্থায় রাখ কিন্তু লক্ষ্য রাখ যাতে পোড়া স্থান কোনভাবেই মাটির সংস্পর্শে না আসে।

২। হাসপাতালে প্রেরণের জন্য যোগাযোগ কর। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উপস্থিত কাউকে এ কাজটি করতে বল।

৩। পোড়া স্থানটিতে কমপক্ষে ১০ মিনিট ঠান্ডা পানি ঢালুন। ব্যথা না কমা পর্যন্ত ঠান্ডা পানি ঢালা যাবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে অতিরিক্ত ঠান্ডাপানি ঢালার কারণে শরীরের তাপমাত্রা যেন স্বাভাবিকের চাইতে কমে না যায়। শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন অবস্থা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

৪। পোড়া স্থানটিতে হাত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এমনকি পোড়া স্থানে আটকে থাকা কাপড়ও তুলে ফেলার প্রয়োজন নেই। পোড়া স্থানের আশেপাশের কাপড়, বেল্ট, জুতা,মোজা, আংটি, ঘড়ি খুলে ফেলুন। তা না হলে পোড়া স্থান ফুলে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

৫। পোড়া স্থানটি ঠান্ডা হয়ে এলে একটি পরিষ্কার প্লাস্টিক ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন। প্লাস্টিক ব্যাগটি যথাস্থানে রাখার ফলে ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা যাবে। তবে ব্যান্ডেজটি যেন কোনভাবেই পোড়া স্থানকে স্পর্শ না করে।

৬। ব্যক্তিকে আশ্বস্ত কর। প্রয়োজনে শকের প্রাথমিক চিকিৎসা দাও। মনিটর কর শ্বাস-প্রশ্বাস, পালস এবং সাড়া দেওয়ার পর্যায়।

সাবধানতা

- পোড়া স্থানে আটকে থাকা পরিধেয় কাপড় বা অলঙ্কার টেনে তোলার প্রয়োজন নেই। তা করলে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কাপড়ের চারপাশ দিয়ে কেটে দেওয়া যেতে পারে।
- কোন ফোসকা গলানোর প্রয়োজন নেই।
- কোন প্রকার লোশন, অয়েন্টমেন্ট বা অন্য কোন ওষুধ পোড়া স্থানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনকি বাজারে পাওয়া যায় এমন কোন স্প্রে, বিশেষ ড্রেসিং বা জেল দেওয়ার প্রাথমিক চিকিৎসার আওতাভুক্ত নয়। তাতেও সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- আঠাযুক্ত টেপ ব্যবহার করা যাবে না।
- মুখমন্ডল পুড়ে গেলে তাতে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তা করলে অসাবধানতাবশত ব্যক্তির শ্বাস **রোধ** হতে পারে।

১৪.২.৮ ফিট, মূর্ছা যাওয়া ও অজ্ঞান হওয়া: (Fit, Fainting and Unconsciousness)

ফিট (Fit) কি

কোন ব্যক্তির যখন কোনো কারণে খিচুনি অর্থাৎ মাংসপেশির সংকোচন-প্রসারণ হয় সে অবস্থাকে ফিট বলে। উল্লেখ্য যে, এই ফিট ২-৩ মিনিটের মধ্যে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। ফিটকে মেডিক্যালের ভাষায় Seizure বা Convulsion বলা হয়ে থাকে।

ফিটের কারণ

মানব দেহের মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ তরঙ্গের মাধ্যমে কাজ করে। কোনো কারণে এই বিদ্যুৎ তরঙ্গে অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে ফিট অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

- ইপিলেপসি বা মৃগী রোগ (Epilepsy)
- মাথায় আঘাত বা মস্তিষ্কের সংক্রমণ (মেনাওজাইটিস/Meningitis), অত্যধিক জ্বর
- মস্তিষ্কের কোন রোগ
- মস্তিষ্কে অক্সিজেন বা গ্লুকোজের ঘাটতি

- মদ বা মাদকের প্রভাব
- গর্ভকালীন বা প্রসবের পর জটিলতা (একলাম্পসিয়া/ **eclampsia**) হিস্টেরিয়া

ফিটের লক্ষণ

- মুখ থেকে ফেনা বের হওয়া। জিভে কামড় লাগলে রক্তাভ ফেনা বের হতে পারে ।
- শরীর ঝাকানো, মোচড়ানো এবং ছটফট করা।
- ঠোঁট ও মুখ নীলাভ বর্ণ ধারণ।
- চোখের মণি অস্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করা ।
- শরীরের তাপমাত্রা পরিবর্তন ।
- শরীর শক্ত হয়ে পেছনের দিকে উল্টানো ।
- কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
- দাঁত লেগে যাওয়া।
- মল-মূত্র ত্যাগ করতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- ব্যক্তিকে খিচুনির সময় কোনো প্রকার আঘাত থেকে রক্ষা করা।
- সচেতন হওয়ার পরও ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

ফিটে আক্রান্ত শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসা

শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত অতিরিক্ত জ্বরের সাথে গলা বা কান বা অন্য কোনো প্রকার সংক্রমণ থাকার কারণে ফিট হয়ে থাকে। অত্যধিক তাপমাত্রার কারণে মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ তরঙ্গের তারতম্য দেখা দেয় এবং ফলশ্রুতিতে ফিট হয়ে থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে শিশুদের ফিটের জটিলতা প্রশমন করা যায়। তবে শিশুদের সকল ফিটের ক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

- শিশুর মাথা, ঘাড় ও শরীরের চারপাশে প্যাড দেওয়ার ব্যবস্থা কর। এতে আঘাত প্রতিররোধ করা সম্ভব হবে। খিচুনির সময় চেপে ধরা যাবে না।
- শিশুর যদি জ্বর থাকে তাহলে তাপমাত্রা স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা নাও। খিচুনির সময় নয়, খিঁচুনি বন্ধ হয়ে যাবার পর তাপমাত্রা স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা নাও। লক্ষ্য রাখতে হবে তাপমাত্রা যেন স্বাভাবিকের চাইতে কমে না যায়।
- খিচুনি বন্ধ হয়ে গেলে রিকভারি অবস্থায় রাখ।
- শিশুর পিতা-মাতাকে আশ্বস্ত কর। মনিটর কর- শ্বাস চলাচল, পাস এবং সাড়া দেওয়ার পর্যায়। হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা নাও।

ফিটের ক্ষেত্রে কখন হাসপাতালে প্রেরণ জরুরি?

- ব্যক্তির ঘনঘন খিঁচুনি হলে
- ব্যক্তির জীবনে এটাই প্রথম খিঁচুনি হলে

- ব্যক্তি খিঁচুনি সম্পর্কে কোন কারণ উল্লেখ করতে না পারলে
- ৫ মিনিটের বেশি সময় ধরে খিঁচুনি হলে
- ১০ মিনিটের অধিক সময় ধরে অচেতন থাকলে

সাবধানতা

- জোর করে হাত পা চেপে ধরে খিঁচুনি বন্ধের চেষ্টা করা যাবে না।
- মুখে কোন খাবার বা পানীয় দেওয়া যাবে না।

মূর্ছা (Fainting) কি

কোন ব্যক্তির অল্প সময়ের (২-৩ মিনিট) জন্য সচেতনতা বোধ কমে যাওয়া এবং কিছু সময় পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা, আবার একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে পারে এ রকম অবস্থাকে মূর্ছা বলে।

মূর্ছার কারণ

- প্রধানত সাময়িকভাবে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হলে কোন ব্যক্তি মূর্ছা যায়।
- শরীরে জলীয় পদার্থের ঘাটতি, যেমন- রক্তক্ষরণ, ডায়রিয়া, প্রচুর ঘাম, অত্যধিক পুড়ে যাওয়া, প্রচুর বমি - দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।
- মারাত্মক এলার্জি
- মানসিক কারণ, যেমন- ভয়, দুঃসংবাদ বা সুসংবাদ, দুশ্চিন্তা
- অতিরিক্ত বা ভুল ওষুধ সেবন
- অপুষ্টি।

মূর্ছার লক্ষণ

- শারীরিক দুর্বলতা, প্রচুর ঘাম, পালস দ্রুত ও দুর্বল, শরীর ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে হওয়া
- শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও দুর্বল
- শরীর ধূসর-নীল বর্ণ ধারণ করা
- বমি বমি ভাব অথবা বমি
- তৃষ্ণা বোধ করা
- চোখে ঝাপসা দেখা
- অস্থির হয়ে উঠা
- অজ্ঞান হওয়া
- শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা: ব্যক্তিকে সমান্তরালভাবে শুইয়ে পা দু'টি উঁচু করে দিতে হবে। এতে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহের উন্নয়ন ঘটবে।

- ঠান্ডা প্রতিরোধে ব্যক্তিকে মাদুর, চাদর বা কম্বলের উপর রাখা।
- ব্যক্তিকে উষ্ণ রাখার জন্য গায়ে চাদর বা কম্বল জড়িয়ে দেওয়া

- নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ করতে হবে, বিশেষ করে শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ি বা পালস, সাড়া দেওয়ার পর্যায়।
- জামা কাপড় ঢিলা করে দিতে হবে, তাতে রক্ত সঞ্চালনে সুবিধা হবে।
- মুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ব্যক্তির অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- অবস্থার উন্নতি হলে রিকভারি পজিশনে (আরামদায়ক অবস্থায়) শুইয়ে দিতে হবে।

অজ্ঞান (Unconsciousness)

কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য অচেতন হয়ে যায় এবং কোন প্রকারের সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। তবে সে অবস্থাকে অজ্ঞান বলে। ব্যক্তির অজ্ঞান অবস্থা কোন পর্যায়ে আছে তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার সচেতনতা পর্যবেক্ষণ। করতে হবে। নিচে সচেতনতার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো উল্লেখ্য যে, সচেতনতা পর্যবেক্ষণের পূর্বে শ্বাসনালি পরিষ্কার ও খোলা আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। অঠচট কোড ব্যবহার করে সচেতনতার পর্যায় বোঝা যাবে।

চিত্র ১.৭ :অজ্ঞান রোগীর পজিশনিং

অজ্ঞান ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা

- শ্বাসনালি খুলে দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করতে হবে।
- শ্বাস বন্ধ থাকলে কৃত্রিম শ্বাস দিয়ে প্রয়োজনে সিপিআর শুরু করতে হবে।
- শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকলে ব্যক্তির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং নোট লিখতে হবে।
- প্রয়োজনে ব্যক্তিকে জরুরিভাবে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ব্যক্তির অসুস্থতার কারণ হিসেবে কোন তথ্য জানতে পারলে তা চিকিৎসকের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা কর।

সাবধানতা

- অজ্ঞান ব্যক্তির মুখে খাবার বা পানীয় দেওয়া যাবে না।
- অযথা অজ্ঞান ব্যক্তিকে নড়াচড়া করা যাবে না।
- ব্যক্তিকে একা রেখে যাওয়া যাবে না।
- যদি ৩ মিনিটের মধ্যে ব্যক্তির জ্ঞান না ফেরে তবে দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- যদি ৩ মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসে তাহলে ব্যক্তিকে রিকভারি পজিশনে রাখতে হবে, তবে তাঁকে চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হবে।

১৪.২.৯ বিষক্রিয়া (Poisoning)

মানুষের শরীরে বিষ বা অন্য কোন পদার্থ যদি এমন পরিমাণে প্রবেশ করে যে তা ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি করে তাকে বিষক্রিয়া বলে। বিষক্রিয়ার প্রভাব স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি উভয় ধরনেরই হতে পারে।

বিষক্রিয়ার ধরণ

- খেয়ে ফেলা বা পান করার মাধ্যমে
- স্পর্শের মাধ্যমে (ত্বকের মাধ্যমে)
- শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে
- ইনজেকশনের মাধ্যমে

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

- বমি, ডায়রিয়া
- মুখসহ ঠোটের চারপাশে পুড়ে যাওয়া
- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা
- শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া
- শরীরের তাপমাত্র কমে যাওয়া
- পেট ব্যথা, শরীর ও ঠোটের বর্ণ ধূসর-নীলচে হওয়া
- অস্থিরতা, মুখ দিয়ে ফেনা বের হওয়া, খিচুনি

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- বিষক্রিয়ার কারণ চিহ্নিত করা
- যদি বিষ পান করে থাকে তবে তা দাহ্য জাতীয় কিনা নির্ণয় করা
- ব্যক্তি অজ্ঞান না সজ্ঞান সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া

এক নজরে বিষক্রিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসার ছক:

প্রবেশ পথ	বিষের ধরন	লক্ষণ	করণীয়
খেয়ে ফেলা বা পান করার মাধ্যমে	• ওষুধ ও এলকোহল • পরিষ্কার করার রাসায়নিক • বাগানে ব্যবহৃত রাসায়নিক • উদ্ভিদের বিষাক্ত দ্রব্য • খাদ্যে বিষক্রিয়া/ফুড পয়জনিং	• বমিভাব ও বমি • পেট ব্যথা • খিচুনি • অনিয়মিত দ্রুত বা ধীর - হৃদস্পন্দন • চেতনা লোপ পাওয়া	• ব্যক্তি ও পরিস্থিতি যাচাই করা • প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান • হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা • প্রয়োজনে সিপিআর প্রয়োগ করা • যদি কৃত্রিম শ্বাস দিতে হয় তাহলে মাস্ক ব্যবহার করা

ত্বকের মাধ্যমে	• পরিষ্কার করার রাসায়নিক • বাগানে ব্যবহৃত রাসায়নিক • কারখানার রাসায়নিক দ্রব্য • উদ্ভিদের বিষাক্ত দ্রব্য	• ব্যথা • ফুলে যাওয়া • ত্বক লালচে হয়ে যাওয়া • চুলকানি	• পরিধেয় কাপড়ে বিষ লেগে থাকার-সন্দেহ থাকলে তা খুলে ফেলা • ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে ২০ মিনিট পর্যন্ত ঠান্ডা পানি ঢালা • হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা • প্রয়োজনে সিপিআর প্রয়োগ করা
শ্বাসের মাধ্যমে	• পরিষ্কার করার রাসায়নিক • কারখানার রাসায়নিক দ্রব্য • আগুনের ধোঁয়া	• শ্বাস কষ্ট • অক্সিজেন কমে যাওয়া • ত্বক কালচে বর্ণ ধারণ করা	• মুক্ত বাতাসে রাখা • হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা • প্রয়োজনে সিপিআর প্রয়োগ করা।
অন্ত:ক্ষেপণ	• পোকা-মাকড় ও জীব জন্তুর হুল ফোটানো ও কামড় • ওষুধ	• ব্যথা, লালচে হয়ে ফুলে যাওয়া • ঝাপসা দেখা • বমিভাব ও বমি • শ্বাস কষ্ট • খিঁচুনি • অজ্ঞান হয়ে যাওয়া • শক	• হুল ফুটানো ও কামড়ের ক্ষেত্রে হুল তুলে ফেলা • হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা • প্রয়োজনে সিপিআর প্রয়োগ করা • ওষুধের ক্ষেত্রে ইনজেকশন দেওয়া • হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে সিপিআর প্রয়োগ করা

সাবধানতা

- এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।
- ব্যক্তিকে একা রেখে যাওয়া যাবে না ।
- ব্যক্তিকে নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে
- ব্যক্তিকে উষ্ণ রাখার জন্য সরাসরি তাপ দেওয়া যাবে না।

১.২.৭ কামড় (Bites)

বাংলাদেশে প্রতি বছর সাপের কামড়ে অনেক মানুষ মারা যায়। সব সাপ বিষধর নয়। সাপের কামড়ে আমাদের দেশের প্রচলিত চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত নয়। সাপে কামড়ালে হাসপাতালে নিতে হবে; ওঝা বা গ্রাম্য কবিরাজ এদের কাছে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। কুকুরের কামড় থেকে জলাতঙ্ক রোগ হয়েও অনেক মানুষ মারা যায়। জলাতঙ্ক একটি প্রাণঘাতী রোগ। যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে এ রোগটি প্রতিরোধ সম্ভব। এছাড়া আমাদের দেশে আছে নানা ধরনের পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গ। একজন প্রাথমিক চিকিৎসক হিসেবে এ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা থাকা জরুরি।

বিভিন্ন ধরনের পোকা মাকড়

- মৌমাচি, বোলতা, ভিমরুল, বিছা, গান্ধি পোকা, বিষ পিঁপড়া, মাকড়শা, কাঁকড়া। এছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের পোকা-মাকড়ের কামড়ে মানুষ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু ও পোকা-মাকড়, স্পর্শ এবং হুল ফোটানোর প্রতিক্রিয়া:

- ব্যথা, এলার্জি, চুলকানি, ফুলে যাওয়া, ফোসকা পড়া, জ্বর, রোগ সংক্রমণ, শ্বাসকষ্ট, শক।
- সময়মতো পরিচর্যা না করলে ত্বকে জটিলতা দেখা দিতে পারে, মারাত্মক অবস্থা ধারণ করে মৃত্যুও হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- কামড়ের স্থান সেভলন পানি অথবা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। ক্ষত থাকলে তা গজ বা পাতলা শুকনো কাপড় দিয়ে জড়িয়ে হাসপাতালে নিতে হবে।
- হুল ফোটার ক্ষেত্রে, হলের পরিমাণ যদি অল্প সংখ্যক ও দৃশ্যমান হয় তাহলে তা তুলে উপরোক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। হুল তোলার জন্য ফরসেপ ব্যবহার না করা ভালো। ফরসেপ দিয়ে হুল চেপে ধরার কারণে হলের ভেতরের অবশিষ্ট বিষ শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই আইডি কার্ড বা পাতলা অথচ শক্ত কিছু দিয়ে এক পাশ থেকে ঘর্ষণের মতো করে হুল তোলা যেতে পারে।
- জ্বালা পোড়া ও ব্যথা কমানোর ক্ষেত্রে সুতি কাপড়ে বরফ জড়িয়ে আলতো ম্যাসেজ করা যেতে পারে।
- মনিটর করা- এলার্জিজনিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পাচ্ছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখা । যেমন শ্বাসনালিতে শব্দ, ত্বক লালচে হয়ে ফুলে ওঠা, চুলকানী। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি ঠান্ডা পানি পান করতে পারে অথবা বরফ চুষতে পারে তা দেওয়া যাবে।

সাবধানতা

- এলার্জির কারণে যদি ব্যক্তির মুখমন্ডল ফুলে ওঠে, শ্বাস কষ্ট দেখা দেয় তাহলে ঠান্ডা পানি পান করতে দিতে হবে। অসুবিধা বেশি হলে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

১.২.৮ হাড় ভাঙ্গা (Bone Fracture)

হাড় ভাঙ্গা দুই প্রকার-

- উন্মুক্ত হাড় ভাঙ্গা **(Open Fracture) :** হাড় ভেঙ্গে চামড়া ভেদ করে হাড়ের অংশবিশেষ বাইরে বেরিয়ে আসে। কখনো কখনো এ স্থানটিতে একটি ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং উন্মুক্ত হওয়ার কারণে সংক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা থাকে।
- আবদ্ধ হাড় ভাঙ্গা **(Closed Fracture):** কোন ব্যক্তির হাড় ভেঙ্গে যদি শরীরের ভেতরেই অবস্থান করে এবং বাইরে বেরিয়ে না আসে তবে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং ঐ ব্যক্তি শকে যেতে পারে। কখনো কখনো হাড় অসম্পুর্নভাবে ভেঙ্গে থাকে। এ ক্ষেত্রে টুকরো দু'টি বা টুকরোগুলো পুরোপুরি পৃথক না হয়ে জায়গা মতোই অবস্থান করে। এ অবস্থাকে স্থিতিশীল ভাঙ্গা বা Stable

fracture বলে। হাতের কব্জি বা রিষ্ট, কাঁধ বা সোলডার পায়ের এঙ্কেল ও কোমর বা হিপে স্থিতিশীল ভাঙ্গা লক্ষ্য করা যায়। এসব ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী রক্তনালি, স্নায়ু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। প্রাথমিক চিকিৎসার সময় ব্যক্তিকে বেশি নাড়াচাড়া করালে অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে। ঠিক এর বিপরীত অবস্থা, যখন কোন হাড় সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে টুকরো দুটি বা টুকরোগুলো পুরোপুরি পৃথক হয়ে যায় তাকে অস্থিতিশীল ভাঙ্গা বা Unstable fracture বলে। এসব ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী রক্তনালি, স্নায়ু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রেও একজন প্রাথমিক চিকিৎসককে অত্যন্ত যত্ন সহকারে সীমিত নড়াচড়ার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

উন্মুক্ত হাড় ভাঙ্গার প্রাথমিক চিকিৎসা

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- রক্তক্ষরণ, নড়াচড়া এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ করা।
- অনড় অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তর করা।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য জীবাণুমুক্ত ড্রেসিং বা প্যাড দিয়ে ক্ষতস্থানটি চেপে ধর। লক্ষ্য রাখতে হবে বেরিয়ে আসা হাড়ের উপর চাপ প্রয়োগ করা যাবে না।
- প্রয়োজনে পূর্বের ড্রেসিং এর উপর আরেকটি ড্রেসিং স্থাপন কর। ড্রেসিংটিকে যথাস্থানে রাখার জন্য ব্যান্ডেজ বাধ। ব্যান্ডেজ বাধা যেন খুব বেশি শক্ত না হয়। রক্ত চলাচল পরীক্ষা কর।
- ভাঙ্গা স্থানটিকে অনড় কর। হাতের জন্য স্লিং ব্যবহার কর। পায়ের জন্য সুস্থ পা ভাঙ্গা পায়ের কাছে এনে নেরো বা ব্রড-ফোল্ড ব্যান্ডেজ ব্যবহার কর। মনে রাখতে হবে ব্যান্ডেজের সকল গিরা সুস্থ পায়ের উপর দিতে হবে।
- প্রয়োজনে শকের প্রাথমিক চিকিৎসা দিন। ভাঙ্গা পা উপরে তোলার প্রয়োজন নেই। মনিটর কর-শ্বাস চলাচল, পালস, সাড়া দেওয়ার পর্যায়।
- ভাঙ্গা হাত / পায়ের ব্যান্ডেজ অবস্থানের নিচে প্রতি ১০ মিনিট পরপর রক্ত চলাচল পরীক্ষা কর। রক্ত চলাচল ব্যাহত হলে ব্যান্ডেজটি ঢিলা করে দাও।
- ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা কর।

সাবধানতা

- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পন্ন করার আগে স্থানান্তর করবে না । এ ব্যক্তিকে কোনো প্রকার পানীয় বা খাবার দিবে না। হাসপাতালে ব্যক্তিকে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হতে পারে।
- ড্রেসিং বা ব্যান্ডেজ করার সময় বেরিয়ে আসা হাড়ের উপর চাপ প্রয়োগ করবে না।

আবদ্ধ হাড় ভাঙ্গার প্রাথমিক চিকিৎসা

প্রাথমিক চিকিৎসার লক্ষ্য

- ভাঙ্গা স্থানটি প্রথমে চিহ্নিত করা
- ভাঙ্গা স্থানটির অবনতি হতে না দেওয়া
- ভাঙ্গা স্থানটির উপর যাতে চাপ না পড়ে সে ব্যবস্থা করা
- ভাঙ্গা স্থানের নড়াচড়া প্রতিরোধ করা
- ব্যক্তি যাতে ব্যথা না পায় সে দিকে খেয়াল রেখে হাসপাতালে প্রেরণ করা।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- ব্যক্তিকে নড়াচড়া না করে স্থির হয়ে থাকতে বলবে। তোমার সঙ্গীকে ভেঙ্গে যাওয়ার উপরের ও নিচের জয়েন্ট হালকাভাবে চেপে ধরতে বল।
- ভাঙ্গা স্থানটিকে অনড় কর। প্রয়োজনে ভাঙ্গা স্থানের সুরক্ষার জন্য প্যাড ব্যবহার। হাতের জন্য স্লিং ব্যবহার কর পায়ের জন্য সুস্থ পা ভাঙ্গা পায়ের কাছে এনে নেরো বা ব্রড-ফোল্ড ব্যান্ডেজ ব্যবহার কর। মনে রাখতে হবে ব্যান্ডেজের সকল গিরা সুস্থ পায়ের উপর দিতে হবে।
- প্রয়োজনে শকের প্রাথমিক চিকিৎসা দাও। ভাঙ্গা পা উপরে তোলার প্রয়োজন নেই। মনিটর কর- শ্বাস চলাচল, পাল্স, সাড়া দেওয়া পর্যায়।
- হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা কর।
- ভাঙ্গা হাত পায়ের ব্যান্ডেজ অবস্থানের নিচে নেরো বা ব্রড-ফোল্ড ব্যান্ডেজ ব্যবহার কর। প্রতি ১০ মিনিট পরপর রক্ত চলাচল পরীক্ষা কর। রক্ত চলাচল ব্যাহত হলে ব্যান্ডেজটি ঢিলা করে দাও।

সাবধানতা

- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পন্ন করার আগে স্থানান্তর করবে না।
- ব্যক্তিকে কোনো প্রকার পানীয় বা খাবার দিবেন না। হাসপাতালে ব্যক্তিকে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হতে পারে।

অনড়করণের উপকরণ

- ত্রিকোণাকৃতি ব্যান্ডেজ (Traingular bandage)
- ক্রেপ ব্যান্ডেজ (Crepe bandage)
- সেইফটি পিন (Safety pin)
- নরম প্যাড (Soft pad)
- চটি (Splint)- শক্ত সোজা, নরম বাকানো

১.২.৯ সন্ধিস্থল থেকে হাড় স্থানচ্যুত হওয়া (Dislocation)

কখনো কখনো মারাত্মক আঘাত, পড়ে গিয়ে বা অস্বাভাবিক টানের ফলে জয়েন্ট থেকে হাড় সরে যেতে পারে। এ ধরনের সরে যাওয়া সাধারণত কাধের জয়েন্ট (সোল্ডার জয়েন্ট), হাঁটু, চোয়াল, আঙ্গুল এবং মেরুদন্ডের জয়েন্টে ঘটে থাকে। এ অবস্থায় খুব ব্যথা থাকে এবং জয়েন্টের আশেপাশের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ অবশ বা প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে। হাড় সরে যাওয়ার সাথে কখনো কখনো হাড় ভেঙ্গেও যেতে পারে। হাড় সরে যাওয়া এবং ভাঙ্গা নির্ণয় করতে একজন প্রাথমিক চিকিৎসকের অসুবিধা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিষয়টিকে হাড় ভেঙ্গে যাওয়া হিসেবে বিবেচনা করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে।

লক্ষণ

- প্রচন্ড ব্যথা
- জয়েন্টটি নাড়াতে পারবে না
- জয়েন্টেটি ফুলে যাবে এবং কালচে হয়ে যেতে পারে
- স্থানটিকে অস্বাভাবিক দেখাবে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটির নড়াচড়া রোধ করা
- যথাযথ প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে প্রেরণ।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- ব্যক্তিকে স্থির থাকতে বল। ব্যক্তি যে অবস্থায় আরামবোধ করেন, সে অবস্থায় থাকতে বল।
- হাতের জন্য ফিক্সিং এবং পায়ের জন্য ব্রড-ফোল্ড ব্যবহার করে অনড় কর। প্রয়োজনে প্যাড ব্যবহার করবে এবং হাতের ক্ষেত্রেও ব্রড-ফোল্ড ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা যাবে।
- হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা কর। প্রয়োজনে শকের প্রাথমিক চিকিৎসা দাও।
- ব্যান্ডেজের নিচে কোনো স্থানে প্রতি ১০ মিনিট পরপর রক্ত চলাচল পরীক্ষা কর। প্রয়োজনে ব্যান্ডেজ টিলা করে দিন। মনিটর কর- শ্বাস-প্রশ্বাস, পাল্স সাড়া দেওয়ার পর্যায়।

সাবধানতা

- সরে যাওয়া হাড় টিকে যথাস্থানে বসানোর চেষ্টা করবে না। আরো বেশি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পন্ন করার আগে স্থানান্তর করবে না।
- হাতের হাড় সরে গেলে আংটি, ঘড়ি, চুড়ি খুলে ফেলুন। তা না হলে অংশটি ফুলে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।
- ব্যক্তিকে কোনো প্রকার পানীয় বা খাবার দিবে না। হাসপাতালে ব্যক্তিকে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হতে পারে।

১.২.১০ মচকানো (Sprain)

কোনো সন্ধিস্থলের হাড়ের চারপাশের নরম গঠনের উপর যদি হঠাৎ সজোরে কোনো আঘাত, ধাক্কা বা চাপ লাগে তবে ঐ স্থানের লিগামেন্ট, টেন্ডন ও মাংসপেশির ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে, এ অবস্থাকে মচকানো বলে। এ ধরনের আঘাত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খেলাধূলার সময় লক্ষ করা যায়। সহজে মনে রাখার জন্য Rice শব্দটি ব্যবহার করে মচকানোর প্রাথমিক চিকিৎসা করা যায়-

- R = Rest the injured part, আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটিকে অনড় রাখা।
- I = Apply Ice pack or cold pad, বরফ বা ঠান্ডা পানির সেঁক দেওয়া।
- C = Provide Comfortable support, আরামদায়ক ব্যবস্থা করা।
- E = Elevate the injured part, আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটিকে উঁচুতে রাখা।

সাবধানতা

- মুখে কোনো খাবার বা পানীয় না দেওয়া। কারণ ভাঙ্গা স্থানে অপারেশনের জন্য ব্যক্তিকে অজ্ঞান করা প্রয়োজন হতে পারে।
- ভাঙ্গা স্থানটি যথাসম্ভব নড়াচড়া না করে ব্যান্ডেজ বাধা।
- উন্মুক্ত হাড় ভাঙ্গায় রক্তক্ষরণ হলে, আগে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে তারপর ভাঙ্গা স্থানটি অনড় করা।
- কোমর ও পায়ের হাড় ভাঙ্গার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে দাঁড়াতে না দেওয়া।

- ব্যক্তি শকপ্রাপ্ত হলে, শকের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া। তবে কোমর ও পায়ের হাড় ভাঙ্গার ক্ষেত্রে পা উপরে উত্তোলন করা যাবে না।
- ব্যক্তিকে ব্যান্ডেজ বাধা ও পরিবহনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে আরামদায়ক অবস্থায় থাকে।

মেরুদন্ডে আঘাত বা হাড় ভেঙ্গে যাওয়া (Spinal injury/Fracture)

মানব দেহের **মেরুদন্ডে মোট** ৩৩টি হাড় আছে। প্রতি দু'টি হাড়ের মাঝে আছে ডিস্ক নামক এক ধরনের টিস্যু। হাড়গুলো মাংসপেশি ও লিগামেন্ট দ্বারা সংযুক্ত ও সুরক্ষিত থাকে। হাড়ের মাঝের ছিদ্র দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে নিতম্ব পর্যন্ত মেরুরজ্জু অবস্থান করে। মেরুরজ্জু থেকে **স্নায়ু** বেরিয়ে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে। **মেরুদন্ডের** হাড়ে আঘাত, হাড় ভেঙ্গে যাওয়া এবং মেরুরজ্জুতে আঘাত অত্যন্ত মারাত্মক। এ সকল ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মেরুদন্ডে আঘাত বা হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার কতিপয় কারণ

- উচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া
- পিঠে সজোরে আঘাত
- মটোর সাইকেল দুর্ঘটনা।
- লক্ষণ -ঘাড়ে বা পিঠে ব্যথা
- **মেরুদন্ডের** স্বাভাবিক বক্রতা পরিবর্তিত হওয়া।
- মেরুরজ্জু আঘাতপ্রাপ্ত হলে-হাত পায়ের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যাবে, অনুভুতি কমে যাবে বা জ্বলে যাওয়ার মতো অনুভতি হতে পারে, হাত পা শক্ত হয়ে যাওয়ার মতো অনুভূতি হতে পারে। মলমূত্র ত্যাগ করতে পারে। শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে।

মেরুদন্ডে আঘাত/হাড় ভেঙ্গে যাওয়া সজ্ঞান ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- আঘাতের সুরক্ষা করা
- জরুরিভাবে হাসপাতালে প্রেরণ।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- ব্যক্তিকে আশ্বস্ত কর
- হাসপাতালে প্রেরণের লক্ষ্যে যোগাযোগ সম্পন্ন কর
- ব্যক্তির মাথার পেছনে হাঁটু গেড়ে কনুই মেঝেতে রেখে বসুন। দুই হাতের আঙ্গুল ফাঁক করে ব্যক্তির মাথার দুই পাশে ধর। লক্ষ রাখ ব্যক্তির কান যেন মুক্ত থাকে। ব্যক্তির মাথা, ঘাড় এবং মেরুদন্ড স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে থাকে সেভাবে রাখার চেষ্টা কর।
- তুমি ব্যক্তির মাথা ধরে রাখা অবস্থায় একজন সহযোগীকে মাথার দুই পাশে কম্বল বা তোয়ালে দিয়ে বানানো রোল দিতে বল।
- হাসপাতালে পৌঁছানো পর্যন্ত তুমি ব্যক্তির মাথা ধরে রাখ এবং তোমার সহযোগীকে মনিটর করতে বল।

সাবধানতা

- ব্যক্তিকে আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় যেখানে অবস্থান করছে, কোন প্রকার কারণ ছাড়া সেখান থেকে সরানোর প্রয়োজন নেই। তাতে আঘাতের পরিমাণ বাড়তে পারে।
- একান্তই যদি সরাতে হয় তাহলে লগ-রোল কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

লগ-রোল কৌশল

মেরুদন্ডে আঘাত/হাড় ভেঙ্গে যাওয়া ব্যক্তিকে কাত করানোর জন্য এই কৌশলটি অবলম্বন করা হয়। প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসক ব্যক্তির মাথা ও ঘাড় সুরক্ষা করবে। সহযোগীরা ব্যক্তির পা সোজা করে দিবে। ব্যক্তিকে যে পাশে কাত করাতে হবে তিনজন সহযোগী ব্যক্তির সে পাশে এবং দু'জন অপর পাশে অবস্থান নিবে। তিনজনের যে পায়ের দিকে আছে সে ব্যক্তির দূরের পায়ের নিচে হাত রাখবে, যে মাঝখানে আছে সে ব্যক্তির দূরের পায়ের নিচে ও কোমরে হাত রাখবে এবং যিনি মাথার পাশে আছেন তিনি ব্যক্তির কাঁধে ও পিঠে হাত রাখবে। এবার ব্যক্তিকে তিনজন তাদের পাশে কাত করানোর জন্য টানবেন। অপর পাশের দু'জন এ কাজে সহায়তা করবেন। মাথার পেছনে থাকা প্রধান প্রাথমিক চিকিৎসক শরীরের সাথে সঙ্গতি রেখে মাথা ও ঘাড় ঘুরাতে সহায়তা করবে। কাত করার পর মেরুদন্ডের সাথে সঙ্গতি রাখার জন্য উপরের পাটিকে সামান্য উঁচু করে রাখা প্রয়োজন।

১.২.১১ পানিতে ডোবা

বাংলাদেশে প্রতি বছর অনেক মানুষের মৃত্যু হয় পানিতে ডোবার কারণে। বিশেষ করে বন্যা প্রবণ এলকায় বন্যাকালীন সময়ে কোনো কোনো স্থানের শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণ পানিতে ডোবা।

আমাদের দেশে পানিতে ডোবার প্রচলিত প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে ব্যক্তিকে মাথায় তুলে বা হাত ধরে ঘুরানো যাতে করে পেটের পানি বেরিয়ে আসে। এটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করার পর জীবনরক্ষাকারী জরুরি প্রথম কাজটি হচেছ মুখের ভেতর পরীক্ষা করে, শ্বাসনালি খুলে দিয়ে প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাস দেওয়া। একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসক পারেন ডুবন্ত মানুষের জীবন বাচাতে।

পানিতে ডুবে মৃত্যুর কারণ

পানিতে ডোবা ব্যক্তি যখন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা চালায় তখন নাক মুখ দিয়ে পানি ঢুকে পাকস্থলি ও ফুসফুস পানিতে ভরে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থা কিছুক্ষণ চললে বিপদাপন্ন ব্যক্তির শ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা থাকে।

পানি থেকে উদ্ধার

কোনো ব্যক্তি পুকুর, জলাশয়, সমুদ্র বা নদীতে ডুবে গেলে তাকে উদ্ধারের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যেতে পারে-

- দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছানো
- নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত রেখে লম্বা লাঠি, বাশ, গাছের ডাল, দড়ি, প্যাঁচানো শাড়ি, জামা কাপড় ইত্যাদির যে কোনোটির এক প্রান্ত শক্ত করে ধরে অপর প্রান্ত ডুবন্ত ব্যক্তির কাছে ছুঁড়ে দাও এবং তাকে ধরতে বল
- অল্প পানিতে ডুবে গেল বা ডুবন্ত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে ভাসতে থাকলে, যদি তোমার সাঁতার জানা থাকে তাহলে দ্রুত বিপদাপন্ন ব্যক্তির কাছে যান। অল্প পানিতে ডুবলে তার কোমর ধরে তুল এবং বেশি পানিতে ভাসতে থাকলে তাকে চিৎ করে ধরে সাঁতার দিয়ে তীরে নিয়ে আস।

মনে রাখবে- ডুবন্ত ব্যক্তি যেন কখনোই তোমাকে জাপটে ধরতে না পারে। সে ক্ষেত্রে তুমি ও ডুবন্ত ব্যক্তি দু'জনেই ডুবে যেতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- নিজের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা
- উদ্ধারের পর শ্বাসনালি পরিষ্কার করা ও শ্বাসনালি খুলে দেওয়া
- শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করা, প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাস ও সিপিআর দেওয়া
- হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১। ব্যক্তিকে মাটিতে শুইয়ে দাও। সাড়া দেওয়ার পর্যায় পরীক্ষা কর। শ্বাসনালি খুলে দাও। শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা কর। তোমার সঙ্গী কাউকে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে বল।

২। যদি শ্বাস চালু না থাকে তাহলে জীবন রক্ষাকারী ৫টি প্রাথমিক ফুঁ দিন।

৩। এরপর ৩০ বার বক্ষ চাপ ও ২ বার ফুঁ দাও। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি না হলে ৩০:২ হারে সিপিআর প্রয়োগ করতে হবে। ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি হলে কাশি দিবে অথবা চোখ খুলে তাকাবে বা নড়াচড়া করবে ও শ্বাস নিবে।

৪। ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হলে তাঁর ভিজা কাপড় চোপড় খুলে তাঁকে চাদর বা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া প্রতিরোধ করার জন্য এ ব্যবস্থা জরুরি। ব্যক্তিকে রিকভারি পজিশনে রাখ। মনিটর কর-সাড়া দেওয়ার পর্যায়, পাল্স, শ্বাস চলাচল।

সাবধানতা

আমাদের দেশে পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিদের প্রচলিত ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানসম্মত নয়। মাথায় তুলে ঘুরানো বা পা ধরে ঘুরোনোর ফলে পেট থেকে পানি বের হয়ে আসে ঠিকই কিন্তু তার চেয়ে বেশি জরুরি প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করা।

- ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধারের সময় নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- ডুবন্ত ব্যক্তি যদি কোন তরল রাসায়নিক বা বর্জের মধ্যে ডুবে থাকে তাহলে বিষাক্ত ধোঁয়া বের হতে পারে।
- উদ্ধারের পরপরই জীবন রক্ষাকারী ফুঁ দাও।
- জোর করে পেটের পানি বের করার প্রয়োজন নেই।
- ব্যক্তি প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেও তাকে ডাক্তারের পরার্শ নিতে হবে। কারণ ফুসফুসে ঢুকে যাওয়া পানি থেকে ফুসফুসের সংক্রমণ হতে পারে।

১.২.১২ সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা

ক. জ্বর (Fever)

আমাদের শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চাইতে বেড়ে যাওয়া অবস্থাকে জ্বর বলে। জ্বর নিজে কোনো রোগ নয়, জ্বর হচ্ছে বিভিন্ন রোগের উপসর্গ। মানুষের শরীরে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চাইতে বেশি হলে সে অবস্থাকে জ্বর বলে।

জ্বরের কারণ

বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ ও সংক্রমণ থেকে জ্বর হতে পারে।

- প্রদাহ- যে কোনো ধরনের আঘাত, ক্ষত, হাড় ভাঙ্গা, পোড়া
- সংক্রমণ-ডেঙ্গু, টাইফয়েড়, ম্যালেরিয়া, হাম, মেনাওজাইটিস, নিমোনিয়া, ভাইরাল ইত্যাদি।

জ্বর যদিও একটি সাধারণ অসুস্থতা তথাপি কখনো কখনো কোনো কোনো জ্বরে শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে গিয়ে জরুরি অবস্থার সৃষ্টি করে। কয়েকটি প্রধান জ্বর সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- তাপমাত্রা মাপার ব্যবস্থা করা
- জ্বরের কারণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা
- জ্বরের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া
- প্রয়োজনে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা

প্রাথমিক চিকিৎসা

- জ্বরের কারণে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় বিধায় অতিরিক্ত কাপড় চোপড় সরিয়ে ফেলে খালি গায় অথবা হালকা কাপড়ে থাকা। মনে রাখতে হবে কিছু কিছু জ্বরের ক্ষেত্রে যেমন ম্যালেরিয়ায় কাঁপুনি হয়। সে ক্ষেত্রে কাঁথা-কম্বল জড়িয়ে রেখে ব্যক্তি আরামবোধ করে। এ ক্ষেত্রে কাঁথা কম্বল সরানোর প্রয়োজন নেই।
- ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করছেন তা খোলামেলা হতে হবে। রুমে অবস্থান করলে রুমের দরজা জানালা খুলে রাখতে হবে। ব্যক্তিকে বাতাস করতে হবে। খোলামেলা পরিবেশ এবং বাতাস তার জ্বর কমাতে সহায়ক হবে।
- স্বাভাবিক তাপমাত্রার চাইতে বেশি হলে বিশেষ করে ১০২-১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট হলে ব্যক্তির সারা শরীর ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে। শরীর মুছে দেওয়ার জন্য খুব বেশি ঠান্ডা পানি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই, সাধারণ তাপমাত্রার পানি ব্যবহারই ভালো। মাথায় পানি দেওয়া এবং কপালে পানি পট্টি দেওয়া যাবে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে শরীর মুছে দেওয়ার পাশাপাশি তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রিতে নেমে এলে আর শরীর মুছে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে পুনরায় তাপমাত্রা বেড়ে গেলে একই প্রক্রিয়ায় শরীর মুছে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে তাপমাত্রা যেন স্বাভাবিকের চাইতে বেশি কমে না যায়।

- জ্বরের সাথে শিশুদের খিঁচুনি দেখা দিলে শরীর চেপে খিঁচুনি রোধ করা ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে তাপমাত্রা কমানোর প্রাথমিক চিকিৎসার সাথে সাথে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- যে সকল শিশু বুকের দুধ পান করে তা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। অন্য সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে পানি, শরবত ফলের রস, পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বর কি?

ডেঙ্গু এক ধরনের ভাইরাস জাতীয় জ্বর। শহর এলাকায় সীমিত। 'এডিস' প্রজাতির মমার কামড়ে এই ভাইরাস ছড়ায়।

উপসর্গ ও লক্ষণ

- আক্রান্ত ব্যক্তির তাপমাত্রা ১০৪-১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে।
- মাথা, শরীর, হাড় ও চোখে ব্যথা থাকে
- বিশেষ এক ধরনের ডেঙ্গু জ্বরের (হেমোরেজিক) ক্ষেত্রে চামড়ার নিচে, দাঁতে, চোখে, নাক দিয়ে, প্রস্রাব ও পায়খানার সাথে রক্তপাত হতে পারে
- শরীরে ছোট ছোট দানা দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- অধিকাংশ ডেঙ্গু জ্বরই মারাত্মক নয় এবং অন্যান্য ভাইরাস জ্বরের মতো সাত দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়।
- জ্বরের প্রাথমিক চিকিৎসা বিশেষ স্পঞ্জিং দিতে হবে।
- ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও অন্যান্য খাবার খেতে উৎসাহিত করতে হবে
- তবে শরীরে তাপমাত্রা যদি ১০৪-১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে উঠে যায়, রক্তপাতের লক্ষণ থাকে তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ম্যালেরিয়া জ্বর কি?

এই জ্বর বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় সীমিত। এটি ম্যালেরিয়া, প্লাসমোডিয়াম নামক পরজীবী দ্বারা সংঘটিত একটি রোগ। স্ত্রী এনোফিলিস নামক মশার কামড় ছাড়াও রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমেও ম্যালেরিয়া রোগ হতে পারে।

উপসর্গ ও লক্ষণ

- আক্রান্ত ব্যক্তির দুই এক দিন পরপর জ্বর আসে।
- তাপমাত্রা ১০৪-১০৫ ডিগ্রির ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে।
- শীত অনুভব ও কাঁপুনি থাকে।
- ৩-৪ ঘন্টা জ্বর থাকার পর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা: জ্বরের সাধারণ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অবশ্যই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে হবে।

টাইফয়েড জ্বর কি

বাংলাদেশে টাইফয়েড রোগের ব্যাপকতা খুব বেশি। টাইফয়েড রোগের জীবাণু রোগীর মলের সাথে বেরিয়ে দূষিত পানির মাধ্যমে অপর সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করে। এই রোগের কারণে সালমনেলা টাইফি। ইহা পানি বাহিত রোগ।

উপসর্গ ও লক্ষণ

- আক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম সপ্তাহে টাইফয়েড জ্বর ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে সাথে কোষ্টকাঠিন্য বা ডায়রিয়া থাকতে পারে।
- দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগীর শরীরে লালচে দাগ দেখা দিতে পারে, পেট ফুলে যেতে পারে এবং ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে।
- তাছাড়া টাইফয়েড জ্বরে হাড়, মস্তিষ্ক, পিত্ত, হৃৎপিন্ড ও কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এমনকি রোগী মারাও যেতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: টাইফয়েড রোগ সন্দেহ হলে জ্বরের সাধারণ পরিচর্যার পাশাপাশি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

খ. হিট স্ট্রোক কি: উত্তপ্ত আবহওয়ার কারণে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে হিট স্ট্রোক বলে।

হিট স্ট্রোকের কারণ: দীর্ঘ সময় ধরে যদি প্রকৃতির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চাইতে বেশি থাকে অথবা কোনো ব্যক্তি যদি অধিক সময় ধরে উত্তপ্ত পরিবেশে কাজ করেন তাহলে আমাদের মস্তিষ্কের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লোপ পায়। ফলশ্রুতিতে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। কোনো কোনো ওষুধ সেবনের ফলেও এ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে

হিট স্ট্রোকের লক্ষণ

- মাথা ধরা, অস্থিরতা, প্রলাপ বকা
- চামড়া গরম ও লালচে হয়ে যাওয়া
- তাপমাত্রা ১০৪° ফারেনহাইট বা তার উপরে হয়ে যাওয়া

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের তাপমাত্রা কমানো
- হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

হিট স্ট্রোকের প্রাথমিক চিকিৎসা

- আক্রান্ত ব্যক্তিকে আপক্ষোকৃত ঠান্ডা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে এবং হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শরীরের কাপড়-চোপড় যতটা পারা যায় সরিয়ে ফেলে উন্মুক্ত রাখতে হবে। ফ্যান ছেড়ে দিয়ে বা হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতে হবে।

- একটি চাদর ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে জড়িয়ে দাও। ঠান্ডা পানি না পাওয়া গেলে স্বাভাবিক তাপতাত্রার পানি হলেও চলবে। কিছুক্ষণ পরপর জড়ানো চাদরে পানি ঢেলে দাও। শরীরের তাপমাত্রা ১০০০ ফারেনহাইটে না আসা পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে।
- ব্যক্তি যদি অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে শ্বাসনালি খুলে দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যবেক্ষণ কর এবং প্রয়োজনে সিপিআর প্রয়োগ কর।
- তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় আসার পর ভিজা চাদরটি সরিয়ে নাও।
- ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ রাখ- সাড়া দেওয়া, শ্বাস নাড়ি বা পাল্স ও তাপমাত্রা দেখ।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পুনরায় একই প্রক্রিয়ায় শরীর ঠান্ডা কর।

হাইপোথারমিয়া (Hypothermia):

কোনো কারণে শরীরের তাপমাত্রা ৯৫° ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৫° ডিগ্রি সেলসিয়াস) এর নিচে নেমে গেলে সে অবস্থাকে হাইপোথারমিয়া বলে।

হাইপোথারমিয়ার কারণ

- ঠান্ডা আবহাওয়া (তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যাওয়া), শৈত্যপ্রবাহ (ঠান্ডা আবহাওয়া ও প্রবহমান ঠান্ডা বাতাস)
- ঠান্ডা পানিতে পড়ে যাওয়া
- জ্বরের পরিচর্যার অতিরিক্ত স্পঞ্জিং বা জ্বর কমানোর ওষুধ সেবন।

হাইপোথারমিয়ার লক্ষণ

- কাঁপুনি, শরীর ঠান্ডা হয়ে যাবে
- চামড়া শুকনো ও ফ্যাকাশে দেখাবে
- ব্যক্তি প্রলাপ বকতে পারে
- শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর গতিতে চলবে
- নাড়ির (পাল্স) গতি স্বাভাবিকের চাইতে কম হবে
- দীর্ঘ সময় যাবৎ হাইপোথারমিয়া হলে ব্যক্তি মারা যেতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- ব্যক্তি যেন শরীরের তাপমাত্রা আর না হারায় তার ব্যবস্থা করা
- ধীরে ধীরে ব্যক্তির শরীর উত্তপ্ত করা
- প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- হাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি ঘরের বাইরে উন্মুক্ত আবহাওয়ায় থাকলে তাকে যথাশীঘ্র একটি ঘরে স্থানান্তর করতে হবে।

- ব্যক্তির পরনের কাপড় ভিজা হলে তা বদলে দিয়ে গরম কাপড় দিয়ে সারা শরীর ও মাথা জড়িয়ে দিতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসক ব্যক্তিকে জড়িয়ে ধরে তার শরীরের তাপমাত্রা দিয়ে ব্যক্তিকে গরম করতে পারেন।
- ব্যক্তিকে মাটি বা মেঝের উপর রাখতে হলে অবশ্যই পুরু কম্বল বা তোষকের উপর রাখতে হবে।
- ব্যক্তি সচেতন থাকলে চা, দুধ, যে কোনো গরম পানীয়, উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার যেমন চকলেট, ক্রিম যুক্ত বিস্কিট খেতে দিতে হবে।
- ব্যক্তির সাড়া দেওয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ি বা পাল্স তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- প্রয়োজনে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

সাবধানতা

- ঠান্ডা অবস্থা থেকে উদ্ধারের পর হাইপোথারমিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিকে খুব দ্রুত গরম করার প্রয়োজন নেই। কারণ ঠান্ডা অবস্থায় ব্যক্তিকে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা স্বরূপ শরীরের রক্ত প্রবাহ জরুরি অঙ্গ - প্রতঙ্গো (মস্তিষ্কে, হৃদপিন্ড) সীমিত থাকে। ব্যক্তিকে উদ্ধারের পর যদি দ্রুত গরম পানির বোতল, আগুনের উৎস, ইলেকট্রিক হিটার দিয়ে গরম করা হয় তাহলে শরীরের ত্বকে রক্তপ্রবাহ বেড়ে গিয়ে জরুরি অঙ্গ-প্রতঙ্গো রক্ত সরবরাহের ঘাটতি দেখা দিবে। তাতে করে মস্তিষ্ক ও হৃদপিন্ড অকেজো হয়ে যেতে পারে।
- উপরে উল্লেখিত একই কারণে শরীর গরম করার জন্য পানীয় হিসেবে কখনোই এলকোহল (মদ) দেওয়া যাবে না।
- প্রাথমিক চিকিৎসক নিজেকে গরম রাখার প্রতি যথেষ্ট লক্ষ রাখতে হবে।

গ. নিউমোনিয়া কি

বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণ নিউমোনিয়া। এই রোগে শিশুর ফুসফুস সংক্রমিত হয়ে থাকে। নিউমোনিয়া কখনো কখনো বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরও হয়ে থাকে।

উপসর্গ ও লক্ষণ

- নিউমোনিয়ার একটি প্রধান লক্ষণ দ্রুত শ্বাস। ফুসফুসের সংক্রমণের ফলে কোনো শিশু বা ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না। চাহিদা অনুযায়ী অক্সিজেন না পাওয়ায় শ্বাসের গতি বেড়ে যায়।

  দ্রুত শ্বাসের কারণে বুকের পাঁজরের হাড়ের নিম্নাংশ ও পেটের সংযোগস্থল শ্বাসের সাথে সাথে বসে যাবে।
- তাছাড়া শিশু/ব্যক্তির জ্বর ও অস্থিরতা থাকবে।
- শিশু খেতে চাইবে না, এমনকি বুকের দুধও খেতে চাইবে না।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- একজন প্রাথমিক চিকিৎসকের জন্য রোগটি সনাক্তকরণ জরুরি।

- জ্বর বেশি না হলে মাথায় পানি ঢালার প্রয়োজন নেই।
- নিউমোনিয়া সনাক্তকরণের সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ বা হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

নিউমোনিয়া একটি জীবানু ঘটিত রোগ। বর্তমানে নিউমোনিয়া উন্নত চিকিৎসা আছে। সময়মতো চিকিৎসকের কাছে বা হাসপাতালে পৌঁছাতে পারলে শিশু/ব্যক্তি বেঁচে যেতে পারে।

ঘ. ডায়রিয়া

ডায়রিয়া মূলত একটি পানিবাহিত রোগ। তাছাড়া অপরিচ্ছন্ন হাত, বাসি পচা খাবার, মাছি ইত্যাদির মাধ্যমেও ডায়রিয়া ছড়াতে পারে। ডায়রিয়ার মূল কারণ কিছু ভাইরাস ও জীবাণু। আক্রান্ত ব্যক্তির মলের মধ্যে ডায়রিয়ার ভাইরাস বা জীবাণু উপস্থিতি থাকে, তা দূষিত পানি বা অন্য কোনো মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির মুখ দিয়ে প্রবেশ করে তাঁকে সংক্রমিত করে। সকল বয়সের মানুষই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে, তবে সাধারণত শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে।

ডায়রিয়ার উপসর্গ ও লক্ষণ: পাতলা পায়খানা ও বমিই প্রধান উপসর্গ। সময়মতো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে পানি স্বল্পতা দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- পানিস্বল্পতা দেখা দিলে প্যাকেট স্যালাইন বা সরবত খাওয়াতে হবে। স্যালাইন খাওয়ানোর সাধারণ হিসাব- যতবার ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি পায়খানা ও বমি করবে ততবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- সেই সাথে শিশুর ক্ষেত্র অবশ্যই বুকের দুধ দিতে হবে।
- অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাধারণ পানি, ডাবের পানি, ভাতের মাড়, কলা, সহজে হজম হয় এমন খাবার দেওয়া হবে।
- বেশির ভাগ ডায়রিয়া ২-৩ দিনের মধ্যেই বাড়ির যত্নেই ভালো হয়ে যায়। তবে কিছু ডায়রিয়া বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন আছে।

কখন হাসপাতালে প্রেরণ করবে?

- ডায়রিয়ার সাথে জ্বর থাকা
- মলের সাথে রক্ত যাওয়া
- স্যালাইন খাওয়ানো সত্ত্বেও পানিস্বল্পতা কমছে না।
- ৬ ঘন্টা যাবৎ প্রসাব হচ্ছে না।
- হাতে পায়ে টান ধরা
- শিশু বা ব্যক্তি অচেতন হয়ে যাওয়া

প্রতিরোধের উপায়: ডায়রিয়া একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ। উন্নত স্যানিটেশন ও ব্যক্তি স্বাস্থ্য অভ্যাস বজায় রাখার মাধ্যমে ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব ও সহজ।

ঙ. পানির স্বল্পতা (Dehydration)

আমাদের শরীরের পানি স্বাভাবিক পরিমাণের চাইতে কমে গিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে পানি স্বলপ্তা বলে।

আমাদের দেশে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ প্রতি ২৪ ঘন্টায় সাধারণত ২.৫-৩ লিটার পানি পান করে থাকেন। শরীরের অভ্যন্তরের পরিচ্ছন্নতার কাজ সম্পন্ন করে ১.৫ লিটার পানি প্রসাবের মাধ্যমে এবং বাকি ১.৫ লিটার ঘাম, মল, নিশ্বাসের মাধ্যমে নির্গত হয়।

পানি স্বল্পতার কারণ

- গরম আবহাওয়ায় প্রচুর ঘাম নির্গত হয়
- গরম আবহাওয়ায় অধিক পরিশ্রম করা
- জ্বর (শরীরের ত্বক দিয়ে বাষ্পাকারে পানি উড়ে যায়)
- ডায়রিয়া
- অত্যধিক বমি
- প্রচুর রক্তপাত।

পানি স্বল্পতার লক্ষণ

- চোখ মুখ শুকনো দেখাবে। গুরুতর পানি স্বল্পতায় চোখ ভেতরে বসে যাবে।
- ঠোঁট শুকিয়ে যাবে এবং ফেটে যাবে
- মাথা ধরা
- দ্বিধাগ্রস্ত ভাব
- প্রসাব অল্প ও গাঢ় রঙ ধারণ করা
- পায়ের পেছনের দিকের মাংসপেশিতে খিঁচুনি হওয়া
- ৬ মাসের কম বয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে মাথার চাঁদি বসে যাওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা

কোনো কারণে আমাদের শরীর থেকে পানি বা জলীয় অংশ বেরিয়ে গেলে তার সাথে কিছু প্রয়োজনীয় লবণও বেরিয়ে যায়। তাই পানিস্বল্পতার প্রাথমিক চিকিৎসায় পানি পূরণের সাথে সাথে লবণের বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে।

- পানিস্বল্পতার ব্যক্তিকে আশ্বস্ত কর।
- ব্যক্তিকে পানি পান করতে দাও। মুখে খাওয়ার স্যালাইন পাওয়া গেলে তা যথাযথভাবে বানিয়ে পান করতে দিলে বেশি উপকার হবে।
- ব্যক্তি যদি কোন মাংসপেশিতে টান ধরা বা ব্যথার কথা বলে তবে তা হালকাভাবে ম্যাসেজ করে দাও (মনে রাখবে- সাধারণত লবণ কমে যাওয়ার কারণে এ অসুবিধা হয়ে থাকে)। স্যালাইন খাওয়ানোর ফলে অবস্থার উন্নতি হবে।
- স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত পানি ও স্যালাইন দিতে থাক।
- ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ রাখ।

সাবধানতা

- শিশুদের ক্ষেত্রে পনিস্বল্পতা বেশি হলে, প্রসাব বন্ধ থাকলে অতি শীঘ্র হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- প্রয়োজনের তুলনায় অধিক স্যালাইন খাওয়ানো ক্ষতিকর।

ছ. হার্ট এটাক (Heart Attack)

হৃৎপিন্ড বা হার্টে রক্ত সরবরাহকারী করোনারি ধমনিতে বাধার কারণে হৃৎপিন্ডের মাংসপেশি পর্যাপ্ত অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে হার্ট এটাক বলে। হার্ট এটাক বর্তমান বিশ্বে মৃত্যুর একটি প্রধানতম কারণ। হার্ট এটাকের কারণ ও ঝুঁকিসমূহ

- **কারন: হৃৎপিন্ড** করোনারি ধমনিতে চর্বি জমে বাধার সৃষ্টি করে। বাধার কারণে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়।
- **ঝুঁকিসমূহ:** শরীরের অতিরিক্ত ওজন, কায়িক পরিশ্রম বিমুখতা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ, তামাক গ্রহণ, বংশগতি, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে অতিরিক্ত চর্বি, চল্লিশোর্ধ্ব বয়স ও মদপান।

হার্ট এটাকের লক্ষণ

- বুকের মাঝামাঝি স্থানে ব্যথা। ব্যথা চোয়ালে, হাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে
- শ্বাস-কষ্ট
- পেটের উপরের অংশে অশ্বস্তিকর জ্বালাপোড়া এসিডের আধিক্য বলে মনে হতে পারে
- কপালে, মুখমন্ডলে এবং সারা শরীরে প্রচুর ঘাম হবে
- ঠোঁট ও শরীর নীল বর্ণ ধারণ করবে।
- ব্যক্তি হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ

- ব্যক্তির কষ্ট লাগব করার ব্যবস্থা করা
- জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ

প্রাথমিক চিকিৎসা

- হাসপাতালে প্রেরণের জন্য এ্যাম্বুলেন্স বা অন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা কর।
- হার্ট এটাকের রোগীরা সাধারণত হাঁটু ভাঁজ করে অর্ধ শায়িত অবস্থায় আরামবোধ করেন। ব্যক্তির পিঠে এবং হাঁটুর নিচে বালিশ দিয়ে অর্ধ শায়িত অবস্থায় রাখ।
- ব্যক্তি যদি আগে থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শে এসপিরিন ও ব্যথা কমানোর কোন স্প্রে ব্যবহার বা ওষুধ সেবন করে থাকেন তাহলে তা নিতে সহায়তা কর।
- শ্বাস-প্রশ্বাস, নাড়ি ও সাড়া দেওয়ার পর্যায় মনিটর কর।

সাবধানতা

- ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে গেলে, তাঁর শ্বাসনালি খুলে দাও এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নাও।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোন ওষুধ ব্যবহার করবে না।
- দ্রুত হৃদরোগ হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

জ. ব্রেন স্ট্রোক (Brain Strock)

মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী রক্তনা**লিতে** রক্ত জমাট বেঁধে বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে ব্রেন স্ট্রোক বলে। ব্রেন স্ট্রোক সাধারণত বয়স্ক লোকদের, বিশেষ করে যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। ব্রেন স্ট্রোকের কারণ ও ঝুঁকিসমূহ:

- রক্তনালিতে বাধা: শরীরের অন্যান্য স্থানের ন্যায় মস্তিষ্কের রক্তনালিতেও চর্বি জমে রক্ত সরবরাহ বাধার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে মস্তিষ্ক প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়।

- রক্তক্ষরণ: মস্তিষ্কের রক্তনালি ফেটে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে।
- ঝুঁকিসমূহ: শরীরের অতিরিক্ত ওজন, কায়িক পরিশ্রম বিমুখতা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ তামাক গ্রহণ, বংশগত, ডায়বেটিস, রক্তে অতিরিক্ত চর্বি, চল্লিশ উর্ধ্ব বয়স ও মদপান।

ব্রেন স্ট্রোকের লক্ষণ

- মুখ বাকা হয়ে যাওয়া, একটি চোখ বন্ধ হয়ে যাবে
- একটি হাত অবশ হয়ে যাওয়া
- কথা বলতে না পারা বা অস্পষ্টভাবে কথা বলা
- প্রচন্ড মাথাব্যথা
- দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া

প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য

- জরুরিভাবে হাসপাতালে প্রেরণ
- আশ্বস্ত করা।

প্রাথমিক চিকিৎসা

- ব্যক্তিকে কথা বলতে বল এবং উভয় হাত উপরে তুলতে বল। ব্যক্তি স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে মুখ বাকা হয়ে যাবে এবং শুধুমাত্র একটি হাত উপরে তুলতে পারবে।
- ব্যক্তিকে আশ্বস্ত কর এবং হাসপাতালে প্রেণের ব্যবস্থা কর।
- হাসপাতালে পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, পাল্স ও সাড়া দেওয়ার পর্যায় মনিটর কর।

সাবধানতা

- ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে গেলে শ্বাসনালি খুলে দাও এবং যথাযথ ব্যবস্থা নাও।
- ব্যক্তিকে কোনো প্রকার খাবার বা পানীয় দেওয়া যাবে না তাতে চোকিং অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

ঝ. আহত বা অসুস্থ ব্যক্তি পরিবহন

প্রাথমিক চিকিৎসার তিনটি কার্যস্তরের মধ্যে সর্বশেষ স্তরটি ব্যক্তিকে স্থানান্তর করা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের পর প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিকে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থানান্তর করা না হলে তা ব্যক্তির জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে। আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে স্থানান্তর করার জন্য সব সময় হাতের নাগালে সুব্যবস্থা নাও থাকতে পারে । তাই একজন প্রাথমিক চিকিৎসকের এ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

অসুস্থ ব্যক্তিকে পরিবহনের গুরুত্ব

- প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়া প্রাথমিক চিকিৎসকের একটি দায়িত্ব।
- পরিবহনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অসুস্থ বা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সময়মত হাসপাতালে স্থানান্তর করা।
- পরিবহনের জন্য কখনো স্ট্রেচার আবার কখনো বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে।

পরিবহনের পূর্ব প্রস্তুতি

- পরিবহনের সহায়ক উপকরণ ঘটনাস্থলে আছে কি না
- পদ্ধতি ও কৌশল
- প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর সংখ্যা
- আঘাতের প্রকার ও গুরুত্ব
- গুরুত্ব অনুসারে হাসপাতালে স্থানান্তর।

উত্তোলনের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- প্রতিবিধানকারীর শারীরিক সক্ষমতা
- মেরুদন্ড সোজা রেখে উত্তোলন করা
- অন্তত একটি পায়ের আঙ্গুল বা অগ্রভাগ এর উপর রাখতে হবে
- যতটা সম্ভব অসুস্থ ব্যক্তির কাছাকাছি থাকতে হবে
- উত্তোলনের সময় সম্পূর্ণ হাত ব্যবহার করতে হবে।

পরিবহনকালে লক্ষণীয়

- ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কি না, শকের মাত্রা বাড়ছে কি না
- রক্তপাত হচ্ছে কি না, নাড়ি স্পন্দন স্বাভাবিক কি না
- পরিবহনের সময় ব্যক্তি আরামদায়ক অবস্থায় আছে কি না

পরিবহনের বিভিন্ন পদ্ধতি

- স্ট্রেচার (Stretcher), বিকল্প স্ট্রেচার (চেয়ার, কম্বল, বাশ, বস্তা, রশি ইত্যাদি)
- তিনজনে পরিবহন, দুইজনে পরিবহন
- হাতে তৈরী আসন (চার হাত, তিন হাত)
- মানব ক্রাজচ (Human crutch), কোলে করে
- পিঠে করে, কাঁধে করে (Fire Man's Lift)

১.৩ মানসিক স্বাস্থ্য কি?

স্বাস্থ্য হলো শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা, কেবল কোনো রোগের অনুপস্থিতি নয়। মানসিক স্বাস্থ্য হলো আমাদের আবেগীয় ও আত্মিক সহনক্ষমতা, যা দুঃখ, কষ্ট ও হতাশার মধ্যে টিকে থেকে জীবনকে উপভোগ করতে সাহায্য করে। এটি একটি সুস্থতার অনুভূতি, যার মূলে রয়েছে নিজের ও অন্যের প্রতি সম্মান ও সক্ষমতা সম্পর্কিত বিশ্বাস। মানসিক স্বাস্থ্য হচ্ছে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ই একটি অংশ।

মনস্তাত্ত্বিক আঘাত

ব্যক্তি পরিবার বা সামাজিক যে কোনো পর্যায়েই যখন প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়টি উত্থাপিত হয় আমরা সাধারণত শারীরিক আঘাত বা অসুস্থতা বুঝে থাকি। যে কোনো ধরনের শারীরিক আঘাত বা অসুস্থতার পাশাপাশি একজন ব্যক্তির মনের মধ্যে নেতিবাচক কিছু পরিবর্তন আসে যেমন- অনিশ্চয়তা, অনিরাপত্তা। তাই

আঘাত বা অসুস্থতার প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি ব্যক্তির মনোবল উজ্জীবিত রাখাও একজন প্রাথমিক চিকিৎসকের নৈতিক দায়িত্ব। আবার এমন অনেক ঘটনা ঘটে যাতে শারীরিক কোনো আঘাত বা অসুস্থতা থাকে না কিন্তু ব্যক্তি মানসিকভাবে আঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এ অধ্যায়ে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ঝুঁকিমূলক উপাদান

- ব্যক্তি পর্যায়ে: মদ, মাদক, ধূমপান, নিপীড়ন, চাপ, জীবনে তীব্র মানসিক আঘাত পাওয়া, তিক্ত শৈশব, কারাবাস, সহায়তার অভাব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধতা ও জিন।
- সামাজিক পর্যায়ে: দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপর্যাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা, নিম্নমানের আবাসন, সাম্প্রদায়িক সংঘাত, অসাম্য, কুসংস্কার ও বৈষম্য।

প্রতিরক্ষামূলক উপাদান

- জীবনদক্ষতাসমূহ: স্বাভাবিক শৈশব, আত্মবিশ্বাস, নিজের ওপর আস্থা, সমস্যা সমাধানেরদক্ষতা, যোগাযোগদক্ষতা, খাপ খাইয়ে নেওয়ার দক্ষতা, বিরোধ নিষ্পত্তিরদক্ষতা, সম্মানজনক সম্পর্ক, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস
- সামাজিক মেলামেশা/শারীরিক স্বাস্থ্য: সহনশীল সমাজ, অর্থপূর্ণ কাজ, সামাজিক পরিধি, কৃষ্টি ও সভ্যতা, স্থিতিশীল গৃহপরিবেশ, বাবা-মার স্নেহ, শরীর চর্চা, পুষ্টি ও বিশ্রাম

মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের কারণ

- মারাত্মকভাবে শারীরিক আঘাতপ্রাপ্ত বা অসুস্থ হওয়া
- দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় সম্পদহানী
- কোনো কারণে ভয় পাওয়া
- প্রিয়জনের মৃত্যু বা অসুস্থতা
- মানুষের ক্ষতি, লাশ ও পশুপাখির মৃত দেহ প্রত্যক্ষ করা
- নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া
- আর্থিক সংকট অথবা ব্যক্তিগত/পারিবারিক সমস্যা
- নিরাপত্তাহীনতা
- খাদ্য-পানীয়, বিশেষ করে শিশু খাদ্যের অভাব
- পেশাগত (বেকারত্ব, চাকুরিকালীন পদোন্নতি/ন্যায্য সুবিধা বঞ্চিত) হতাশা
- দুর্যোগ/দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও তার নেতিবাচক স্মৃতি মনে হওয়া।

মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের উপসর্গ ও লক্ষণ

- কোনো ব্যক্তি কথা বন্ধ করে দিতে পারে অথবা তার কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে যেতে পারে
- অমনোযোগী হতে পারে
- শীত, তাপ, অনুভূত না হতে পারে
- শূন্য দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে পারে এবং এক ধরনের অসহায়ত্ব প্রকাশ পেতে পারে

- অতি মাত্রার সতর্ক ও সংবেদনশীল হতে পারে
- কখনো কখনো ক্ষিপ্ত ও মারমুখী হয়ে উঠতে পারে
- ভয় অথবা অস্থিরতার ভাব প্রকাশ করতে পারে
- নির্ঘুম দিন/সময় কাটতে পারে
- আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসকের করণীয়

- লক্ষণ ও চিহ্ন অনুযায়ী মানসিক আঘাতের ব্যক্তি সনাক্ত করা
- ব্যক্তি এবং নিকটজনকে আশ্বস্ত করা
- ধৈর্য সহকারে ব্যক্তির পুরো কথা শোনা
- প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া এবং প্রয়োজনে মানসিক সহায়তার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ
- মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন কর যাতে তিনি তোমাকে প্রকৃত শুভাকাঙ্খী ভাবতে পারে।
- অজ্ঞতা নয়, ব্যক্তিকে সম্মান কর।
- ধৈর্য সহকারে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির পুরো কথা শোনা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে একজন প্রাথমিক চিকিৎসককে ভালো শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে কোনো নির্জন জায়গায় যাওয়া যেতে পারে যেখানে তিন খোলামেলাভাবে নিজের সমস্যার কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে। একই ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা জানা থাকলে তা শেয়ার কর।
- নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে ঐ ব্যক্তি মনের দিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত, "পাগল" নয়। শরীরে আঘাতের মতো সময়ের প্রেক্ষিতে মনের আঘাতেরও উপশম হবে।
- শারীরিক আঘাত থাকলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে।
- ব্যক্তি কাঁদতে চাইলে তার কান্না থামানোর প্রয়োজন নেই। সে যত কাঁদবে তত হালকা বোধ করবে।
- ব্যক্তির মনে সাহস জোগাতে হবে (Motivationa and Counseling) এবং স্বাভাবিক জীবন শুরু করতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- তিনি যেখানে থাকতে পছন্দ করেন সেখানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- একই ধরনের সমস্যাপীড়িত ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া গেলে তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাত করার ব্যবস্থা করা। নিজের কথা বলতে পারলে তারা হালাক বোধ করবেন এবং উপলব্ধি করতে পারবেন যে তারা একা নয়।
- লক্ষ রাখতে হবে কেউ যেন ঐ ব্যক্তির সাথে দুর্ব্যবহার না করে।
- সান্তনা দিন, তবে মিথ্যা সান্তনা দেওয়া ঠিক হবে না, পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে দেওয়া ভালো।
- ব্যক্তিকে কখনো একাকী রাখা যাবে না।

- সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি না ঘটলে অথবা যদি চরম বিষণ্নতা, আত্মহত্যা বা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠার প্রবণতা দেখা দেয় তাহলে হাসপাতালে অথবা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতে হবে (তবে এর সংখ্যা খুবই কম)।
- দুর্যোগ/দুর্ঘটনা পরবর্তী সেবা কার্যক্রমে অংশ নেওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাকে নেতিবাচক দিকগুলোর পরিবর্তে ইতিবাচক দিকগুলো মনে করতে সহায়তা কর।
- মনস্তাত্বিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পাগল নন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ আঘাত সাময়িক। যথাযথ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ করে মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব।
- মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মধ্যে যদি আত্মহত্যা বা ক্ষিপ্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় তাহলে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বেঁধে রাখা বা বন্দি অবস্থায় রাখা যাবে না। তাতে মানসিক আঘাত আরো বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসকের সহায়তা নিতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্যের প্রাথমিক পরিচর্যার লক্ষ্য হচ্ছে:

চিত্র ১.৮: মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার পাঁচটি লক্ষ্য

১.৩.১ বিষণ্নতা কী?

- ক্লিনিক্যাল বিষণ্নতা সাধারণ বিষণ্নতা থেকে অধিক গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী
- এটি কোন পর্যায়ে আছে তা নির্ণয় করতে বিষণ্নতার লক্ষণসমূহ কমপক্ষে দুই সপ্তাহ স্থায়ী হতে হয়
- বিষণ্নতা আবেগ, চিন্তা, ব্যবহার ও শারীরিক সুস্থতাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে
- এ বিষণ্নতা একই সাথে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ও অন্যের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপনের সামর্থ্যে প্রভাব বিস্তার করে।

বিষণ্নতার লক্ষণসমূহ:

আবেগের ওপর প্রভাব :

- মন খারাপ লাগা, নিরাবেগ অনুভব করা, অসহায়ত্ব ও হতাশা অনুভব করা, রেগে যাওয়া বা উত্তেজিত হয়ে পড়া, উদ্বেগ, অপরাধবোধ ইত্যাদি।

চিন্তার ওপর প্রভাব :

- প্রচুর আত্মসমালোচনা করা, নিজেকে দোষী ভাবা, হতাশা, অন্যেরা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে এমন ভাবা, সিদ্ধান্তহীনতা, দুশ্চিন্তা, মনোযোগ ও স্মৃতি বিঘ্নিত হওয়া, মৃত্যু ও আত্মহত্যার চিন্তা।

আচরণের ওপর প্রভাব :

- কান্না করা, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা, দায়িত্বে অবহেলা, পোশাক পরিচ্ছদ ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি অবহেলা, উৎসাহ হারিয়ে ফেলা, নিজের ক্ষতি করা, নেশা করা ইত্যাদি।

শরীরের ওপর প্রভাব :

- দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি অনুভব করা, দুর্বল বা অবসাদগ্রস্ত অনুভব করা, অনেক কম বা বেশি নিদ্রা, বেশি খাওয়া বা খাওয়া দাওয়ায় অনাগ্রহ, ওজন বেড়ে বা কমে যাওয়া,কোষ্ঠকাঠিন্য বা হজমে সমস্যা, অনিয়মিত মাসিক চক্র, কোনো কারণ ছাড়াই শরীরে ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভব করা ইত্যাদি।

১.৩.২ উদ্বেগজনিত অসুস্থতা কী?

- উদ্বেগ একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, যা আমাদের সতর্ক থাকতে এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে। এমনকি দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান বা কোনো কাজ করার প্রেরণা দেয়।
- উদ্বেগ সমস্যা সাধারণ দুশ্চিন্তা থেকে ভিন্ন।
- এটি সাধারণ উদ্বেগ থেকে অনেক বেশি তীব্র এবং অনেক সময় ধরে চলতে থাকে।
- এটি স্বাভাবিক জীবনযাপন, কাজ এবং সম্পর্কে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

উদ্বেগজনিত অসুস্থতার লক্ষণগুলো:

শারীরিক প্রকাশ

- বুক ধড়ফড় করা, বুকে ব্যথা, দ্রুত হৃদস্পন্দন এবং ভয়ে চমকে ওঠা;
- দ্রুত শ্বাস গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া;
- মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, ঘাম হওয়া এবং শরীরের কোনো অংশে অসাড়তা অনুভূত হওয়া;
- বিষম খাওয়া, গলা শুকিয়ে আসা, বমি বমি ভাব, বমি করা এবং ডায়রিয়া;
- পেশিতে ব্যথা (বিশেষ করে ঘাড়, কাঁধ ও পিঠ), অস্থিরতা, শিরশিরে ভাব এবং কম্পনানুভূতি।

মানসিক প্রকাশ

- অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অবাস্তব এবং অত্যধিক দুশ্চিন্তা করা;
- অস্থিরচিত্ত অথবা ভাবলেশহীন হয়ে যাওয়া;
- মনোযোগহীনতা এবং স্মৃতিশক্তিতে ঘাটতি;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা হওয়া;
- বিরক্তি, অধৈর্য এবং ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ;
- দ্বিধায় ভোগা;
- অস্থিরতা অথবা চরম অসহায়বোধ করা;

- ক্লান্তিবোধ, ঘুমে সমস্যা হওয়া, স্বপ্নগুলো স্পষ্টভাবে দেখা অথবা সত্যি মনে করা;
- অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর ভাবনার পুনরাবৃত্তি।

আচরণগত প্রকাশ

- অতিরিক্ত অস্থিরতা প্রকাশ করা;
- আচরণের বাধ্যতামূলক পুনরাবৃত্তি, যেমন অত্যধিক সতর্কতা, বারবার হাত ধোয়া, গুনে বা মিলিয়ে দেখা;
- উদ্বেগ তৈরি করে এমন বিশেষ পরিস্থিতি বা স্থানকে এড়িয়ে চলা;
- ভয় পাওয়া বা আতঙ্কিত হওয়ার আচরণ করা;
- বারবার টয়লেটে যাওয়া;
- সামাজিক পরিবেশে মানিয়ে চলতে অস্বস্তি বোধ করা;
- অস্বস্তি হয় এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার তাড়না।

১.৩.৩ পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার (পিডি) বা ব্যক্তিত্ব বৈকল্য কী?

- ব্যক্তিত্বের বৈকল্যে ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, অনুভব বা আচরণ সমাজের প্রচলিত ও স্বীকৃত মানদণ্ডের তুলনায় ভিন্ন হয়
- সাধারণত কৈশোরে ব্যক্তিত্ব বৈকল্যের উত্থান ঘটে যা দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশবে মানসিক আঘাত পাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকে, যেমন: বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হওয়া
- জীবনে মানিয়ে চলতে সমস্যা হয় যা নিজের এবং অন্যের জন্য দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়
- আত্মহত্যা ও নিজের ক্ষতি করার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়
- ৪-১৫% মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বৈকল্য দেখা যায়

ইটিং ডিসঅর্ডার বা খাদ্যবিকার কী?

- ইটিং ডিসঅর্ডার বা খাদ্যাভ্যাসজনিত বিকার বা খাদ্যবিকার একটি মানসিক সমস্যা, যা স্বাস্থ্যে সমূহ ক্ষতি ডেকে আনতে পারে
- এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির তার খাবার, ওজন, ইত্যাদি নিয়ে সর্বদা চিন্তায় ভোগেন এবং নিজেদের খাদ্যাভ্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসেন।

আচরণগত লক্ষণ

- অকারণে নিয়মিত উপোস এবং সবসময় ক্যালোরির হিসাব রাখা
- যেকেনো ছুঁতোয় অন্যদের সাথে খাওয়া এড়িয়ে যাওয়া, কিন্তু সুযোগ পেলে লুকিয়েচুরিয়ে খাওয়া
- সাধারণত খাবার খাওয়ার সাথে সাথেই বা একটু পরেই সেটাকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা; যেমন, বমি করা বা ঘন ঘন শৌচাগারে গিয়ে মলত্যাগের চেষ্টা করা
- রোজ একাধিকবার নিজের ওজন মাপা, আয়নায় নিজেকে দেখা
- অতিরিক্ত ব্যায়াম, এমনকি অসুস্থ শরীরে বা বৃষ্টি বাদলার দিনেও ওজন ঝরাতে বাইরে দৌড়ানো

শারীরিক লক্ষণ

- অনেক কম বা বেশি ওজন বা ঘন ঘন ওজনে তারতম্য
- সবসময় ক্লান্তবোধ করা
- সঠিক পরিমাণ ঘুম না হওয়া

- অতিরিক্ত শীতকাতুরে ভাব
- সবসময় মাথাঘোরা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
- মেয়েদের অনিয়মিত ঋতুচক্র

মানসিক লক্ষণ

- সবসময় ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়
- খাবার নিয়ে দুশ্চিন্তা
- নিজের ওজন নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগা
- ডিপ্রেশন এবং অ্যাংজাইটির শিকার হওয়া

খাদ্যবিকারের ধরন

- অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা: ওজন বেড়ে যাবার ভয়ে এঁরা খাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দেন। রোগা হওয়া সত্ত্বেও নিজের ওজন বেশী মনে হবার কারণে তাঁরা সবসময় গ্লানিবোধে ভোগেন।
- বুলিমিয়া নার্ভোসা: এই রোগে ব্যক্তি প্রথমে অতিরিক্ত খান তারপরে জোর করে বমি এবং মলত্যাগ করেন। এরপর তাঁরা অনেকক্ষণ উপোস করে থাকেন এবং অতিরিক্ত ব্যায়াম করেন। এঁদের মনে হয় যে তাঁরা খাওয়া এবং ওজন খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
- অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণের সমস্যা: লাগামছাড়াভাবে বেশি খাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এঁরা কখনই ওজন কমানোর চেষ্টা করেন না। খিদে না পেলেও এঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে খান।

খাদ্যবিকারের কারণ:

- মানসিক কারণ: অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন ও স্ট্রেস
- সামাজিক কারণ: রোগা মানেই সুন্দর
- আচরণগত কারণ:অতিমাত্রায় আত্মসচেতনতা এবং খুঁতখুঁতে স্বভাব
- ব্যক্তিগত কারণ: ওজন নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা বা যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া, নিকটজনের মৃত্যু বা পরীক্ষায় ফেল করা ইত্যাদি

১.৩.৪ সাইকোসিস কী?

- সাইকোসিসে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি চিন্তা, প্রত্যক্ষণ, মনোভাব এবং আচরণে এক ধরনের পরিবর্তন অনুভব করে;
- এ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি সাধারণভাবে স্বীকৃত বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যায়, যদিও এই সরে যাওয়ার মাত্রা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে;
- সাইকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখা, কাজকর্ম করা ও নিজের যত বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

সিজোফ্রেনিয়া

- সিজোফ্রেনিয়া একটি দীর্ঘস্থায়ী মানসিক রোগ, যার সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয়। তবে সঠিক চিকিৎসা পেলে স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব। চিকিৎসার উদ্দেশ্য উপসর্গ কমানো নয় বরং ব্যক্তিকে এই রোগ নিয়ে বাচতে শেখানো।

লক্ষণসমূহ:

ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ডিলিউশান

- ডিলিউশান হলো এক ধরনের ভ্রান্তবিশ্বাস; যেমন, কেউ একজন হয়ত এ বিশ্বাসে উপনীত হলো যে তাকে নিপীড়ন করা হচ্ছে বা দোষ দেওয়া হচ্ছে বা সে কোনো বিশেষ মিশনে আছে বা সে কোনো মহান ব্যক্তি বা বাইরে থেকে তাকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে।

অলীক প্রত্যক্ষণ বা হ্যালুসিনেশান

- এগুলো হলো অলীক কিছুর প্রত্যক্ষণ করা; যেমন, কারো কথা শুনতে পারা, কাউকে দেখতে পারা, কোনো কিছু অনুভব করা, কোনো কিছুর স্বাদ নিতে পারা বা গন্ধ অনুভব করা।
- অলীক প্রত্যক্ষণগুলো খুব ভীতিকরও হতে পারে। বিশেষ করে যখন শুনতে পাওয়া শব্দগুলো নেতিবাচক কোনো মন্তব্য করে বা নির্দেশনা দেয় বা অপ্রীতিকর কোনো ধারণার সূত্রপাত করে।
- ভ্রান্তবিশ্বাস বা প্রত্যক্ষণের ভেতর দিয়ে যাওয়া কোনো মানুষের কাছে এগুলো খুব বাস্তব মনে হয়। সে কারণে তারা এগুলোর বিকল্প কোনো ব্যাখ্যা বিবেচনা করতে চায় না।

চিন্তার ক্ষেত্রে অসুবিধা: মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তা করার ক্ষমতায় এক ধরনের সমস্যা। কেউ একজন হয়ত খুব দ্রুত চিন্তা করতে পারে, এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায় দ্রুত চলে যেতে পারে; আবার তার চিন্তা করার ক্ষমতা খুব শ্লথও হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় বিচারবোধ, যোগাযোগ করার ক্ষমতা এবং দৈনন্দিন কাজগুলো করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

বাইপোলার ডিসঅর্ডার (ম্যানিক ডিপ্রেশন)

- এ রোগে আক্রান্ত মানুষের মেজাজে দুটো পর্যায় থাকে বিষণ্নতা এবং উত্তেজনা। এই দু'টো পর্যায় চক্রাকারে চলতে থাকে। তবে এই চক্রাকারের মধ্যে মেজাজের স্বাভাবিক অবস্থাও বিরাজমান থাকে।
- বিষণ্নতা এবং উত্তেজনা চক্রের সময়টা একেকজনের জন্য একেকরকম হতে পারে।
- বাইপোলার ডিসঅর্ডার সঠিকভাবে নির্ণয় করতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। কারণ দু'টো পর্যায়ের উপস্থিতি না থাকলে এটি অনেক সময় অনির্ণীত থাকে অথবা ভুলভাবে শুধু বিষণ্নতা হিসেবে নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

ম্যানিয়া পর্যায়ের লক্ষণসমূহ:

- একজন মানুষ খুব উত্তেজিত, আনন্দিত, শক্তিতে ভরপুর এবং নিজেকে অপরাজেয় অনুভব করতে পারে;
- নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে; উদাহরণস্বরূপ, এসময় সে নিজেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা কোনো মহান মানুষ মনে করে;
- সে ঝুঁকি বা বিপদকে আমলে নেয় না, অঢেল টাকা পয়সা খরচ করে, খুব স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করে অথবা বেশি বেশি যৌনশক্তি অনুভব করে;
- এসময় সে খুব দ্রুত চিন্তা করে, খুব দ্রুত কথা বলে ও কথা বলার বিষয় দ্রুত বদলাতে থাকে;
- এসময় তাদের স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম ঘুম হয়। একেবারে না ঘুমিয়েও সে এই অবস্থায় দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারে;
- পর্যাপ্ত বিশ্রামের অভাবে তার মধ্যে অবসাদও দেখা যেতে পারে;
- এসময় তার অন্তর্দৃষ্টির ঘাটতি থাকতে পারে। সে তার ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে খুবই বাস্তব মনে করে এবং বিশ্বাস করতে চায় না যে সে অসুস্থ;

- যখন কেউ তার অবাস্তব পরিকল্পনা বা ধারণাগুলোর সাথে দ্বিমত পোষণ করে, তখন সে বিরক্ত হয় ও রেগে যেতে পারে।

সাইকোসিসের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা

- জানা, বোঝা ও ক্ষতির ঝুঁকি নির্ধারণ করা;
- নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সহমর্মিতার সাথে সক্রিয়ভাবে শোনা;
- আশ্বস্ত করা এবং প্রকৃত তথ্য প্রদান করা;
- উপযুক্ত পেশাদারি সাহায্য নিতে উৎসাহিত করা;
- আত্মনির্ভর কৌশল শেখা ও তা অনুশীলনে উৎসাহিত করা।

১.৩.৪ মানসিক স্বাস্থ্যের প্রাথমিক পরিচর্যার ধাপ

করণীয় ১: সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে এগিয়ে যাও, সমস্যাটি বুঝ, ঝুঁকি নিরূপন কর ও সংকট উত্তরণে সহায়তা দাও

আত্মহত্যার সম্ভাব্য সতর্কতা চিহ্ন:

- আশাহীনতা বা অসহায়ত্ব প্রকাশ; রাগ, লজ্জা বা অপরাধবোধসূচক অনুভূতির প্রকাশ
- নিজেকে আঘাত বা হত্যা করার অভিপ্রায় প্রকাশ
- আত্মহত্যা করার নানা উপায় খুঁজে বের করা, যেমন ওষুধ, দড়ি, বিষ বা অন্য কোনো উপায়
- চিন্তাভাবনা না করেই বেপরোয়া আচরণ করা বা ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়া
- পরিবার ও বন্ধুবান্ধব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া
- উদ্বেগ, অস্থিরতা, ঘুমের সমস্যা; জীবনে বেঁচে থাকার কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া
- কথায় কথায় বিদায় জানানো; মনোভাব, মেজাজ বা মানসিক অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন
- মদ বা মাদকের প্রতি বেশি ঝোঁকা; মৃত্যু বা আত্মহত্যা নিয়ে কথা বলা বা লেখালেখি করা
- হঠাৎ করে সেরে ওঠা (ব্যাখ্যাতীতভাবে 'আরোগ্য'লাভ); আত্মবিশ্বাসী ভাব দেখানো
- যদি তোমার মনে হয় যে ব্যক্তি আত্মহত্যার চিন্তা করছে তবে তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা কর
- যদি ব্যক্তি শিকার করে যে সে আত্মহত্যার চিন্তা করছে তবে তার সাথে খোলা মনে কথা বল

করণীয় ২: যে বিষয়গুলো আপনার আলোচনার জন্য সহায়ক হতে পারে;

- পরিকল্পনা; ব্যক্তির আত্মহত্যার কোনো পরিকলপনা আছে কি? থাকলে কিভাবে এবং কখন।
- পদ্ধতি ও উপায়: তিনি আত্মহত্যার জন্য কোন উপকরণ খুঁজে বের করেছেন কি? যেমন ওষুধ, দড়ি, বিষ বা অন্য কোন উপায়।

- পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা: আগেও কি তিনি আত্মহত্যার চিন্তা করেছিলেন? তখন তিনি কিভাবে এর থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছিলেন? তিনি কি কারও সাহায্য নিয়েছিলেন?
- সাহায্য: কমিউনিটিতে তাকে সাহায্য করার মতো কারা আছে; পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী ও পেশাজীবি।
- তার সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা কর; সব সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলেও অন্ততপক্ষে একটি সমস্যার সমাধান তার মধ্যে বেঁচে থাকার আশা জাগাতে পারে
- এমন কোনো কথা না বলা যাতে তার মধ্যে গ্লানি বা অপরাধবোধ তৈরী হয়
- কখনওই ব্যক্তির আত্মহত্যার কথা গোপন রাখতে রাজী হবেন না
- জরুরি নিরাপত্তা, ব্যক্তি নিরাপত্তা কিভাবে নিশ্চিত করা যাবে
- আত্মহত্যার উপকরণগুলো সরিয়ে দাও
- নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত কর, বিশেষকরে ব্যক্তির কাছে যদি কোন অস্ত্র থাকে অথবা ব্যক্তি যদি কোনো ধ্বংসাত্মক আচরণ করে তবে তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সবার আগে জরুরি
- যদি তারা কোনো মাদক গ্রহণ করে থাকে তবে তাকে তা বন্ধ করতে উৎসাহিত কর

দ্বিতীয় ধাপ : ব্যক্তিগত ও নৈতিক মানদন্ডে অন্যকে বিচার না করে সহমর্মিতার সাথে তার কথা শুনুন

- আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তির কথা সহমর্মিতার সাথে শুনুন
- তার চিন্তা ও অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করতে উৎসাহিত কর
- তাকে মর্যাদা ও সম্মান দিচ্ছ তা তাকে বুঝতে দাও
- তাকে তার মতো করে গ্রহণ কর

কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তুমি এরকমভাবে কিছু বলতে পার;

- " তুমি এমন অনুভব করছ দেখে আমার খারাপ লাগছে, এটা খুবই কষ্টকর"
- " আমি তোমার কথা শুনছি এবং আমি তোমার সাথে এ বিষয় নিয়ে কথা চালিয়ে যেতে চাই।"
- " তুমি বলছিলে যে তুমি এরকম অনুভব কর ...

মনোভাব

- মানুষকে ঠিক তার মতোই গ্রহণ করতে সক্ষম হন
- তাদের পরিস্থিতির ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষেই কোনো প্রকার বিচার-বিশ্লেষণ না করে থাকতে পারেন
- সত্যিকার অর্থেই তাদের প্রতি সহমর্মী হতে পারেন

মৌখিক দক্ষতা

- তার কথায় বিঘ্ন না ঘটিয়ে শুনে যাওয়া
- যা বলা হয়েছে তা ওই ব্যক্তি ও তুমি বুঝতে পেরেছ কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রশ্ন কর
- যা বলা হয়েছে তা ভালোমত বুঝেছ কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিজের মত করে তার কথাগুলো তাকেই একবার বল
- তার বক্তব্যে দেওয়া তথ্য ও অনুভূতিগুলো সারাংশ কর
- অমৌখিক দক্ষতা (শারীরিক অঙ্গভঙ্গি বা ভাষা)
- স্বস্তিজনক দৃষ্টি বিনিময় কর
- তোমার শারীরিক ভঙ্গি শোভন রাখ
- ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকলে তুমি বসে থাকুন, এতে তোমাকে কম হুমকিজনক মনে হবে
- ব্যক্তির সরাসরি বিপরীত প্রান্তে বা মুখোমুখি না বসার চেষ্টা কর, এতে মনে হতে পারে তুমি তাদের জন্য স্বস্তিকর স্থান দখল করে আছ

করণীয়-৩: আশ্বস্ত কর ও প্রয়োজনীয় তথ্য দাও

- বিষণ্নতা যে একটি বাস্তব মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা অনেক পরিচিত এবং প্রায়শঃ দেখা যায়
- ব্যক্তির অসুস্থ্যতার জন্য তাকে দোষারোপ করব না
- বিষণ্নতা হতে যেমন সময় লাগে এর থেকে আরোগ্য লাভেও তেমনি সময় লাগে তাই ধৈর্য্য ধরুন
- যত তাড়াতাড়ি বিষণ্নতার চিকিৎসা করানো যাবে, তত তাড়াতাড়ি এর আরোগ্য লাভ সম্ভব

আমি ব্যক্তিকে যা দিতে পারি:

- তাকে বুঝতে পারা এবং আবেগীয় সহায়তা
- আরোগ্যের জন্য আশা জাগান
- বিষণ্নতার জন্য যে সমস্ত কার্যকর চিকিৎসা ও সেবা পাওয়া যায় সেগুলো সম্পর্কে তথ্য দেওয়া
- ব্যক্তি যেন তার নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারেন তার জন্য বাস্তব সহযোগিতা প্রদান করা

করণীয় ৪: উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ সহায়তা নিতে ব্যক্তিকে উৎসাহিত কর

- যদি বিষণ্নতার লক্ষণগুলো দুই সপ্তাহের বেশী সময় ব্যাপী স্থায়ী হয় এবং ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনে তা ব্যাঘাত ঘটায়, তবে পেশাদার সাহায্য নিতে উৎসাহিত কর

- ব্যক্তি সাহায্য নিতে আগ্রহী কিনা তাকে তা জিজ্ঞাসা কর, যদি সে হ্যাঁ বলে, তবে বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর
- পেশাদার সাহায্য নিতে সহযোগীতা কর
- ব্যক্তি যাতে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার জন্য তাকে সহযোগীতা কর
- ব্যক্তিকে নিচের উপযুক্ত পেশাদারী সহযোগীতা নিতে উৎসাহিত কর
- চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক, কাউন্সেলর
- ক্লিনিক্যাল সাইকোলোজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিষ্ট
- বেসরকারি সেবা সংস্থা

করণীয় ৫: অন্যান্য সহায়তা নিতেও উৎসাহিত কর :

- ইয়োগা, শিথিলায়ন (রিলাক্সেসন) থেরাপি, ব্যায়াম, ধ্যান, মাইন্ডফুলনেস
- বই পড়া, সামাজিক একিভূতকরণ - চাকুরি, শিক্ষা, অবসর, সামাজিক কাজ, আধ্যাত্মিক কাজ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা ও সাহায্য নেওয়া;
- শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা;
- পুষ্টিকর খাবার খাওয়া;
- নিজেকে মূল্য দেওয়া;
- তাদের আবেগ নিয়ে কথা বলা;
- পরিবার ও বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখা;
- অন্যের যত্ন নেওয়া
- নতুন কিছু শেখা
- সৃজনশীল কাজ করা;
- কর্ম বিরতি নেওয়া এবং বিশ্রাম করা
- সাহায্য চাওয়া, নিজের যত্ন নেওয়া

একজন বিষন্ন ও আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তিকে সাহায্য করা বেদনাদায়ক ও ক্লান্তিকর:

- নিজের ভালো থাকাকে মূল্যদিন ;
- নিজের সানসিক চাপ কমাতে ব্যবস্থা নাও;
- নিজের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকে অন্যের সাথে ভাগ করে নাও;
- আপনার মানসিক চাপ কমাতে তাৎক্ষণিক তুমি যা করতে পারেন:
- ব্যায়াম;
- মাইন্ডফুলনেস ও শিথিলায়ন;
- কথা বলা, ঘুমানো, সাজ গোজ করা, বেড়ানো

জব ১: সিপিআর শুরুর আগে প্রারম্ভিকভাবে করণীয় ধাপ

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (wastage) এবং স্ক্যাপগুলো (scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট ও মেশিন): ফার্স্ট এইড কিটের অন্তর্ভুক্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

কাজের ধারা:

ধাপ-১। কাউকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখলে প্রথমেই চিৎকার করে অন্য কাউকে ডেকে নাও। কারণ দুজন হলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

ধাপ-২। আক্রান্ত ব্যক্তির আশপাশের অবস্থা দেখে নাও।

ধাপ-৩। আক্রান্ত ব্যক্তির বিপদসংকুল পরিবেশ থাকলে তা নিশ্চিত কর যেমন: বৈদ্যুতিক তার বা কোন বিষাক্ত কিছুর উপস্থিতি। যদি থাকে তাহলে তা আগে সরিয়ে দিন যাতে তুমি নিজেই সমস্যায় না পড়েন।

ধাপ-৪। এরপর আক্রান্ত ব্যক্তির কাঁধে একটা চাপড় দিন, দিয়ে জিজ্ঞেস কর- আর ইউ অকে? মানে সব ঠিকঠাক কিনা।

ধাপ-৫। নিশ্চিত হোন যে লোকটার আসলেই সাহায্য লাগবে কীনা? যদি তার সাহায্য চাওয়ার মত অবস্থা না থাকে তবেই সাহায্য করা শুরু কর।

ধাপ-৬। সাহায্যের জন্য এ্যাম্বুলেন্সে একটি ফোন দিয়ে রাখ।

ধাপ-৭। সিপিআর এর মূল উদ্দেশ্য তথা নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে আশে পাশে লোকজনের ভীর থাকলে তাদেরকে সরিয়ে দিন।

ধাপ-৮। এর পরে দেখুন আক্রান্ত ব্যক্তির জ্ঞান আছে কিনা এবং তাঁর হৃদক্রিয়া চলছে কিনা।

ধাপ-৯। জ্ঞান থাকলে তাকে স্বাভাবিকভাবে চিৎ করে শুইয়ে দিন যাতে তিনি স্থিরভাবে শ্বাস নিতে পারেন।

ধাপ-১০। জ্ঞান না থাকলে সিপিআর পদ্ধতি অনুযায়ী পরবর্তী ধাপগুলো অনুসরণ কর।

অব-২:অজ্ঞান ব্যক্তিকে ধাপানুসারে সিপিআর দেওয়ার পদ্ধতি প্রয়োগ

ধাপ-১। অজ্ঞান ব্যক্তিকে চিত করে শুইয়ে দিন।

ধাপ-২। তারপর রোগীর পাল্স আছে কিনা এবং রোগীর নাকের কাছে কান নিয়ে অথবা বুকের উঠা-নামা দেখে শ্বাস নিচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে নাও।

ধাপ-৩।আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস নেয়ার পথ যেমন- নাক মুখ গলার ভিতরের অংশ পরিষ্কার আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন।

ধাপ-৪। মাথা পিছনের দিকে ঠেলে, থুতনি উপরের দিকে তুলে শ্বাসনালী খুলে দিন।

ধাপ-৫। যদি কফ/রক্ত বা অন্য কোন কিছু গলা, নাক অথবা মুখে আটকে থাকে তবে তা সরিয়ে শ্বাস নেয়ার পথ করে দিন এবং সিপিআর প্রয়োগ শুরু কর।

ধাপ-৬। ব্যক্তির এক পাশে এসে বুক বরাবর বসে একটি হাত হাত প্রসারিত করে অন্য হাতের আঙুলের সাথে লক তৈরি কর।

ধাপ-৭। হাতের তালুর উঁচু অংশটি বুকের মাঝ একটু বাম দিকে স্থাপন কর।

ধাপ-৮। হাতের কনুই ভাঁজ না করে সোজা ভাবে বুকের উপর চাপ দিতে থাকুনযেন প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ টি চাপ প্রয়োগ করা যায়। এমনভাবে চাপ দিন যেন ২ থেকে ২.৫ ইঞ্চি নেমে যায়।

ধাপ-৯। এভাবে ৩০ বার চাপ দেওয়ার পর রোগীর কপাল ও থুতনিতে হাত দিয়ে মুখটি খুলে নাও এবং মুখ দিয়ে মুখে জোরে জোরে দু'বার রেস্কিউ ব্রেথ অথবা শ্বাস দিন। শ্বাস দেওয়ার সময় বুকের উঠা-নামা

ধাপ-১০। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত বা জ্ঞান ফিরে আসা অথবা স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হওয়া পর্যন্ত একইভাবে সিপিআর চালাতে থাকুন।

খেয়াল করে শ্বাস ফুসফুসে যাচ্ছে কিনা তার সঠিকতা নিশ্চিত কর।	

ধাপ-২। জ্ঞান ফিরলে বা শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হলে তাকে রিকভারি পজিশনে (একপাশে কাত করে) শুইয়ে দিন এরপর হাসপাতালে পাঠিয়ে পরবর্তী চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল:

- প্রশিক্ষনার্থী এই কাজটি ভালোভাবে কয়েকবার অনুসরণ করার সিপিআর শুরুর আগে প্রারম্ভিকভাবে করণীয় ধাপ সম্পন্ন করতে পারবে।

ফলাফল বিশ্লেষন ও মন্তব্যঃ আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১.আহত ব্যক্তির প্রাথমিকপর্যবেক্ষণ (অ, ই, ঈ) বলতে কি বুঝায়?
২. আহত ব্যক্তির সাড়া দেওয়ার পর্যায়গুলো কি কি?
৩. রক্তক্ষরণের প্রকারভেদ কি কি?
৪. রক্তক্ষরণের প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য কি?
৫. বাহ্যিক রক্তক্ষরণের প্রাথমিক চিকিৎসা কি?
৬. ফিট কি?
৭. ফিটের লক্ষণ কি?
৮. মূর্ছার লক্ষণ কি?
৯. মূর্ছার কারণ ও করণীয় কি?
১০. অজ্ঞান ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা কি?
২. হাড় ভাঙ্গার প্রকারভেদ কি?
১২. হাড় ভাঙ্গার প্রাথমিক চিকিৎসা কি?
১৩. মচকানোর প্রাথমিক চিকিৎসা কি?
১৪. হাড় ভাঙ্গার প্রাথমিক চিকিৎসায় সাবধানতা কি?
১৫. পানিতে ডুবে মৃত্যুর কারণ কি?
১৬. পানিতে ডোবার প্রাথমিক চিকিৎসা কি?
১৭. মনস্তাত্ত্বিক আঘাত কি?মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের কারণ কি?
১৮. মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের লক্ষণ ও চিহ্ন কি? প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য কি?
১৯. পরিবহনের পূর্ব প্রস্তুতি কি?
২০. উত্তোলনের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রাথমিক চিকিৎসা কি?
২.প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উল্লেখ কর।
৩. প্রাথমিক চিকিৎসকের গুণাবলি কয়টি ও কি কি?
৪. শকের প্রাথমিক চিকিৎসকের লক্ষ্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সিপিআর বলতে কি বুঝায়? প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে এর ধাপগুলো উল্লেখ কর।
২. শক কি? শকের কারণ ও লক্ষন উল্লেখ কর।
৩. ফার্স্ট এইড কিট কি? প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির তালিকা প্রস্তুত কর।
৪. চোকিং কি? চোকিং এর লক্ষণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শারিরীক অক্ষমতায় ব্যবহৃত সহায়ক যন্ত্র

Assistive Devices for Physically challenged

শারিরীকভাবে অক্ষম ব্যক্তি বলতে আমরা বুঝি এমন কোনো ব্যক্তি, যে তার কোনো দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা, বার্ধক্যজনিত কারণ অথবা জন্মগত ত্রুটি বা দুর্ঘটনাকবলিত কারণে আজীবন প্রতিবন্ধীতার কারণে দৈনন্দিন জীবনের কাজ বাধাগ্রাস্ত হচ্ছে। সহায়ক যন্ত্র এবং প্রযুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সামগ্রিক সুস্থতা উন্নত করা বা একজন ব্যক্তির কার্যকারিতা বজায় রাখা। কার্যকারিতা, অক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যের ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন (ICF) অনুযায়ী সহায়ক যন্ত্র এবং প্রযুক্তি হ'ল যে কোনো পণ্য, যন্ত্র, সরঞ্জাম বা প্রযুক্তি যা বিশেষভাবে সক্ষম বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (ISO) সহায়ক যন্ত্রগুলোকে আরও বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করে বিশেষভাবে উৎপাদিত বা সাধারণভাবে উপলব্ধ পণ্য হিসাবে, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা বা তাদের জন্য ব্যবহৃত হয়: তাদের অংশগ্রহণের জন্য; তাদের সুরক্ষা, সমর্থন, প্রশিক্ষণ, শরীরের কাঠামো এবং কার্যকলাপের বিকল্প হিসেবে; বা প্রতিবন্ধকতা, কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতা বা অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা প্রতিরোধ করতে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- শারীরিক অক্ষমতা কী তা বলতে পারবো।
- শারীরিক অক্ষমতায় ব্যবহৃত সহায়ক যন্ত্রগুলো সনাক্ত করতে পারবো।
- সহায়ক যন্ত্রগুলো ব্যবহারে ক্লায়েন্টে উদ্বুদ্ধ করতে পারবো
- সহায়ক যন্ত্রগুলোকে ব্যবহারে ক্লায়েন্টকে সহযোগিতা করতে পারবো।
- হুইলচেয়ার, ওয়াকার এবং মেডিকেল বেড ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবো।

উল্লেখিত শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আমরা বভিন্নি আইটেমের জব (কাজ) সম্পন্ন করব। এই জবের মাধ্যমে আমরা শারীরকি অক্ষমতায় ব্যবহৃত যন্ত্রগুলো সনাক্ত করতে পারবো, ব্যবহার ও রক্ষণাবক্ষেণরে উপায় জানতে পারবো। জবগুলো সম্পন্ন করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানব।

২.১ শারীরিক অক্ষমতা

২.১.১ অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধীতার পরিচিতি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, অক্ষমতা **বা প্রতিবন্ধীতার** তিনটি মাত্রা **আছে**:

- ব্যক্তির শরীরের গঠন বা কার্যকারিতা, বা মানসিক কার্যকারিতা**য় সমস্যা; যেমন: যেকোন** অঙ্গের ক্ষতি, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস বা স্মৃতিশক্তি হ্রাস।
- কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতা, যেমন **দৃষ্টি প্রতিবন্ধীতা,** শ্রবণ **প্রতিবন্ধীতা,** হাঁটা**চলায়** সমস্যা।
- স্বাভাবিক দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ, যেমন **অফিসের** কাজ, সামাজিক এবং বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপ এবং স্বাস্থ্যসেবা **ও** প্রতিরোধমূলক পরিষেবা **ইত্যাদিতে** অংশগ্রহণে **বাধা।**

২.১.২ অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধীতার কারণ

১। জন্মগত ত্রুটি

- জিন**গত ত্রুটি**
- ক্রোমোজোমের ব্যাধি (উদাহরণস্বরূপ, ডাউন সিন্ড্রোম)
- **সেরেব্রাল পালসি**
- গর্ভাবস্থায় মায়ের **রোগ** সংক্রমণ (উদাহরণস্বরূপ, রুবেলা) বা অ্যালকোহল বা সিগারেটের মতো পদার্থ।
- **বিকাশজনিত সমস্যা** (উদাহরণস্বরূপ, অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার এবং মনোযোগ-ঘাটতি/**অতি চন্চলতার সমস্যা** বা **ADHD)**

২। বাহ্যিক আঘাত

উদাহরণস্বরূপ, মস্তিষ্কের আঘাত বা মেরুদন্ডের আঘাত

৩। দীর্ঘস্থায়ীরোগ

উদাহরণস্বরূপ, ডায়াবেটিস, যা দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, স্নায়ুর ক্ষতি বা অঙ্গহানির মতো অক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে। নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার, মসকুলার ডিসট্রোফি, নিউরোপ্যাথি ইত্যাদি।

৫। বার্ধক্য জনিত রোগ

২.১.৩ শারীরিক অক্ষমতা কি?

শারীরিক অক্ষমতা হল একজন ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা যা **তার** শরীরের **যেকোন** একটি অংশকে প্রভাবিত করে তাদের শারীরিক কার্যকারিতা, গতিশীলতা, সহনশীলতা বা দক্ষতাকে দুর্বল ও সীমিত করে। শারীরিক ক্ষমতা হ্রাসের ফলে ব্যক্তির শরীরের **চলনশক্তি** যেমন, হাত ও বাহু নড়াচড়া করা, বসা-দাঁড়ানো-হাঁটা এবং সেইসাথে তাদের পেশী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কমে যায়। শারীরিক অক্ষমতা **ব্যক্তির** নির্দিষ্ট কাজগুলো করতে বাধা দেয় না, তবে সেগুলোকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তোলে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে

শারীরিক অক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করা **হয়** শারীরিক অবস্থা **বিবেচনা করে না,** বরং এটি কীভাবে দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে **তার উপর নির্ভর করে। কিছু সাধারণ** শারীরিক অক্ষমতার **উদাহরণ:**

- **বার্ধক্য**
- আর্থ্রাইটিস
- মৃগীরোগ
- মস্তিষ্কের **বা মেরুদন্ডের** আঘাতের **কারণে প্যারালাইসিস**
- সেরিব্রাল পলসি।

সেরিব্রাল পালসি: সেরিব্রাল পালসি **শিশুদের বিকাশকালীন সময়ে** ঘটে, যার ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আচরণগত অক্ষমতা সহ সাধারণত নড়াচড়া এবং সমন্বয়ের সমস্যা **হয়ে** থাকে।
মস্তিষ্কের আঘাত: মস্তিষ্কের আঘাত **যেমন:** স্ট্রোক, মাথায় আঘাত, অ্যালকোহল, ওষুধ, অক্সিজেনের অভাব বা ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন রোগ সহ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মস্তিষ্কের আঘাত ও আবদ্ধতা **ব্যক্তির প্যারালাইসিসের কারণ হতে পারে।**
মেরুদন্ডের আঘাত: মেরুদন্ডের আঘাতের ফলে শরীর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের **ক্রিয়াকলাপের** সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রতিবন্ধকতা হতে পারে। মেরুদন্ডের আঘাত**ও ব্যক্তির প্যারালাইসিসের কারণ হতে পারে।**
মৃগী রোগ: মৃগীরোগ হল একটি স্নায়বিক অবস্থা যা একজন ব্যক্তির বারবার খিঁচুনি হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করে।
আর্থ্রাইটিস: আর্থ্রাইটিস **হাড়ের সংযোগস্থলে** প্রদাহ সৃষ্টি করে। **এটা** শিশুদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদেরও প্রভাবিত করতে পারে।

২.২ শারীরিক অক্ষমতায় ব্যবহৃত সহায়ক যন্ত্র

শারীরিক অক্ষমতায় ব্যবহৃত সহায়ক **যন্ত্রগুলোকে** গতিশীলতা সহায়ক যন্ত্রও বলা যায়। যেমন হুইলচেয়ার, ওয়াকার, ক্রাচ, **মেডিকেল বেড** এবং অর্থোটিক ডিভাইস।

২.২.১ হুইলচেয়ার:

হুইলচেয়ার হল চাকা সহ একটি চেয়ার যা অসুস্থতা, আঘাত, বার্ধক্যজনিত সমস্যা বা অক্ষমতার কারণে চলাফেরায় সমস্যা বা তা অসম্ভব হলে ব্যবহৃত হয়। হুইলচেয়ারগুলো তাদের ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ধরনের ফর্ম্যাটে আসে। এগুলোতে বিশেষ বসার অভিযোজন, স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে এবং স্পোর্টস হুইলচেয়ারগুলোর বিশেষ কার্যকলাপের জন্য নির্দিষ্ট হতে পারে। ব্যবহারকারী নিজে বা সাহায্যকারী কেউ বল প্রয়োগ করে ম্যানুয়াল হুইলচেয়ার চালায়। মোটর চালিত হুইলচেয়ারগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এগুলো ব্যাটারি এবং বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

চিত্র ২.১: হুইলচেয়ারের সাংকেতিক চিহ্ন

২.২.২ মেডিকেল বেড

একটি মেডিকেল বেড হল একটি বিছানা যা বিশেষভাবে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের জন্য বা যাদের কিছু বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন তাদের জন্য ব্যবহার করা হয়। রোগীর আরাম ও সুস্থতার জন্য এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সুবিধার জন্য এই বিছানাগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাধারণত এর অংশগুলোর মধ্যে আছে বিছানা, মাথা এবং পায়ের জন্য উচ্চতার সামঞ্জস্য করার ব্যবস্থা, সামঞ্জস্যযোগ্য পার্শ্ব রেল, এবং মেডিকেল বেডের সকল কার্যকারিতার ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল। মেডিকেল বেডের কার্যকারিতা এবং শক্তির উৎসের উপর ভিত্তি করে এগুলো তিন ধরনের:

- ম্যানুয়াল বেড
- সেমি ইলেক্ট্রনিক বেড
- পূর্ণ ইলেক্ট্রনিক বেড

চিত্র ২.২: ম্যানুয়াল বেড

চিত্র ২.৩: সেমি ইলেক্ট্রনিক বেড

চিত্র ২.৪: পূর্ণ ইলেক্ট্রনিক বেড

বৈশিষ্ট্য

- **চাকা:** চাকাগুলো বিছানার সহজ নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। চাকা লক করা যায়। নিরাপত্তার জন্য, রোগীকে বিছানায় বা বাইরে স্থানান্তর করার সময় চাকা লক করে নিতে হয়।
- **মাথা এবং পায়ের জন্য উচ্চতার সামঞ্জস্য করার ব্যবস্থা:** বিছানার মাথা ও পায়ের অংশ সম্পূর্ণ উচ্চতায় উঠানো ও নামানো যায়। বর্তমানে, সেমি ইলেক্ট্রনিক ও সম্পূর্ণ ইলেক্ট্রনিক বিছানার এই বৈশিষ্ট্যগুলো দুটি মোটর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- **সামঞ্জস্যযোগ্য পার্শ্ব রেল:** বিছানার পাশে রেল আছে যা উঠানো বা নামানো যায়। এই রেলগুলো রোগীর জন্য সুরক্ষা হিসাবে কাজ করে। এগুলো যদি সঠিকভাবে নির্মিত না হয় তাহলে রোগীর পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- **ডানে-বামে কাত করার ব্যবস্থা:** কিছু উন্নত বিছানা প্রতি পাশে ১৫-৩০ ডিগ্রীতে কাত করা যায়। এই ধরনের ব্যবস্থা রোগীর দেহে প্রেসার আলসার প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে।

প্রাত্যহিক পরিচর্যা:

১. বিছানা এবং গদি প্রতিদিন পরীক্ষা এবং পরিষ্কার করা উচিত। রোগী যখন বিছানায় থাকবে না তখন এটা করতে হবে। যদি এটি সম্ভব না হয় তবে রোগীকে ব্যাখ্যা করতে হবে যে কি করা হচ্ছে।

২. হাত ধুয়ে একটি এপ্রোন এবং এক জোড়া গ্লাভস পরে নিতে হবে।

৩. ডিসপোজেবল ওয়াইপ ব্যবহার না করলে, প্রস্তুতকারকের নির্দেশিকা অনুযায়ী বালতিতে পরিষ্কার পানি ও ডিটার্জেন্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪. বিছানাটি সুবিধাজনক উচ্চতায় উঠাতে বা নামাতে হবে।

৫. বিছানার ফ্রেম থেকে যেকোনো জিনিস সরিয়ে নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে।

৬. উপর থেকে নীচের দিকে পরিষ্কার করার পর বেডের উপরের অংশগুলো তারপর পৃষ্ঠের প্রান্ত এবং নীচের দিকগুলো পরিষ্কার করতে হবে।

৭. গদি পরিষ্কার করার সময়, একটি S-আকৃতিতে এবং অন্য আরেকটি কাপড় ব্যবহার করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। গদিটি ঘুরিয়েনাও এবং নীচের অংশটি পরিষ্কার করার পর সমস্ত প্রান্ত পরিষ্কার কর। ময়লা হয়েগেলে পরিষ্কার করার দ্রবণ এবং কাপড় পরিবর্তন করে গদিটি শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর একটি জীবাণুনাশক দিয়ে সমস্ত পৃষ্ঠ মুছে ফেলতে হবে।

৮. বিছানা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে বেডশিট বিছিয়ে বিছানাটিকে তার আসল অবস্থানে নিয়ে আসতে হবে।

৯. পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তা ফেলে দিতে হবে।। এপ্রোন এবং গ্লাভস খুলে হাত আবারো ধুয়ে নিতে হবে।

১০. পরিষ্কারের সময় ও তারিখ চার্টে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

চিত্র ২.৫: মেডিকেল বেডের প্রাত্যহিক পরিচর্যা

২.২.৩ ওয়াকার

একটি ওয়াকার বা হাঁটার ফ্রেম এমন একটি ডিভাইস যা হাঁটার সময় ভারসাম্য বা স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অতিরিক্ত সহায়তা দেয়, সাধারণত বয়স-সম্পর্কিত গতিশীলতার অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধীতার কারণে। যারা পায়েবা পিঠের আঘাত থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন তারা প্রায়ই ওয়াকার ব্যবহার করেন। এটি সাধারণত যারা হাঁটার সমস্যা বা হালকা ভারসাম্যের সমস্যা আছে তারা ব্যবহার করেন।

বিভিন্ন ধরনের ওয়াকার

১. হাইব্রিড ওয়াকার (Hybrid Walker):

একটি হাইব্রিড ওয়াকারে দুটি পা থাকে যা পার্শ্বীয় ভারসাম্য রক্ষায় সমর্থন দেয়। এটি ব্যবহারকারীকে এক বা দুই হাতে ব্যবহার করে, সামনে ও পাশে, পাশাপাশি একটি সিঁড়ি আরোহণের জন্য সামঞ্জস্যতা প্রদান করে।

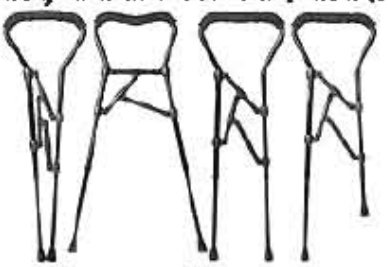

চিত্র ২.৬: হাইব্রিড ওয়াকার

২. রোলেটর (Rollator):

ওয়াকারের একটি ভিন্ন পদ্ধতি হ'ল রোলটর, যাকে চাকাযুক্ত ওয়াকারও বলা হয়। রোলেটরটিতে তিন বা চারটি বড়চাকা, হ্যান্ডেলবার এবং একটি ফ্রেম থাকে, যা ব্যবহারকারীকে সহজে চলাফেরায় সাহায্য করে। এগুলোর উচ্চতা উঠা নামা করে ব্যবহারকারীর সুবিধা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যায়। হ্যান্ডেলবারে হ্যান্ডব্রেক আছে যার সাহায্যে রোলেটরটিকে তাৎক্ষণিকভাবে থামানো সম্ভব।

৩. জিমার ফ্রেম (Zimmer Frame):

জিমার ফ্রেমটি হাঁটার সাহায্যের সবচেয়ে উপযোগী একটি ওয়াকার। জিমার ফ্রেমের সামনে দুটি চাকা আছে।

চিত্র ২.৭: রোলেটর

চিত্র ২.৮: জিমার ফ্রেম

ওয়াকার ব্যবহারকারীর জন্য টিপস:

- ওয়াকার ব্যবহারকারীর নাম সংযুক্ত করা ভালো, যাতে এটি দুর্ঘটনাক্রমে হারিয়ে না যায়।
- একজন ওয়াকার ব্যবহারকারীর একজন সাহায্যকারী সঙ্গী আশেপাশে থাকা প্রয়োজন। যদি ওয়াকার ব্যবহারকারী তার ভারসাম্য, শক্তি বা ফোকাস হারায়, তাহলে তিনি সাহায্যকারী সঙ্গীর সাহায্য নিতে পারবেন।
- ব্যবহারকারীর সুবিধার্থে ওয়াকার একটি ঝুড়ি/ব্যাগ, ট্রে, টর্চলাইট বা অন্য কিছু দিয়েকাস্টমাইজ করা যায়।

পরিচর্যা পদ্ধতি

১. সময়ের সাথে সাথে ওয়াকার বেশ নোংরা হতে পারে। এর ফলে অংশগুলো দ্রুত জীর্ণ হয়ে যেতে পারে। সপ্তাহে একবার সাবান এবং পানি দিয়ে ওয়াকার মুছতে হবে। ফ্রেম, চাকা, আসন এবং হ্যান্ডেলগুলো পরিষ্কার করতে হবে। চাকাগুলো নিখুঁতভাবে ঘুরছে কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে। ওয়াকার বৃষ্টিতে ভিজে গেলে দ্রুত শুকিয়েনিতে হবে।

২. যদি ওয়াকারে কোনো সিট থাকে, তা সপ্তাহে একদিন পরীক্ষা করে দেখতে হবে । নিরাপদে থাকার জন্য নিশ্চিত করতে হবে যে সিটটি ছিড়ে গিয়েছে কিনা তা পরীক্ষা কর।

৩. যদি ওয়াকারে কোনো চাকা থাকে, তাহলে খেয়াল রাখতে হবে যে তা চাকাগুলো সমানভাবে মাটিতে স্পর্শ করে কিনা। না করলে ওয়াকার মেরামত না করে ব্যবহার করা যাবে না। এই চাকাগুলো সঠিকভাবে সারিবদ্ধ না থাকলে সহজেই দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। তাই কোনো সমস্যা হলে একজন সারভিসিং এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৪. গ্রিপ পরীক্ষা করতে হবে। ওয়াকারের গ্রিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রিপ নষ্ট হলে পরিবর্তন করতে হবে।

৫. ব্রেক হল রোলিং ওয়াকারের সবচেয়েগুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলো সঠিকভাবে কাজ না করলে, ওয়াকার ব্যবহারকারী দুর্ঘটনার আক্রান্ত হতে পারেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ক্রাচও একই উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

জব-১: মেডিকেল বেড রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি

পারদর্শীতার মানদন্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্র্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;
- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট

১। নরম কাপড়, ২। উষ্ণ পানি, ৩।ডিটারজেন্ট পাউডার, ৪।স্ক্রু-ড্রাইভ্ ৫। লগ বুক

কাজের ধারাঃ

১। একটি নরম, ভেজা কাপড় দিয়ে বিছানার উপরিভাগ হাত দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। শক্ত কোন ক্লিনার বা সাবান ব্যবহার এড়িয়ে চলতে হবে শুধুমাত্র উষ্ণ জল এবং হালকা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে হবে।

২. বিছানা মুছে এমনভাবে শুকিয়ে নিতে হবে যেন , ব্যবহার করা ডিটারজেন্ট বিছানায় জমে না থাকে।

৩। বিছানার ম্যাট্রেছ পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে ম্যানুফ্রাকচারিং কোম্পানির নির্দেশীকা অনুসরণ করতে হবে।

৪। ম্যাট্রেছের কভার নষ্ট বা ছিড়ে গেলে তা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে পরিবর্তন করে দিতে।

৫। বিছানায় বিভিন্ন জায়গায় লাগানো স্ক্রু, হকিং পিন, হাই-লো সংযোগকারী টিউব, স্প্রিং ইত্যাদি পরীক্ষা করে তাতে গ্রীস লাগিয়ে দিতে হবে।

৬। প্রতি দুই বছরে, বিছানার রেল শ্যাফ্ট, নাইলন ওয়াশার এবং হাই-লো মেকানিজম পরীক্ষা করে তাতে গ্রীস লাগাতে হবে।

৭। সমস্ত বোল্ট, লকনাট এবং স্ক্রুগুলো পরিদর্শন করে তা এবং শক্ত করে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। সাইডরাইলগুলো সঠিকভাবে লাগানো আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে

৯। পায়ের এবং মাথার সাপোর্টের জন্য বেডের যে অংশ রয়েছে তা অক্ষত ও সঠিক আছে কি না, তা পরিক্ষা করতে হবে।

১০। বেডের চাকা সঠিকভাবে লক হয় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

১১। বেডটি পরীক্ষা করার দিন ও তারিখ লগ বইতে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

চিত্র ২.৯: একটি সুরক্ষিত মেডিকেল বেড

কাজের সতর্কতাঃ

১। কাজের সময় পিপিই ব্যবহার করতে হবে।

২। পদ্ধতির আগে এবং পরে সঠিকভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

৩। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ম্যানুয়াল সাথে রাখতে হবে।

৪। মনে রাখতে হবে যে, মেডিকেল বিছানা রক্ষণাবেক্ষন মানে জীবানুমুক্তকরন নয়

৫। কাজটি করার সময় পেশাগত ঝুঁকি এড়াতে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: তুমি মেডিকেল বেড রক্ষণাবেক্ষণে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য: আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে

জব-২: ওয়াকার রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি

পারদর্শিতার মানদন্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- জব অনুযায়ী টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেটেরিয়্যাল সিলেক্ট ও কালেক্ট করা;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- নষ্ট মালামাল (Wastage) এবং স্ক্যাপগুলো (Scrap) নির্ধারিত স্থানে ফেলা;

- কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দেওয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE): প্রয়োজন অনুযায়ী।

ক্রমিক নং	আইটেম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ টি
০২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
০৩	হ্যান্ড গ্লোভস	রাবারের তৈরি	০১ জোড়া

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্টস ও মেশিন)

জব অনুযায়ী যদি প্রয়োজন হয়।

কাজের ধারাঃ

১। ওয়াকারটি শুধুমাত্র হাঁটার জন্য সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে এটি শুধুমাত্র চলাচল যোগ্য ফুটপাথ বা বাড়িতে ব্যবহার করতে হবে।

২। পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, যে সমস্ত চাকা এবং ভাঁজ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কাজ করে কিনা এবং সমস্ত চাকা অবাধে চলাচল করে কিনা। সামনের চাকার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

৩। যদি লকিং সিস্টেম থাকে তাহলে সেই লকিং বন্ধনীটি পরীক্ষা করে সর্বদা নিশ্চিত করতে হবে যে, এটি ব্যবহারের জন্য নিরাপদে রয়েছে।

৪। যদি কোনো চাকা ঘুরতে বা নড়াচড়ায় অসুবিধা হয় এবং সেই ত্রুটির জন্য রোগীর কোনো ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে ওয়াকারটি ব্যবহার না করাই ভালো।

৫। মাসিক চেক - সাইড লকিং লেভেলগুলো সঠিকভাবে সুরক্ষিত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৬। কোন উপাদান আলগা আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

৭। ওয়াকারে যদি কোনো ব্রেক সন্নিবেশিত থাকে তাহলে তা পরীক্ষা করে ব্রেকগুলো সঠিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ন করে নিতে হবে।

৮। ওয়াকারটিকে হালকা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

৯। যদি ওয়াকারটিতে কোনো সমস্যা দেখা যায় তাহলে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তার সমাধান করতে হবে। রোগীকে ওয়াকার ব্যবহার করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানদান করতে হবে।

১০। ওয়াকারটি রোগীর নাগালের মধ্যে একটি নির্ধারিত জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

অর্জিতি দক্ষতা/ফলাফলঃ তুমি ওয়াকার রক্ষনাবক্ষেনরে প্রক্রয়িাটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়ছে। । **ফলাফল বশ্লিষেন ও মন্তব্যঃ** আশাকরি বাস্তব জীবনে তুমি এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। শারীরিক অক্ষমতা **কী**?

২। মেডিকেল বেড কত প্রকার ও কি কি?

৩। ওয়াকার কত প্রকার ও কি কি?

৪। **কিছু সাধারণ** শারীরিক অক্ষমতার **উদাহরণ দাও।**

৫। শারীরিক অক্ষমতায় **ব্যবহৃত কিছু প্রচলিত যন্ত্রের নাম লিখ।**

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। হাইব্রিড ওয়াকার কী?

২। শারিরীক অক্ষমতার কারণ কি কি হতে পারে?

৩। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, অক্ষমতা **বা প্রতিবন্ধীতার কয়টি** মাত্রা **আছে ও কি কি**?

৪। প্রতিবন্ধীতার কারণ কি কি হতে পারে?

৫। ওয়াকার ব্যবহারকারীর জন্য **কিছু টিপস দাও।**

রচনামূলক প্রশ্ন

টিকা লিখঃ

১। মেডিকেল বেড

২। হুইল চেয়ার

৩। ওয়াকার

৪। শারিরীক অক্ষমতা

তৃতীয় অধ্যায়
জনস্বাস্থ্য-এর প্রাথমিক ধারনা
Basic concepts of public health

স্বাস্থ্যসেবা আমাদের সবার জন্য কোন কোন সময়ে অপরিহার্য একটি বিষয়, কিন্তু জনস্বাস্থ্য বিষয়টি সকলের জন্য সব সময় অত্যাবশ্যক। জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ আগ্রহ আছে। এটি সাধারণত জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী বিষয় সমূহের কারণ ও প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা করে। শুধুমাত্র চিকিৎসা সেবাদানকারীদের একার পক্ষে স্বাস্থ্য ব্যাবস্থায় উদ্ভূত স্বাস্থ্য সমস্যা বা বাধা অতিক্রম করে সমাধান করা কখনোই সম্ভব নয়। মানুষ যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন আরোগ্য লাভের জন্য হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়। আর স্বাস্থ্যসেবা এবং জনস্বাস্থ্যের মূলনীতিই হল মানুষ যাতে রোগাক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার আগেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এছাড়াও জনস্বাস্থ্যের মূল কাজই হচ্ছে কমিউনিটি লেভেলে একটি অবিচ্ছিন্ন সুন্দর স্বাস্থ্য কাঠামো তৈরি করা, যাতে পুরো দেশের জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস ও সুস্বাস্থ্যের নির্ভুল জায়গা নিশ্চিত করা। জনস্বাস্থ্য বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত সকল কর্মীকে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান, রোগ প্রতিরোধ ও জনগনের স্বাস্থ্য উন্নয়নে দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ধারন করে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- জনস্বাস্থ্য কী তা বলতে পারবো
- জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব ও প্রকৃতি উল্লেখ করতে পারবো
- বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন সমস্যা বর্ণনা করতে পারবো

- বিভিন্ন কমিউনিকেবল ও নন-কমিউনিকেবল রোগ সম্পর্কে বলতে পারবো
- মশাবাহিত রোগ সম্পর্কে বলতে পারবো
- অপুষ্টিজনিত রোগ সম্পর্কে বলতে পারবো
- পরিবেশ দূষনজনিত রোগ সম্পর্কে বলতে পারবো
- রোগ ছড়ানোর কারণ ও মাধ্যম সম্পর্কে বলতে পারবো
- রোগ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বলতে পারবো
- জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের করণীয় বলতে পারবো
- জনস্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে বলতে পারবো
- বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবো
- জনস্বাস্থ্যের পরিধি ও ঝুঁকি সমূহ বর্ণনা করতে পারবো
- জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে করণীয় চিহ্নিত করতে পারবো

৩.১- জনস্বাস্থ্য

জনস্বাস্থ্য বলতে কোনো একটি এলাকার সব শ্রেণির জনগণের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে সুস্থ থাকাকে বোঝায়। সেই জন্য জনস্বাস্থ্য বিষয়টির মধ্যে শুধু স্বাস্থ্যের কথা বলা হয় না। এর মধ্যে রয়েছে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, পুষ্টি, পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। তাই, কেবল মাত্র নিজের নয়, এলাকার সমস্ত মানুষের এবং পরিবেশের সুস্থ থাকাটাও জনস্বাস্থ্যের আওতায় পড়ে ।

উইকিপিডিয়া মতে “জনস্বাস্থ্য হল সমাজ, সংগঠন, সরকারি এবং বেসরকারি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মিলিত চেষ্টা এবং তথ্যাভিজ্ঞ পছন্দের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ, জীবনকাল বৃদ্ধি ও মানব স্বাস্থ্য উন্নয়নের বিজ্ঞান ও কলা।" জনগণের স্বাস্থ্য ও তার ঝুঁকির দিকগুলো বিশ্লেষণ করা জনস্বাস্থ্যের মূল বিষয়।

৩.২- জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব ও প্রকৃতি

জনস্বাস্থ্যের গুরুত্বঃ জনস্বাস্থ্য বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সেবাদানের মান উন্নত এবং জীবন দীর্ঘায়িত করার জন্যে ব্যপক ভুমিকা রাখে । স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধের মাধ্যমে ব্যক্তিরা একটি সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে তাদের সুদীর্ঘ জীবন কাটাতে পারে। বছরের বেশি সময় ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে কাটাতে পারে। জনস্বাস্থ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাস্থ্য সমস্যা সনাক্ত করতে সাহায্য করে এবং রোগের বিস্তার এড়াতে যথাযথভাবে ভুমিকা রাখে। জনস্বাস্থ্যের একটি মৌলিক গুণ হল এর প্রতিরোধমূলক অবস্থা। কারণ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ অনেক বেশি কার্যকর এবং অনেক কম ব্যয়বহুল। জনস্বাস্থ্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচি, প্রচারাভিযানের মাধ্যমে জনগনকে সচেতনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে এবং সরকারী স্বাস্থ্যনীতিতে অসামান্য অবদান রাখে। এই ধরনের পদক্ষেপ জনগণের স্বাস্থ্য এবং জীবনকাল বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। উন্নয়নশীল ও উন্নত-উভয় ধরনের

দেশেই স্থানীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং বে-সরকারি সংগঠনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের চেষ্টায় জনস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) একটি আন্তর্জাতিক মাধ্যম যেটি বিশ্বের জনস্বাস্থ্যের বিষয়গুলো পরিচালনা করে এবং কাজ করে।

জনস্বাস্থ্যের প্রকৃতিঃ জনস্বাস্থ্য-এর মূল প্রকৃতি হলো:

১। বিভিন্ন রোগীর রোগ তদারকি এবং স্বাস্থ্যকর আচরণ নিশ্চিত করা,

২। গোষ্ঠী ও জনসাধারনের উৎসহদানের মাধ্যমে রোগ, আঘাত এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।

৩। রোগকে চিকিৎসা ছাড়া সহজ কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিরোধ করা। যেমন: উদাহরণস্বরূপ, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মত সাধারণ কাজটি দিয়েই অনেক সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়াও জনস্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার, টিকাদান কন্ডোম বিতরণ প্রচলিত প্রতিরোধমূলক জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীর উদাহরণ।

৩.৩ বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা

বাংলাদেশে আয়তনের দিক থেকে মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী। সাথে রয়েছে সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহারের চ্যালেঞ্জ। এই অবস্থায় নিম্ন লিখিত স্বাস্থ্য সমস্যা আমাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছেঃ

৩.৩.১ অসংক্রামক রোগ বা নন-কমিউনিকেবল ডিজিস:

যে রোগগুলো একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায় না, অর্থাৎ ছোঁয়াচে না তাদের অসংক্রামক ব্যাধি (Noncommunicable diseases, or NCDs) বলা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এটি একটি চিকিৎসা সংক্রান্ত শারীরিক অবস্থা বা রোগ যেটা এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে ছড়ায় না। দুনিয়াজুড়ে অসংক্রামক ব্যাধি এখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি অসংক্রামক ব্যাধি এখন মরণ ঘাতক। অসংক্রামক ব্যাধি আক্রান্ত মানুষের মধ্যে তাদের পূর্ব পুরুষের রোগের জোরালো পারিবারিক ইতিহাস থাকে । এই রোগগুলোর ক্ষেত্রে পারিবারিক বা জিনগত (জেনেটিক) ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার সঙ্গে যোগ হয় পরিবেশগত উপাদান (Environmental factors) যেমন পরিবেশ দূষণ, অস্বাস্থ্যকর ও বাজে খাদ্যাভ্যাস, কায়িক শ্রমের অভাব, ধূমপান, মানসিক চাপ ইত্যাদি। এই দুয়ে মিলে বর্তমান সময়ে অনেক কম বয়সেই মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এ ধরনের রোগে। ফলে সারা পৃথিবীজুড়ে অনেক মানুষ কম বয়সে কর্মক্ষমতা হারাচ্ছেন, ফলে পারিবারিক ব্যয় বাড়ছে। সময়মতো সচেতন হলে বংশ পরম্পরায় থাকা এসব রোগ প্রতিরোধ করা সহজ। অসংক্রামক রোগগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাসকুলার বা হৃদরোগ, হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ক্যান্সার মাস্কুলোস্কেলিট্যাল ডিসঅর্ডারস, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, পরিবেশগত স্যানিটেশন, অপুষ্টি, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সমস্যা, পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যা, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, সড়ক পথের দুর্ঘটনা, পানিতে ডুবা ইত্যাদি।

অসংক্রামক ব্যাধির প্রকারভেদঃ

সাধারণত চার ধরনের অসংক্রামক ব্যাধি আছে এবং সেগুলো হলো:
১। হৃদরোগ (cardiovascular diseases) যেমন হৃদযন্ত্রের বৈকল্য (heart attacks) এবং উচ্চ রক্তচাপ জনিত মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (stroke); ২।ক্যান্সার, ৩।দীর্ঘকালস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের রোগ (chronic respiratory diseases) যেমন দীর্ঘকালস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের বিশেষত ফুসফুসের বাধাগ্রস্থতার রোগ এবং ৪। ডায়াবেটিস এবং বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস

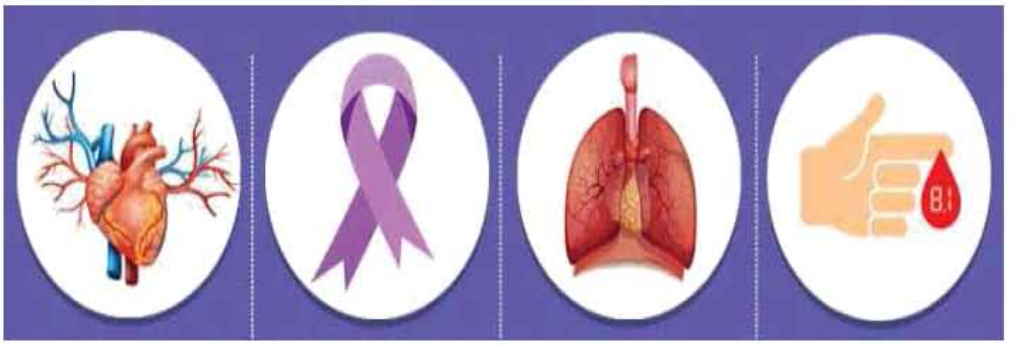

চিত্র ৩.১: নন-কমিউনিকেবল রোগ (হৃদরোগ, ক্যান্সার, শ্বাসযন্ত্রের রোগ, ডায়াবেটিস)

৩.৩.২-সংক্রামক রোগ (Communicable Diseases)

সংক্রামক ব্যাধি (Communicable diseases) সংক্রামক রোগ বলতে সেই সব রোগ বোঝায়, যেসব রোগ একজন থেকে আর একজনের শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই ছড়িয়ে পড়া শুধু মানুষ থেকে মানুষ নয়, পশু পাখি থেকে মানুষে, পশু পাখি থেকে পশু পাখির মাঝে, কিংবা মানুষ থেকে পশু পাখির মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বর্তমানে সংক্রামক রোগ এর প্রকোপ অনেকাংশে কমে এসেছে। বরং অসংক্রামক জীবন ঘাতী রোগ মহামারী আকারে দেখা দিচ্ছে। সংক্রামক রোগের মধ্যে রয়েছে- যক্ষ্মা, এইচআইভি, টিটেনাস, ম্যালেরিয়া, হাম, রুবেলা, কুষ্ঠ, কোভিড-১৯, ডায়রিয়া, ফাইলেরিয়া, ফুড পয়জনিংইত্যাদি।

সংক্রামক রোগের কারণগত শ্রেণিবিভাগ: ১। ব্যাকটেরিয়াল: যক্ষ্মা, ধনুস্টংকার, টাইফয়েড, কলেরা। **২। ভাইরাল:** ভাইরাল ইনফ্লুয়েঞ্জা, রোটা ভাইরাল ডায়রিয়া, ভাইরাল হেপাটাাইটিস, এইডস, হাম, রুবেলা।

৩। ছত্রাক জনিত: বিভিন্ন চর্মরোগ, ছত্রাক জনিত ফুসফুস সংক্রমণ, মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক আবরন সংক্রমণ, মহিলাদের শ্বেতপ্রদর ইত্যাদি। **৪। প্রোটিন জনিত:** ম্যাড কাউ, ক্রুজফিল্ড জ্যাকব

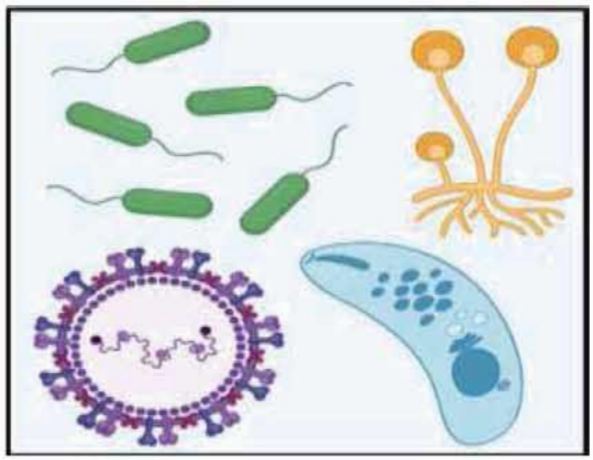

চিত্র ৩.২ : ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক

সংক্রমণ ঝুঁকি

১।ডায়াবেটিস রোগী, ২।জন্মগত স্বল্প রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংক্রমণ ঝুঁকি বেশি। ৩।কিছু রোগেও শরীর এর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, যেমন এইডস, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ক্যানসার। ৪।তাছাড়া অতি ছোট শিশু এবং অতি বৃদ্ধদের সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি

৩.৩.৩-মশাবাহিত রোগ

পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রজাতির মশা রয়েছে, এর মধ্যে মাত্র ১০০ টির মত প্রজাতি রোগ ছড়ায়।এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে মশা থেকে ২০টির মত রোগ ছড়ায়।পুরো পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের আক্রমণে প্রতিবছর যত মানুষ মারা যান, তাদের মধ্যে মশাবাহিত রোগে মারা যান সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ (সূত্রঃ বিবিসি বাংলা, ঢাকা ,২০ অগাস্ট ২০২১)। মশাবাহিত রোগ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ২০শে অগাস্ট পালিত হয় বিশ্ব মশা দিবস। মশার একটিমাত্র কামড় একজন মানুষের জন্য মরণঘাতি হয়ে উঠতে পারে। রোগসৃষ্টিকারী বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবী বহন করায় মশার কামড়ে সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে(সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, ২৮ আগষ্ট, ২০২১)। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মশাবাহিত পাঁচটি রোগের কথা জানা যায়। যথা-ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া এবং জাপানিজ এনসেফালাইটিস। নিম্নে এই পাঁচটি মশাবাহিত রোগ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

ম্যালেরিয়া

মশাবাহিত রোগগুলোর মধ্যে ম্যালেরিয়া সবচেয়ে পুরোনো রোগ। ম্যালেরিয়া রোগটি স্ত্রী এনোফিলিস মশার কামড়ের মাধ্যমে হয়। এ রোগটির জন্য দায়ী প্লাজমোডিয়াম গোত্রভুক্ত কিছু পরজীবী। বাংলাদেশের সিলেট,

পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, কক্সবাজার এবং ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

ফাইলেরিয়া

কিউলেক্স মশার দুটি প্রজাতি এবং ম্যানসোনিয়া মশার একটি প্রজাতির মাধ্যমে বাংলাদেশে ফাইলেরিয়া রোগ ছড়ায়। ফাইলেরিয়া রোগে মানুষের হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ওঠে। একে স্থানীয়ভাবে গোদ রোগও বলা হয়।

চিত্র ৩.৩: একটি কিউলেক্স মশা

ডেঙ্গু

এডিস মশার দুইটি প্রজাতি- এডিস ইজিপ্টি এবং অ্যালবোপিকটাস, মূলত ডেঙ্গু ভাইরাসের জীবাণু ছড়ায়। এডিস মশা পাত্রে জমা পরিষ্কার পানিতে জন্মায়। বাংলাদেশে সাধারণত বর্ষাকালে এর ঘনত্ব বেশি হয়, ফলে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাবও এ সময়ে বেড়ে যায়। ডেঙ্গু জ্বরে সাধারণত তীব্র জ্বর ও সেই সঙ্গে সারা শরীরে প্রচন্ড ব্যথা হয়ে থাকে। তীব্র পেটে ব্যথাও হতে পারে। শরীরে বিশেষ করে মাংসপেশীতে তীব্র ব্যথা হয়। জ্বরের ৪/৫ দিন পার হলে শরীরজুড়ে র‍্যাশ বা ঘামাচির মত লালচে দানা দেখা দেয়। সাথে বমি ভাব, এমনকি বমিও হতে পারে।

চিকুনগুনিয়া

'এডিস অ্যাজিপ্টাই' মশার কামড়ের মাধ্যমে শরীরে রোগের জীবাণু প্রবেশের দুই থেকে ১৪ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ চোখে পড়া শুরু হয়। জ্বর, মাথাব্যথা, ত্বকের র‍্যাশ, বমিভাব ও বমি ইত্যাদি ছাড়াও শরীর ব্যথা, বিশেষত, হাড়ের জোড়ে ব্যথা হওয়া এর বিশেষ লক্ষণ। রোগ সেরে যাওয়ার পরও এই জোড়ের ব্যথা সপ্তাহ, মাস কিংবা বছরব্যাপী ভোগাতে পারে।

জাপানিজ এনসেফালাইটিস

'কিউলেক্স' নামক মশার মাধ্যমে ছড়ায় এই রোগ। যার প্রকোপ সবচাইতে বেশি এশিয়া মহাদেশে, বিশেষত জাপানে। এর উপসর্গ হল জ্বর ও মাথাব্যথা। আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আড়াইশ জনের মধ্যে একজনের দেখা দেয় খিচুনি, মানসিক ভারসাম্যহীনতা এবং 'প্যারালাইসিস' বা অসাড়তা।

৩.৩.৪- অপুষ্টিজনিত রোগ

বাংলাদেশে অপুষ্টি একটি মারাত্মক জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। দারিদ্র্য, খাদ্য ঘাটতি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং নানা রকম কুসংস্কার ছাড়াও বিভিন্ন আর্থ- সামাজিক কারণে দেশের অধিক সংখ্যক মানুষ, গর্ভবতী ও প্রসুতি মহিলা এবং বাড়ন্ত শিশুরা সহজেই অপুষ্টিতে আক্রান্ত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য তথা পুষ্টি উপাদানের অভাবের ফলে বিভিন্ন বয়সের লোকদের মধ্যে নানা রকম অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা দেয়। এ সমস্ত রোগের মধ্যে রয়েছে- ১। আমিষ শক্তির ঘাটতিজনিত অপুষ্টি (প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন)-ক) ম্যারাসমাস বা হাড্ডিসার রোগ, খ) কোয়াশিয়রকর বা গা ফোলা রোগ, ২। রাতকানা (নাইট ব্লাইন্ডনেস), ৩। মুখের বা ঠোঁটের কোনায় ঘা (এঙ্গুলার ষ্টামাটাইটিস), ৪। রিকেটস, ৫। রক্তাল্পতা(নিউট্রিশনাল এনিমিয়া)

অপুষ্টিজনিত এই রোগগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল-

ম্যারাসমাস বা হাড্ডিসার রোগঃ সাধারণত এক বৎসরের নীচের বয়সী শিশুদের মধ্যেই এ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। এ রোগ হলে শরীর ক্রমশঃ রোগা হয়ে শীর্ণকায় বা হাড্ডিসার বা কঙ্কালসার হয়ে যায়। কোয়াশিয়রকর/গা ফোলা রোগঃ এক থেকে তিন বৎসর বয়সী শিশুদের মধ্যেই কোয়াশিয়রকর রোগটি বেশী দেখা যায়। শিশুর যখন মায়ের দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে অন্য খাবার খেতে শুরু করে তখনই সাধারণত এ রোগটি বেশী হয়। একটি শিশু মায়ের দুধ খাওয়া অবস্থায় আরেকটি শিশুর জন্ম হলে প্রথম শিশুটি স্বভাবতই মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে একদিকে মায়ের দুধের উৎকৃষ্ট আমিষ থেকে বঞ্চিত হয়, অপরদিকে দারিদ্রতার কারণে নিম্ন মানের অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ এবং শিশুর ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসের দরুণ ঐ শিশুর খাদ্যে মারাত্মক আমিষের ঘাটতি হয়। এরকম অবস্থাতেই শিশুটি কোয়াশিয়রকর রোগে আক্রান্ত হয়।

চিত্র ৩.৪: অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু

রাতকানা রোগ (Night Blindness): রাতকানা শিশুদের একটি প্রধান রোগ। বাংলাদেশের ব্যপক সংখ্যক শিশু রাতকানায় ভোগে। ৬ মাস থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুদের মধ্যে রাতকানার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

মুখের বা ঠোঁটের কোনায় ঘা (Angular Stomatitis): বাংলাদেশে শীতকালে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে অনেকেরই ঠোঁটের কোনায় এবং জিহব্বায় ঘা হয়ে থাকে। এ রোগের লক্ষণ হল-ঠোঁট লাল হয়ে ফেটে যায়; মুখের বা ঠোঁটের দুই কোনায় ঘা হয় এবং হা করা যায় না,জিহব্বায় ঘা হয়, লাল হয়ে ফুলে যায়, ব্যথা হয় এবং খেতে অসুবিধা হয়।

রিকেটসঃ বাংলাদেশে রিকেটস রোগের প্রকোপ খুব কম। ঘনবসতি বা বস্তি এলাকায় সেখানে মানুষ সূর্যের আলো কম পায় এবং সাথে সাথে ভিটামিন 'ডি' এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্যও কম খায়, সে এলাকায় বিশেষতঃ ছোট শিশুদের রিকেটস রোগ বেশী হয়।

রক্তসল্পতা (Anaemia): রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলেই রক্তসল্পতা রোগ হয়। বাংলাদেশের প্রায় ৭০ জন লোকই রক্তসল্পতায় ভোগে। গর্ভবতী, প্রসূতি মহিলা এবং ছোট শিশুরাই এ রোগের সহজ শিকার। এ রোগের ফলে শরীর নিস্তেজ হয়ে আসে, কর্মক্ষমতা লোপ পায় এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগ সহজেই দেহকে আক্রমন করতে পারে।

৩.৩.৫- পরিবেশ দূষণজনিত রোগ

বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দূষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তার একটি বাংলাদেশ।বাংলাদেশে প্রতি বছর যতো মানুষের মৃত্যু হয় তার ২৮ শতাংশই মারা যায় পরিবেশ দূষণ জনিত অসুখ বিসুখের কারণে। কিন্তু সারা বিশ্বে এধরনের মৃত্যুর গড় মাত্রা ১৬ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক ২০১৫ সালের এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেছে, শহরাঞ্চলে এই দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তারা বলছে, দূষণের কারণে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে (সূত্রঃবিবিসি নিউজ , ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮)। পরিবেশ দুষনের প্রকারভেদঃ পরিবেশ দূষণের বেশ কয়েকটি ভাগ রয়েছে। যেমন বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, খাদ্য দূষণ ইত্যাদি। এর সবগুলোর ফলেই কোন না কোনভাবে মানুষবিভিন্ন রোগের শিকার হচ্ছে। এসব দূষনের ফলে জনস্বাস্থ্যের যে ক্ষতি বা সমস্যাগুলো হয় তা নিম্নরুপঃ

১. শিশুদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ব্যাহত এবং স্নায়ুর ক্ষতি: আমাদের দেশে সাধারণত দূষণের শিকার হয় দরিদ্র নারী এবং শিশুরা।কারণ তাদের বেশিরভাগই দূষিত এলাকায় বসবাস করে, যেখানে সীসা দূষণেরও ঝুঁকি রয়েছে এর ফলে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশে এবং স্নায়ুবিক ক্ষতি হতে পারে।

২. গর্ভবতী মহিলাদের শারীরিক ক্ষতি: দূষিত এলাকায় বসবাসের ফলে গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত ও মৃত শিশু প্রসবের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। এসব এলাকার দূষিত বায়ু এবং পানির কারণে তার নিজের এবং গর্ভের শিশুর স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তৈরি হয়।

৩. বায়ু দূষণে চোখ, শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি: রাসায়নিক মিশ্রণ আছে, এমন দুষিত বায়ুর সংস্পর্শে থাকার কারণে চোখ, নাক বা গলার সংক্রমণ হয়। সেই সঙ্গে ফুসফুসের নানা জটিলতা, যেমন ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া, মাথাব্যথা, অ্যাজমা এবং নানাবিধ অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দেয়।

৪. ক্যান্সার ও হৃদরোগ: দীর্ঘদিন বায়ু দূষণের মধ্যে থাকলে বা এরকম পরিবেশে কাজ করলে ফুসফুসের ক্যান্সার এবং হৃদরোগের দেখা দিতে পারে। এমনকি সেটা মস্তিষ্ক, লিভার বা কিডনির দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাও তৈরি করতে পারে।

৫. পানি দূষনের ফলে সৃষ্ট রোগ: পানিবাহিত রোগ সংক্রমণের মূল কারণ হলো দূষিত পানি, শিল্প কলকারখানার বর্জ্য দুর্বল পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা । এ দূষিত পানি মানব শরীরে প্রবেশ করে পানিবাহিত রোগ ছড়ায়। যেমন— ডায়রিয়া, কলেরা, চর্মরোগ, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস এবং হেপাটাইটিস ।কলেরাও একটি মারাত্মক রোগ। দূষিত জীবাণুযুক্ত পানি পান করলে এ রোগ হয়। পাতলা পায়খানার সঙ্গে প্রচুর বমি হয়। সলমনেলা টাইফি এবং প্যারাটাইফি নামক পানিবাহিত জীবাণুর কারণে যে রোগটি হয় তাকে টাইফয়েড বলে। জন্ডিস একটি পানিবাহিত ভাইরাসজনিত রোগ। এটি লিভারকে নষ্ট করে ফেলতে পারে। জন্ডিসের ফলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

৬. শব্দ দূষণে সৃষ্ট রোগ: গবেষণায় দেখা গেছে অতিরিক্ত শব্দ দূষনের কারণে হাইপার টেনশন, আলসার, হৃদরোগ, মাথাব্যথা বা স্নায়ুর সমস্যা হতে পারে। এমনকি অতিরিক্ত শব্দের পরিবেশে থাকলে শিশুর জন্মগত ত্রুটির তৈরি হতে পারে। শব্দ দূষণের কারণে ব্লাড প্রেশার, শ্বাসের সমস্যা এমনকি হজমের সমস্যার তৈরি হতে পারে।

৭. খাদ্য দূষণে সৃষ্ট রোগঃ খাদ্য দূষণের কারণে অন্ত্রের নানা রোগ, লিভার, কিডনি বা পাকস্থলী কার্যকারিতা হারায়। গ্যাস্ট্রিক আলসারসহ নানা সমস্যার তৈরি হয়। কখনো কখনো এসব কারণে ক্যান্সারেরও তৈরি হচ্ছে। শিশুরা ছোটবেলা থেকে এ ধরনের দুষিত খাবার খেলে তাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় বা বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৩.৪-বাংলাদেশে মৃত্যুহারঃ

অসংক্রামক রোগে মৃত্যুঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস)-২০২১ জরিপ মতে ২০২০ সালের চেয়ে দেশে ব্রেন স্ট্রোক বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত মৃত্যু দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ব্রেন স্ট্রোকের পাশাপাশি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে হৃদরোগ বা হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুও। ২০২০ সালে হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে ১ লাখ ৮০ হাজার ৪০৮ জন মারা গেছে। ২০১৯ সালে এ রোগে মারা যান ১ লাখ ৪৭ হাজার ২৫৯ জন।মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর পাশাপাশি ২০২০ সালে ৮ হাজার ২৪৮ জন মারা গেছেন করোনাভাইরাসের কারণে। লিভার ক্যানসারেও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। ২০২০ সালে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ২৯ হাজার ৮৫০ জন। ২০১৯ সালে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ২১ হাজার ৩৭৪ জনের।'শুধু ধুমপানজনিত কারণে দেশে প্রতিদিন গড়ে মৃত্যু হচ্ছে সাড়ে তিন শ মানুষের। এসব রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি ও ব্যবস্থা না

নিলে ২০৪০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার বেড়ে ৮০ শতাংশে দাঁড়াবে। ৬ বৎসরের নীচের শিশুদের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ শিশু প্রতি বছর রাতকানায় ভোগে এবং প্রায় ৩০,০০০ শিশু প্রতি বছর পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায়, যাদের প্রায় অর্ধেকই আবার আমিষ শক্তি অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে প্রথম বছরই মারা যায়।

মশাবাহিত রোগে মৃত্যু হার: পুরো পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের আক্রমণে প্রতিবছর যত মানুষ মারা যান, তাদের মধ্যে মশাবাহিত রোগে মারা যান সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৮৫ হাজার মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, মারা যান ১৫৪ জন। (সূত্রঃ বিবিসি বাংলা , ২০ আগষ্ট, ২০২১)।

বাংলাদেশে ডেঙ্গু-আক্রন্ত হয়ে মৃত্যুর হার দশমিক ২ শতাংশেরও কম। মৃত্যুহারের দিক দিয়ে চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মৃত্যু হার মোট মৃত্যুর প্রায় ৫ শতাংশ। যা সাধারণ মানুষের তুলনায় ২০ থেকে ২৫ গুণ বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুসংখ্যা শতকরা দশমিক ৫ শতাংশ। (সূত্রঃ বাসস রিপোর্ট, ২৫ আগষ্ট, ২০১৯)

অন্যান্য কারণে মৃত্যু সূচক

১। বাংলাদেশের স্থুল মৃত্যুহার হ্রাস পেলেও বাংলাদেশে নবজাতক/শিশু মৃত্যুহার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এখনো আশঙ্কাজনক। প্রতি হাজারে মাতৃ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ।

২। বাংলাদেশে প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় ৫০ জন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি মারা যাচ্ছেন। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে আঘাতজনিত মৃত্যুর মধ্যে এটাই প্রধান কারণ।

৩। আর ১৮ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে প্রতিদিন ১৪ জন সড়কে প্রাণ হারাচ্ছে

৪। শিশুদের মধ্যে পানিতে ডুবে মরার হার সবচেয়ে বেশি (প্রতিদিন ৪০ জন)

৫। নয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ডুবে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। তবে ১০-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে আঘাতজনিত মৃত্যুর দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আত্মহত্যা।

৬। মাতৃ মৃত্যুর মাত্রা ১০০ জন্মের প্রায় ১ জন হয়েছে। (সূত্রঃ বাংলানিউজটোইয়েন্টিফোর.কম , ২০১২)

৩.৫-রোগ ছড়ানোর কারণ

রোগতাত্ত্বিক অনুশীলনে প্রধানতঃ সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারে তিনটি বিষয়কে একত্রে রোগ সৃষ্টির ও সংক্রমণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যথাঃ

১। **রোগ সৃষ্টিকারী উপাদান (Agent)**: ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবি, ছত্রাক ইত্যাদি।
২। **পোষকঃ (Host)**: যেমন: মানুষের দেহ, প্রানীর দেহ ইত্যাদি।
৩। **পরিবেশ (Environment)**: যেমন: অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য অসচেতন জঙ্গোষ্ঠী প্রভৃতি।

৩.৫.১-সংক্রমণের ধারা (Chain of Infection):

এর দ্বারা রোগ সংক্রমণের পরস্পর সম্পর্কিত প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে। সংক্রমণের ধারা নিম্নলিখিত ভাবে প্রদর্শন করা হয়।

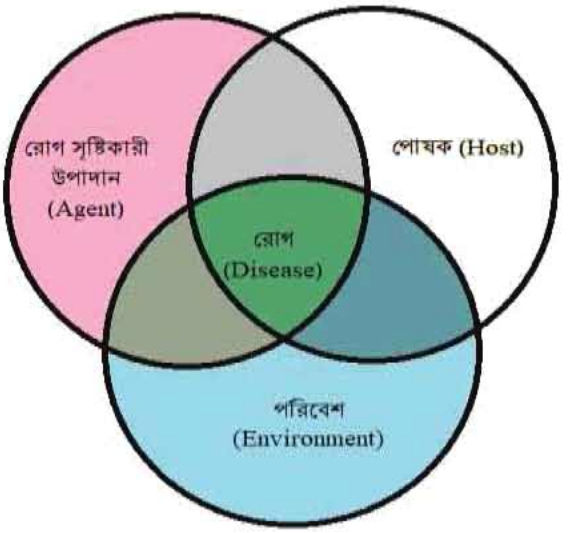

চিত্র ৩.৫: সংক্রামক রোগ সৃষ্টির ধারা।

৩.৫.২- রোগ ছড়ানোর মাধ্যম:

১। স্পর্শ: বেশ কিছু রোগ স্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়। যেমন স্কেবিস, ছত্রাক জনিত চর্ম রোগ ইত্যাদি।

২। যৌন সংস্পর্শ: এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া, হেপাটাইটিস (বি, সি), হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইনফেকশন যেটি জরায়ুমুখ ক্যান্সারের অন্যতম কারণ, লিমফো গ্রানুলোমা ভেনেরিয়াম, শ্যাংক্রয়েড ইত্যাদি।

৩। খাদ্য ও পানীয়: টাইফয়েড, পোলিও মায়েলাইটিস, হেপাটাইটিস (এ, ডি), কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয়, বিভিন্ন কৃমি সংক্রমণ।

৪। বায়ু বাহিত: যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি, মেনাওজাইটিস, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, ব্রংকিওলাইটিস, মাম্পস, রুবেলা, বসন্ত, হাম, করোনা ভাইরাস রোগ।

৫। ভেক্টর বাহিত: মশা: ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়াসিস। মাছি: উদরাময়, আমাশয়, ক্রিমি সংক্রমণ, কালাজ্বর, চ্যাগাস ডিজিস, স্লিপিং সিকনেস, চোখের কৃমি (deer fly)।

৩.৫.৩-একটি সংক্রামক রোগ (এইডস)

আমরা ইতিমধ্যে সংক্রামক রোগ, কারণগত শ্রেণিবিভাগ, ছড়ানোর মাধ্যম, ঝুঁকি এবং সংক্রামক রোগ সৃষ্টি ও সংক্রমণের কারণ সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এই পর্যায়ে উদাহরনস্বরুপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্রামক রোগ নিয়ে আলোচনা করব। যেমন: এইডস।

এইডস-এর পরিচয়ঃ এইডস হচ্ছে ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত একটি মারাত্নক যৌনবাহিত সংক্রমক রোগ । এ রোগ কতগুলো উপসর্গ ও লক্ষণের সমষ্টি । এইডস্ ইংরেজী চারটি শব্দের সমন্বয়। এর পূর্ণরূপ হচ্ছে

এ: অ্যাকুয়ার্ড- যা অর্জিত হয়েছে, বংশানুক্রমে বা উত্তরাধিকারসূত্রে সংক্রামিত হয়নি
আই: ইমিউন- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা
ডি: ডেফিশিয়েন্সি- কম, যথেষ্ট নয়
এস: সিনড্রোম- বিভিন্ন জটিলতা ও একটি বিশেষ অসুখের লক্ষণ

এইচআইভি এর সংক্রমণের কারণ

১। এইচআইভি/এইডস এর দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অসুরক্ষিত শারীরিক সম্পর্কের ফলে।
২। **মায়ের দ্বারা:** যদি জন্ম দেওয়ার সময এইচআইভি ভাইরাস মায়ের দেহে থেকে থাকে তাহলে সেই ভাইরাস বাচ্চার শরীরেও আসতে পারে। যদি জন্ম দেওয়ার পরে কোন কারণে মায়ের ভেতরে থাকা এইচআইভি ভাইরাস চলে আসে তাহলে সেই বাচ্চাকে স্তন্যপানের দ্বারাও বাচ্চার মধ্যে আসতে পারে।
৩। **ইনজেকশন:** কোন এইচআইভি/এইডস এর রোগীর দেহে ব্যবহৃত করা সুচ কোন অন্য ব্যক্তির শরীরে ব্যবহার করলেও এইচআইভি/এইডস ছড়িয়ে পড়তে পারে।
৪। **শল্য চিকিৎসাশাস্ত্র:** শল্য চিকিৎসা শাস্ত্র অর্থাৎ সার্জিকেল ইন্সট্রুমেন্ট যা সার্জারি করার জন্য ব্যবহার করা হয়, যদি এইচআইভি /এইডস এর রোগীদের শরীরে ব্যবহার করা ইন্সট্রুমেন্ট যদি ভালো করে না ধুয়েঅন্য কোন রোগীর শরীরে ব্যবহার করা হয় তাহলে এইচআইভি/এইডস ছড়িয়ে পড়তে পারে।
৫। **সংক্রামিত রক্ত:** এইচআইভি/ এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বিনা পরীক্ষা করে যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে তার থেকেও এইচ আই ভি /এইডস হতে পারে।
৬। **শ্লেষ্মা আবরণ:** শ্লেষ্মা আবরণ যা শরীরের ভেতরের অঙ্গ ঘিরে রাখে এবং সকল ক্যাভিটির সবচেয়ে উপরের স্তর তাতে যদি এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত লেগে যায় তাহলে ওই ব্যক্তির এইচআইভি/এইডস হতে পারে।

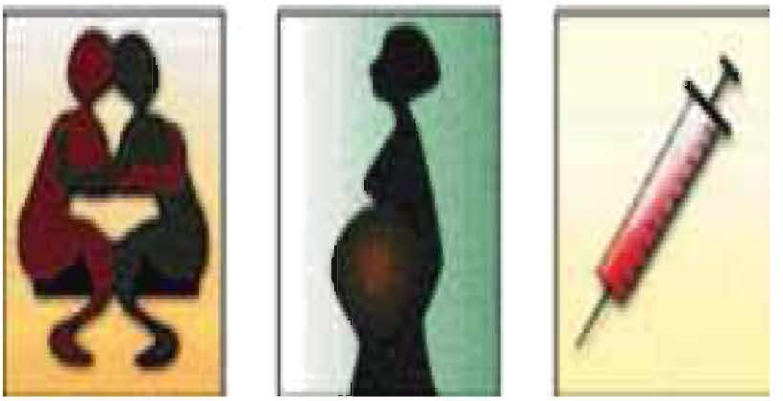

চিত্র ৩.৬: এইডস সংক্রমণের কারণ

এইডস রোগের লক্ষন

১। শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পাবে,

২। দুই (২) মাসেরও বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা,

৩। ঘন ঘন জ্বর হবে অথবা রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হবে,

৪। শুকনা কাশি হওয়া।

এইডস এর সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষণ নেই। আবার এইডস আক্রান্ত ব্যাক্তি অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হলে সে রোগের লক্ষণ দেখা যাবে। কারো মধ্যে উপরের এক বা একাধিক লক্ষণ দেখা দিলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে না যে তার এইডস হয়েছে। তবে, কোন ব্যক্তির এসব লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই বিলম্ব না করে দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে করণীয়

এইচআইভি সংক্রমণ কিভাবে হয়, সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এইডস প্রতিরোধ করতে হবে। এইডস প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

১। কোন কারণে রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে রক্তদাতার রক্তে এইচআইভি আছে কি না সেটা অবশ্যই পরীক্ষা করে নিতে হবে।

২। শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

৩। যেকোনো যৌনরোগে আক্রান্ত হলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৪। প্রতিবারই ইনজেকশনের নতুন সূঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।

৫। এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত মায়ের ক্ষেত্রে, সন্তান গ্রহণ, গর্ভাবস্থা, প্রসব এবং সন্তানকে বুকের দুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। তবে জিডোভুডিন ওষুধ ব্যবহার করে এই সম্ভাবনা কিছুটা কমানো যায়, এবং তা করলে মায়ের দুধও বাচ্চাকে দেওয়া যেতে পারে (কারণ মার দুধ না পেলে গরিব ঘরে জন্মানো বাচ্চার মৃত্যুসম্ভাবনা আরো বেশী) ।

চিত্র ৩.৬: এইডস প্রতিরোধের উপায়

৩.৬-রোগ প্রতিরোধের উপায়

৩.৬.১- সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ

১। সংক্রামক রোগ জীবাণুর মাধ্যমে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শরীরের রোগ প্রতিরোধ করা এবং রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

২। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা

৩। নিরাপদ পানি ব্যবহার করা এবং হাত জীবাণুমুক্ত রাখা

৪। ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকা জরুরি

৫। বাড়ির আশেপাশে পানি জমতে পারে এমন আবর্জনা যেমন- কৌটা, টায়ার, ফুলের টব ইত্যাদি পরিষ্কার রাখতে হবে। কারণ এতে জমে থাকা পানিতে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া রোগের বাহক মশা ডিম পাড়ে।

৬। হাঁচি- কাশির সময় টিস্যু, রুমাল বা হাত দিয়ে মুখ ঢাকা, চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

৭। হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পালন করা ও রোগীকে সেবা দেওয়ার সময় ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম পরিধান করা।

চিত্র ৩.৭: সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য পিপিই পরিধান একটি উপায়

৩.৬.২- পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধঃ

১। পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধের ভালো একটি উপায় হল পানিতে জীবাণুর বিস্তার রোধ করা।

২। পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত রোগীর মলমূত্র পানিতে না ফেলা।

৩। আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য জিনিসপত্র পানিতে না ধোয়া।

৪। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ও মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকা। কারণ বৃষ্টির সময় উক্ত ময়লা আবর্জনা ও মলমূত্র পানিতে গিয়ে পানি দূষিত হয়।

৫। খাবার আগে এবং পায়খানা ব্যবহারের পরে ভালো করে হাত ধোয়া।

৬। পানি ফুটিয়ে পান করা।

৭। সর্বোপরি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাটিন ব্যবহার করা।

৩.৬.৩- অসংক্রমক রোগ থেকে সাবধানতা ও প্রতিকার

১।যাদের পরিবারে অসংক্রামক ব্যাধি জনিত রোগ আছে, তাদের উচিত হবে তাদের বিশেষভাবে সচেতন হওয়া। শৈশব থেকেই এ ধরনের পরিবারের সন্তানদের দিকে মনোযোগী হতে হবে।

২।ওজন বেড়ে যাওয়া, অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড বা কোমল পানীয় গ্রহণ, ধূমপান—ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। তাই এগুলো বর্জনীয়।

৩। ছেলেবেলা থেকে কায়িক শ্রম, ব্যায়াম ও খেলাধুলায় উৎসাহী করা।

৪। কাঁচা শাকসবজি, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার খেতে হবে বেশি।

৫। ইদানীং বলা হচ্ছে স্তন ক্যানসার, অন্ত্রের ক্যানসারসহ কিছু ক্যানসারেরও পারিবারিক ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ। আর স্থূলতা, ওজনাধিক্য প্রতিরোধ করা গেলে, খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে পারলে এ ধরনের ক্যানসারকেও প্রতিরোধ করা যায়।

৬। পরিবারে মা-বাবার ডায়াবেটিস থাকলে তাদের তরুণী কন্যাসন্তানের গর্ভকালীন ডায়াবেটিসেরও ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই এ ধরনের পরিবারের মেয়েদেরও হতে হবে সচেতন। মুটিয়ে যাওয়া এবং কায়িক শ্রমের অভাব এই ঝুঁকি বাড়াবে। তাই তাদের উচিত সন্তান নেওয়ার আগেই ওজন নিয়ন্ত্রণ করা, নিয়মিত ব্যায়াম করা ও খাদ্যাভ্যাস পাল্টানো। পাশাপাশি নিয়মিত নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো।

৭।৩৫ বছর বয়সের পর থেকেই বছরে অন্তত একবার রক্তে শর্করা, চর্বির পরিমাণ পরীক্ষা করা, রক্তচাপ মাপা উচিত। মাত্রা বর্ডার লাইনে হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৮।উচ্চতা অনুযায়ী ওজন ঠিক আছে কি না দেখতে হবে। এ ধরনের পরিবারের সন্তানদের সামান্য উপসর্গকেও উপেক্ষা করা যাবে না। মেয়েরা গর্ভকালীন সময়ে অবশ্যই রক্তের শর্করা দেখে নেয়া উচিত।

৯।থাইরয়েডের সমস্যা পরিবারে থেকে থাকলে তা-ও দেখে নেওয়া ভালো।

১০।মা-খালাদের স্তন ক্যানসারের ইতিহাস থাকলে নিজের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। নিয়মিত নিজের স্তন পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে আলট্রাসনোগ্রাম বা ম্যামোগ্রাফি করা উচিত

১১। কোলন ক্যানসারের ইতিহাস থাকলে পারিবারিক খাদ্যাভ্যাস পাল্টে ফেলতে হবে। লাল মাংস (গরু-খাসি) কম খাওয়া, বেশি আঁশযুক্ত খাবার ও ফলমূল খাওয়া।

১২।এ ছাড়া কিছু জিনগত রোগ আছে, যেমন থ্যালাসেমিয়ার জিন বংশগতভাবে সন্তানেরা পেয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে শিশুকাল থেকেই তার যথাযথ স্ক্রিনিং, রোগ নির্ণয় প্রয়োজন। বড় হলে প্রয়োজনে যেন ব্যবস্থা নেওয়া যায় এ জন্য সচেতন হতে হবে। এ ধরনের পরিবারে নিজেদের মধ্যে বিয়ে না হওয়াই ভালো। 'কাজিন ম্যারেজ' পরবর্তী প্রজন্মের সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলতে পারে। এমনকি বিয়ে-শাদির সময় জীবনসঙ্গীও এ ধরনের জিনের বাহক কি না তা জেনে নেওয়া ভালো।

৩.৬.৪-মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতিরোধঃ

মাতৃ মৃত্যুর প্রতিরোধের জন্য চারটি উপাদান অপরিহার্য।

১। প্রথমত, জন্মপূর্ব যত্ন।কোনো মহিলা সন্তানসম্ভবা হলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং নিরীক্ষণের জন্য মায়েদের কমপক্ষে চারটি প্রসবকালীন চেক করতে যেতে হবে।

২। দ্বিতীয়ত, এই সময় ডাক্তার, সেবিকা এবং ধাত্রীদের জরুরি অবস্থা যেনো উপস্থিতি থাকে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, স্বাভাবিক প্রসব পরিচালনা করার এবং অন্যান্য জটিলতার সনাক্ত করা।

৩। তৃতীয়ত, মাতৃ মৃত্যুর প্রধান কারণগুলো মোকাবেলার জন্য কিছু বিষয় খেয়াল রাখা ও যত্নশীল হতে হবে যেমন রক্তক্ষরণ, ক্ষত, অনিরাপদ গর্ভপাত, উচ্চ রক্তচাপ রোগ এইসব সমস্যা হলে যেন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এবং

৪। অবশেষে, প্রসবের পর ছয় সপ্তাহ জন্মোত্তর যত্ন।

চিত্র ৩.৮: মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার কমানো জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের একটি অন্যতম উপায়

৩.৭- জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারের করণীয়ঃ

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উদ্দেশ্য, সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করা। এ ছাড়া রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, বিপর্যয়কর চিকিৎসা ব্যয় হতে জনগণকে সুরক্ষা দেওয়া। যেহেতু বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসা ব্যয় বহুগুণ বেড়ে গেছে, যা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই রাষ্ট্রের উচিত 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' এই মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। এর পাশাপাশি নিম্ন লিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে।

১। কার্বন নিঃসরণ: কার্বন এর মাত্রাধিক্যতা, বিশাল নির্গমন আমাদের শহরগুলোকে অনেক বেশি অনিরাপদ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হিসেবে গড়ে তুলেছে। সরকারকে স্বপ্রণোদিত হয়ে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানীর প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ করতে হবে। কারখানা গুলোকে শহরের প্রধানতম সড়ক এবং বসতির বাইরে নিয়ে যেতে হবে এবং কারখানার জন্যেও আলাদা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

২। সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিংবা প্রোপার ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

৩। পর্যাপ্ত হাসপাতাল স্থাপন: আমাদের দেশের অঞ্চলগুলো পরিকল্পনার সময়ই এমন ভাবে সাজাতে হবে যেনো, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর বসবাসরত পরিধির জন্য একটি করে হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ এবং পর্যাপ্ত কর্মীর সংখ্যা সেখানে বিদ্যমান থাকে।

৪। পরিকল্পনাবিদগণের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান: জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি নগর পরিকল্পনাতে গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভূক্তিকরণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়ন দেখতে চাইলে পরিকল্পনাবিদগণের হাতে অবশ্যই পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করতে হবে এবং একই সঙ্গে কাজের তদারকি করার সুযোগ দিতে হবে।

৫। এসডিজি ও নগর পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্য: এসডিজির ৩ নং লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে, "সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে" এবং ১১ নং লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে, "অন্তর্ভূক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তুলতে হবে।"তাই নগর পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করে পরিকল্পনা সাজালে সর্বোপরি, শত শত প্রাণ রক্ষা পাবে ।

৩.৮-জনস্বাস্থ্যনীতিঃ

জনস্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক ধরনের কাজ আছে যেগুলো একটি অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

১। কোন কমিউনিটির সাস্থ্য সমস্যা নির্দিষ্ট করার জন্য জনগনের স্বস্থ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা।
২। স্বাস্থ্য সমস্যা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ সমূহ নির্নয় ও অনুসন্ধান করা,
৩। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে জনগনকে জানানো, শিক্ষাদান এবং ক্ষমতায়ন করা,

৪। স্বাস্থ্য সমস্যা নির্দিষ্টকরন ও সমাধানের জন্য জনগনের অংশগ্রহণ কার্যকর করা,
৫। ব্যক্তিগত ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য সহায়ক নীতিমালা প্রনয়ন করা,
৬। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী আইন-কানুন প্রয়োগ করা,
৭। জনগনকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবার সাথে সংযুক্ত করা এবং অন্য কোনোভাবে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া সম্ভব না হলে তখন স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা প্রদান করা,
৮। জনস্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসেবার জন্য দক্ষ কর্মীবাহিনীর নিশ্চয়তা প্রদান করা,
৯। ব্যক্তিগত ও গনভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবার কার্যকারিতা, সহজলভ্যতা ও মানের মূল্যায়ন করা এবং
১০। বিভিন্ন গবেষনার মাধ্যমে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান ও স্বাস্থ্য সমস্যার উদ্ভাবনী সমাধান খুঁজে বের করা।

চিত্র ৩.৯: জনস্বাস্থ্যনীতি স্বাস্থ্য উন্নয়ন ক্ষেত্র

৩.৮.১- জনস্বাস্থ্যের নিয়ামক সমূহঃ

১। সামাজিক ও অর্থনৈনিক পরিবেশ,
২। প্রাকৃতিক পরিবেশ,
৩। ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আচারন,
৪। শিক্ষা
৫। সামাজিক সহায়তা নেটওয়ার্ক,
৬। স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা ও
৭। জেন্ডার বা লিঙ্গ বৈষম্য

৩.৮.২-জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উদ্দ্যেশ্য

১। সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
২। সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহীতা কেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার সহজ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তৃত করা;
৩। রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরনের জন্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সেরা গ্রহনে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা।

৩.৮.৩- বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবায় সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, বিভিন্ন এনজিও ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। সরকারি খাতে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা এবং ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন অধিদপ্তর নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। যথা-

১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,
২। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর,
৩। নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর
৪। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

৩.৮.৪-যে সব বিষয় নিয়ে কাজ করে

পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতঃ সরকার সকল জনগণ বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষে স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসহ পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা বিশেষ করে নারী, শিশু ও প্রবীণদের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শারীরিক, সামাজিক, মানসিক ও আত্মিক সুস্থতার ক্ষেত্রে টেকসই উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত (এইচএনপি) সেক্টরের মূল লক্ষ্য। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীনে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এনজিওঃ স্বাস্থ, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবায় গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রে এনজিও সমূহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তারা মূলত: পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য অধিক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। সাম্প্রতিককালে এনজিওসমূহ তাদের সেবার পরিধি বাড়িয়েছে এবং শহরে প্রাথমিক সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কাজ করছে।

চিত্র ৩.১০: স্বাস্থ, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (এইচ, পি, এন) কর্তৃক স্বাস্থ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা।

ঔষধ নীতিঃ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত পুন: গঠনের ক্ষেত্রে ১৯৮২ সালে প্রণীত ঔষধ নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো ক্ষতিকর, মূল্যহীন ও অপ্রয়োজনীয় ঔষধ বাজার থেকে অপসারণ করা এবং স্বাস্থ্য সেবার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় ঔষধ ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

চিত্র ৩.১১: বাংলাদেশে ঔষধ নীতি রক্ষায় কাজ করে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

অর্জনঃ

১। ১৯৮২ সালের জাতীয় ঔষধ নীতি সাফল্যজনকভাবে রূপায়নের ফলে বাংলাদেশে ফার্মাসিউটিকাল খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

২। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) সমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কিছু সূচক যেমন: শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, শিশু ও মায়েদের টীকা দেওয়া, ভিটামিন 'এ'-এর ঘাটতি দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসাধারণ অর্জন সাধিত হয়েছে।

৩.৯-জনস্বাস্থ্যের পরিধিঃ

জনস্বাস্থ্যের পরিধির মধ্যে রয়েছে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, কমিউনিটি, ব্যক্তি এবং সমাজ। এই ক্ষেত্রেগুলোতে সাধারণত জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পেশাদারদের বহু-শ্রেনীর দল নিয়ে গঠিত যারা স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য কাজ করে। জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং জনস্বাস্থ্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য পেশার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। মূল ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ ১। পরিবেশগত স্বাস্থ্য, ২। সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য, ৩। মহামারীবিদ্যা, ৪। বিশ্ব স্বাস্থ্য, এবং ৫। স্বাস্থ্য নীতি এবং ব্যবস্থাপনা।

৩.১০-জনস্বাস্থ্যের ঝুকিঃ

জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকিহ হল এমন একটি অবস্থা যেখানে রেডিওলজিক্যাল, পানি বা পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত জীবানুগুলো বিভিন্ন প্রকার এবং পরিমাণে জৈবিক, রাসায়নিক বা শারীরিক পদার্থ রয়েছে যা মানুষের অসুস্থতা, ব্যাধি বা অক্ষমতার কারণ হতে পারে। এর মধ্যে প্যাথোজেন, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী, বিষাক্ত রাসায়নিক এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।

৩.১০.১-জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্রকার ঝুকিঃ

১। কীটপতঙ্গ (যেমন ইঁদুর এবং মশা)
২। বর্জ্য জল এবং পয়ঃনিষ্কাশন
৩। বর্জ্য পদার্থের আধার
৪। সংক্রমণ এজেন্টের সংস্পর্শে আসা যেকোনো কিছু (যেমন ক্লিনিকাল বর্জ্য এবং শার্পস)
৫। রাসায়নিক পদার্থ বা পণ্য (যেমন অ্যাসবেস্টস বা বিষাক্ত ধোঁয়া) দ্বারা নিঃসরণ বা বিচ্ছুরণ।

৩.১১- রোগতত্ত্ব

রোগ তত্ত্ব হচ্ছে কোন রোগের প্রাদূর্ভাবের বিস্তারিত কারণ নির্নয় সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। যখন কোনো জনগোষ্ঠীকে সাওস্থ্য সম্পর্কিত অবস্থা ও ঘটনাবলীর বিস্তৃতি ও কারণ সম্মন্ধে অধ্যয়ন ওবং উক্ত সমস্যা সমাধানে জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে মহামারির হাত হতে রক্ষা করা সম্ভব হয় তখন উক্ত জ্ঞানকে রোগ তত্ত্ব বিজ্ঞান বলা হয়।

৩.১২-জনস্বাস্থ্য উন্নয়নঃ

জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ভূমিকা রাখে। যেমন:

১। ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে,
২। নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে
৩। চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে
৪। শহরের কলকারখানার বর্জ্য, গ্রামাঞ্চলের ময়লা-আবর্জনা, কাঁচা পায়খানা, মলমূত্র যাতে খাল-বিল বা নদীর পানিতে না মেশে সে দিকে জনসাধারণকে খেয়াল রাখতে হবে।
৫। প্লাস্টিক ও পলিথিন দ্রব্য যেখানে-সেখানে ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে
৬। টয়লেট ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

চিত্র ৩.১২: যত্র-তত্র ময়লা আবর্জনা ফেলা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা একে অন্যের পরিপূরক। আমাদের জনস্বাস্থ্যে পরিবেশের প্রভাব এক তাৎপর্যপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। টেকসই উন্নয়নের জন্য আমাদের অবশ্যই পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। পরিবেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন না হলে আমাদের জনস্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। এ ছাড়া পরিবেশের বিপর্যয় ঘটলে জনস্বাস্থ্য হুমকিতে পতিত হবে। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

৩.১৩- বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধমূলক ক্যাম্পেইন

জনস্বাস্থ্যের প্রচার এবং বিপজ্জনক স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিস্তার রোধ করা আধুনিক সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এইডস, ক্যান্সার, হৃদরোগ বা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচারাভিযান জরুরিভাবে প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রচারাভিযানের ক্ষেত্রে যোগাযোগের কৌশল এবং বিশেষজ্ঞ দক্ষ কর্মীরা জনগণের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে সহায়তা করে। জনস্বাস্থ্যকে লক্ষ্য করে প্রচারাভিযান চালালে জনসাধারণের আসন্ন স্বাস্থ্য হুমকি প্রতিরোধ করতে এবং ভালো স্বাস্থ্যের অভ্যাস গ্রহণ করতে সহায়তা করে। সাধারণত, এই প্রচারাভিযানগুলো

নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে (অর্থাৎ লক্ষ্য শ্রোতাদের) সম্ভাব্য স্বাস্থ্য হুমকি এবং তাদের ক্ষতি করতে পারে এমন ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে ভূমিকা রাখে। এই প্রচারাভিযান গুরুতর স্বাস্থ্য হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

চিত্র ৩.১৩: রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক একটি ক্যাংপেইন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু ক্যাম্পেইন সমস্ত বিশ্বজুড়ে পালন করা হয়। যেমন:

১। বিশ্ব নেগলেক্টেড ট্রপিক্যাল ডিজিস দিবস (World Neglected Tropical Disease (NTD) Day)- ৩০ই জানুয়ারী

২। বিশ্ব যক্ষা দিবস (World TB Day)- ২৪শে মার্চ।

৩। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস (World Health Day)-৭ই এপ্রিল।

৪। বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস (World Malaria Day)-২৫শে এপ্রিল।

৫। বিশ্ব টিকাদান সপ্তাহ (World Immunization week)-২৪-৩০শে এপ্রিল।

৬। বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস (World no tobacco day)-৩১ই মে।

৭। বিশ্ব রক্তদাতা দিবস (World blood donor day)-২৪শে জুন।

৮। বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস (World hepatitis day)- ২৮শে জুলাই।

৯। বিশ্ব রোগী নিরাপত্তা দিবস (World patient safety day)-১৭ই সেপ্টেম্বর।

১০। বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ (World antimicrobial awarness week)-১৮ - ২৪শে নভেম্বর।

২০। বিশ্ব এইডস দিবস (World AIDS Day)- ১লা ডিসেম্বর।

চিত্র ৩.১৪: বিশ্ব এইডস দিবসের লোগো-২০২১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জনস্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায়?
২। অসংক্রামক রোগ বা নন-কমিউনিকেবল ডিজিসগুলো কী কী?
৩। অসংক্রামক ব্যাধির প্রকারভেদগুলো কি?
৪। সংক্রামক রোগ বলতে কি বোঝ?
৫। সংক্রমণ ঝুঁকিগুলো কি?
৬। বিশ্ব এইডস দিবস কবে?
৭। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস কবে?
৮। এইডস কি?
৯। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উদ্দেশ্য কি?
১০। জনস্বাস্থ্যের পরিধি কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব কি?
২। কয়েকটি সংক্রামক রোগ বা কমিউনিকেবল ডিজিস-এর নাম উল্লেখ কর।
৩। সংক্রামক রোগ কারণগত শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
৪। সংক্রামক রোগ ছড়ানোর মাধ্যমগুলো কি?
৫। সংক্রামক রোগ সৃষ্টি ও সংক্রমণের কারণগুলো কি কি?
৬। AIDS-এর পূর্নরূপ কি?
৭। এইডস রোগের লক্ষনগুলো কী কী?
৮। জনস্বাস্থ্যের নিয়ামক সমূহ কী কী?
৯। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উল্লেখ কর।
১০। জনস্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্রকার ঝুকি কী কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জনস্বাস্থ্যের প্রকৃতি বর্ণনা কর।
২। কমিউনিকেবল ও নন-কমিউনিকেবল রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কর।
৩। অসংক্রামক ব্যাধির সাবধানতা ও প্রতিকার বর্ণনা কর।
৪। জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রচারাভিযান সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।
৫। এইচআইভি এর সংক্রমণের কারণ ব্যাখ্যা কর।
৬। এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে করণীয় ব্যাখ্যা কর।
৭। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যনীতি আলোচনা কর।
৮। বাংলাদেশের পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত নিয়ে আলোচনা কর।
৯। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যে মৃত্যুসূচক নিয়ে আলোচনা কর।
১০। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে করণীয় ব্যাখ্যা কর।

অপরাজেয় বাংলা

সাবাস বাংলাদেশ

বিজয় '৭১

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কয়েকটি ভাস্কর্য

ক. অপরাজেয় বাংলা: অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মরণে নির্মিত যাতে তিনজন মুক্তিযোদ্ধাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। শিল্পী সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ ১৯৭৯ সালে এটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের সামনে এটি অবস্থিত ।

খ. সাবাস বাংলাদেশ: সাবাস বাংলাদেশ ভাস্কর্যটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ভাস্কর্য যা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীকীরূপ। ১৯৯১ সালে শিল্পী নিতুন কুণ্ডু এটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ভাস্কর্যটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত।

গ. বিজয় '৭১: মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্তপ্রতীক এই ভাস্কর্যটি। ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অবস্থিত। ভাস্কর্যটির শিল্পী শ্যামল চৌধুরী, নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ২০০০ সালে।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

পেশেন্ট কেয়ার টেকনিক-২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য